পুরোহিত

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ } ১৩০০ সাল, অগ্রহায়ণ। { প্রথম সংখ্যা।

অনুক্রমণিকা।

যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্য্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥

—অথং সং ১০, ৮, ১।

যিনি এই ভূতভব্য সমগ্র চরাচরে অধিষ্ঠিত, সূর্য্যই যাঁহার প্রধান যন্ত্র, সেই প্রসিদ্ধ ও জ্যেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

পরাৎপর সচ্চিদানন্দের শ্রীচরণারবিন্দে ভক্তিগদ্গদচিত্তে প্রণিপাত করিয়া পবিত্র অগ্রহায়ণে পুরোহিত প্রথম প্রচারিত হইল। হায়নের (বৎসরের) অগ্র (প্রথম), ইহাই অগ্রহায়ণের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। উক্ত বাক্যে বর্ষের প্রথম অর্থাৎ প্রথম মাস সংসূচিত করিয়া দিতেছে। বোধ হয়, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে অগ্রহায়ণ হইতেই অব্দ-গণনার রীতি ছিল। পৌরাণিক-যুগে অগ্রহায়ণের নামান্তর মার্গশীর্ষ। অগ্রহায়ণ-বিষয়ে এখানে এতদধিক বলিবার আবশ্যক হইতেছে না। পাঠকগণ এই সংখ্যারই স্থলান্তরে "শুভ অগ্রহায়ণ মাস"-শীর্ষক প্রস্তাব আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

বঙ্গদেশস্থ হিন্দুসন্তানগণের সাহায্যার্থে আমরা এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত করিলাম। পুরোহিত বলিলে, পুরাকালে কি বস্তুর উদ্বোধ হইত, অগ্রে

তাহাই প্রদর্শিত করা আবশ্যক। পূর্ব্বাচার্য্যগণ, পুরোহিতের কর্ত্তব্যসীমা কতদূর বিস্তৃত করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ তদালোচনায় ব্যাপৃত হওয়া যাইতেছে।

ঋগ্বেদসংহিতায় আছে,—

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।—ঋং সং, ১মং, ১সূং, ১ঋক্।

যজ্ঞের পুরোহিত, দেব, ঋত্বিক, হোতা ও রত্নধারক অগ্নিকে আমি বন্দনা করিতেছি। (১)

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন,—

মন্ত্রানুষ্ঠানসম্পন্নস্ত্রৈবিদ্যঃ কর্ম্মতৎপরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ॥
ষড়ঙ্গবিৎ সাঙ্গধনুর্বিদ্যার্থধর্ম্মবিৎ।
যৎকোপভীত্যা রাজাপি ধর্ম্মনীতিপরো ভবেৎ।
নীতিশাস্ত্রাস্ত্রব্যূহাদিকুশলস্তু পুরোহিতঃ॥

—শুক্রনীতি, ২য় অঃ।

যিনি মন্ত্রানুষ্ঠানবিশিষ্ট, ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব (২) এই ত্রয়ী বিদ্যা-পারদর্শী, কার্য্যদক্ষ, ইন্দ্রিয়বিজয়ী, অক্রোধ, লোভ-মোহ-পরিশূন্য, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ, বেদের এই ছয় অঙ্গের তত্ত্বজ্ঞ, সমগ্র ধনুর্ব্বিদ্যায় সুপটু, ধর্ম্মার্থ-মর্ম্মজ্ঞ—তাঁহাকে পুরোহিত বলা যায়। তিনি কুপিত হইবেন, এই ভয়ে ক্ষিতিপতি, ধর্ম্মনীতি-পরায়ণ হইয়া থাকেন। রাজপুরোহিতকে নীতিবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা ও বূ্যহাদি রচনায় সুনিপুণ হইতে হইবে।

(১) যেমন রাজ-পুরোহিত, পৌষ্টিক কার্য্যে সমর্থ; যজ্ঞাগ্নিও, যজমানের শান্তি ও পুষ্টি-সাধনে তদনুরূপ সমর্থ।

(২) এখানে চারি বেদের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাকে ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ, কেন বলা গেল, পাঠকগণ সে বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ের মীমাংসা লিখিত হইবে।

মনু কহিয়াছেন,—

পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত বৃণুয়াদেব চর্ত্বিজম্।
তেহস্য গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যুর্বৈ তানি কানি চ॥
—মনুসংহিতা, ৭ অধ্যায়, ৭৮ শ্লোক।

রাজা, পুরোহিতকে ও যজ্ঞনিপুণ ঋত্বিককে বরণ করিবেন। তাঁহারা গৃহ্যসূত্রোক্ত তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবেন।

বিষ্ণুসংহিতায় আছে,—

বেদেতিহাসধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলং
কুলীনমব্যঙ্গং তপস্বিনং পুরোহিতঞ্চ বরয়েৎ।
—বিষ্ণুসংহিতা, ৩ অধ্যায়।

বেদ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ অভিজ্ঞ, সদ্বংশজাত, সম্পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য-কার্য্যে ব্রতী করা কর্ত্তব্য।

মিতাক্ষরায় লিখিত আছে,—

পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতং।
দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলমথর্ব্বাঙ্গিরসে তথা॥—মিতাক্ষরা।

যিনি দৈবকর্ম্মের শান্তি করিতে সমর্থ, যিনি দণ্ডনীতিতে ও অথর্ব্ববেদে বিশারদ, যিনি শাস্ত্রার্থবিৎ, তাঁহাকেই পুরোহিত করা বিধেয়।

কালিকা-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

কাণং ব্যঙ্গমপুত্রং বানাভিজ্ঞমজিতেন্দ্রিয়ম্।
ন হ্রস্বং ব্যাধিতং বাপি নৃপঃ কুর্য্যাৎ পুরোহিতম্॥
—কালিকাপুরাণ।

অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পুত্রহীন, অজ্ঞ, অবিজিতেন্দ্রিয়, বামনাকৃতি, রুগ্ন ব্যক্তিকে রাজা, পৌরোহিত্য-পদে বরণ করিবেন না।

চাণক্যমুনি বলিয়া গিয়াছেন,—

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদবচোযুক্ত এষ রাজপুরোহিতঃ॥

—চাণক্যনীতি, ৯৯ শ্লোক।

যিনি বেদ ও বেদাঙ্গ (১) উত্তমরূপ অবগত, যিনি সর্ব্বদা জপহোমে নিরত, নিত্যই আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনিই রাজপুরোহিত পদের উপযুক্ত। (২)

চাণক্যমুনির শিষ্য কামন্দক কহিয়াছেন,—

ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ।
অথর্ব্ববিহিতং কর্ম্ম কুর্য্যাচ্ছান্তিক-পৌষ্টিকম্॥ —নীতিসার।

ত্রয়ী (৩) ও দণ্ডনীতিতে (৪) পুরোহিতকে সুদক্ষ হইতে হইবে। অথর্ব্ববেদবিহিত শান্তিকর্ম্মে ও পুষ্টিসাধক কর্ম্মে পুরোহিতের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

---

(১) বেদাঙ্গের অর্থ শুক্রনীতির শ্লোক-ব্যাখ্যায় দেখ।

(২) এখানে রাজপুরোহিত শব্দে "রাজার পুরোহিত" এই অর্থ না করিয়া "শ্রেষ্ঠ পুরোহিত" কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন, চাণক্যের প্রতিজ্ঞাতে আছে,—

নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষ্যে রাজনীতিসমুচ্চয়ম্॥

নানা শাস্ত্র হইতে রাজনীতি সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া বলিব।

কিন্তু তাঁহার সংগৃহীত শ্লোক সমুদয়ে এমন সকল নীতি আছে, যাহা কোন ক্রমেই রাজনীতি হইতে পারে না। সে সকলকে রাজনীতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠনীতি বলিলে অর্থসঙ্গত হয়। তাঁহাদের ব্যবহৃত একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

ইহা রাজনীতি, না শ্রেষ্ঠ নীতি?

(৩) ত্রয়ী শব্দের অর্থ, শুক্রনীতির ব্যাখ্যায় করা গিয়াছে।

(৪) দণ্ডনীতি শব্দের অর্থ—রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত নিয়ম ও উপদেশের গ্রন্থ। যথা,—

দমো দণ্ড ইতি খ্যাতাস্তাদ্দণ্ডো মহীপতিঃ।
তস্য নীতির্দণ্ডনীতির্নয়নান্নীতিরুচ্যতে॥

কবিকল্পলতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

পুরোহিতো হিতো বেদ-স্মৃতিজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
ব্রহ্মণ্যো বিমলাচারঃ প্রতিকর্ত্তাপদামৃজুঃ॥—কবিকল্পলতা।

পুরোহিত—হিতসাধক, বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, সত্যবাদী, পবিত্র-চরিত্র, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মবাদী (ঈশ্বরভক্ত), সদাচারনিরত ও বিশুদ্ধাচার হইবেন। তিনি আপদের প্রতিবিধান করিবেন। সরলতা, পুরোহিতের এক প্রধান গুণ।

শেষোক্ত শ্লোক ব্যতীত, অপরগুলি রাজপুরোহিত বা শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের লক্ষণ। কেবল শেষ শ্লোকে সাধারণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের সাধারণ লক্ষণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পুরোহিত শব্দের অভিধেয় এইরূপ গরীয়ান্ হইলেও, বিদ্যমান কালে যাজক-সম্প্রদায়ের দোষে ও কালের কুটিল গতিতে উহার অর্থবিপর্য্যয় না ঘটুক, উহা নিতান্ত হীনভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। পুরোহিত বলিলেই এখন ক্ষুদ্র-ভাবময় এক বস্তুর উদ্বোধ হইয়া থাকে। পুরাকালে "আচার্য্য", "উপাধ্যায়", "ভট্ট", "মিশ্র", "বিপ্র", "ব্রাহ্মণ", এই সকল শব্দ, লোকের নিকট বিলক্ষণ মানাস্পদ ছিল, সুতরাং উক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ অভিধেয় ব্যক্তিগণও লোকসমাজে নিতান্ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এখন তাহার অনেক বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। "ব্রাহ্মণ" নাম শুনিয়া ভক্তিরসোদ্রেক হওয়ার পরিবর্ত্তে অনেক সময় অশ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়।

বেদ-পুরুষ স্বয়ং অগ্নিতে পুরোহিতের ধর্ম্ম-সাদৃশ্য আছে দেখিয়া, অগ্নিকে পুরোহিত বলিয়াছেন। অগ্নি, হিন্দুর দেবতা—সুপ্রাচীন পরম পবিত্র শ্রদ্ধেয় দেবতা। অগ্নি যখন পুরোহিত পদ-বাচ্য, তখন আমাদের এই পত্রিকার তাদৃশ নামে কাহারও কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

সুপ্রাচীন কালে পুরোহিত, রাজকুলের সচিব, ব্রাহ্মণগণের আচার্য্য ও অপরাপর জাতিবর্গের ধর্ম্মোপদেষ্টার কার্য্য করিতেন। গৃহস্থালীর পারিপাট্য, সমাজ-সংস্কার, জীবিকা-নির্ণয়, শিল্পবাণিজ্যের কৌশল ইত্যাদি সমস্তই পুরোহিতের মতামত লইয়া নির্ব্বাহিত হইত। অতএব আমাদের

এই "পুরোহিত" পত্রিকাও ঐ পূর্ব্ব পদবী পুনর্গ্রহণ করেন, এই আমাদের আশা ও অভিলাষ।

হিতোপদেশ দেওয়া পুরোহিতের প্রথম কার্য্য বা গুণ। আমরা যথাসাধ্য তাহা করিতে প্রয়াস পাইব। দ্বিতীয় কার্য্য—বেদজ্ঞতাপ্রকাশ। সাধ্যানুসারে তৎসম্পাদনেও ত্রুটি করা যাইবে না। তৃতীয় গুণ—স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞতা অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র-সংক্রান্ত জ্ঞান দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের করণীয় ব্যবস্থাদি বিষয়ের অনুশীলন। সে কার্য্যও এই পুরোহিত কর্ত্তৃক যথাযথ সম্পাদিত হইবার চেষ্টা আছে। সত্যকথন—চতুর্থ গুণ। এই গুণের প্রতি আমাদের বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকিবে। পবিত্রতা—পঞ্চম গুণ। সাধ্যানুসারে তাহাও সাধিত না হইবে, এমন নয়। ষষ্ঠ—ব্রহ্মণ্যত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে রতি। তৎসম্পাদনে এই পুরোহিত, চেষ্টান্বিত থাকিবেন। সপ্তম—সদাচার। যত দূর সম্ভব, তাহাও সংরক্ষিত হইবে। অষ্টম—আপদ্বিনাশ। যেমন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে এই গুণ রক্ষা করা বড়ই দুরূহ—দুষ্কর। তথাপি অবসর পাইলে, তাহারও যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা হইতে পারে। নবম—সারল্য। আমাদের বিশ্বাস, বরাবর এই গুণ রক্ষায় পুরোহিত চেষ্টাবান্ রহিবেন।

দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি, দৈত্য-পুরোহিত শুক্রাচার্য্য, যাজক-পুরোহিত অগ্নি, সূর্য্যবংশ-পুরোহিত বশিষ্ঠ, পাণ্ডব-পুরোহিত ধৌম্য। ইঁহারা সকলেই যজমানের হিতকামী ছিলেন।

পুরাকালে "পুরোহিত" হিন্দু-সমাজের কি করিতেন, কি না করিতেন, পুরোহিত শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই বোধগম্য হইবে। পুরোহিত শব্দে হিতাকাঙ্ক্ষী বুঝায়। তাহা হইতে সুযুক্তি-দাতা অর্থও লব্ধ হয়। ঋগ্বেদসংহিতা, শুক্রনীতি, মনুসংহিতা, কালিকাপুরাণ, চাণক্য-নীতি, কামন্দকীয় নীতিসার, মিতাক্ষরা, কবিকল্পলতা হইতে যে সমুদয় বচন উদ্ধৃত হইল, তাহাতে প্রাচীন কালে পুরোহিতের কার্য্যগুলি স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শব্দরত্নাবলীর মতে পুরোহিতের এক অর্থ ধর্ম্মকর্ম্মাদিকারক। আদি পদেই পুরোহিতের কর্ত্তব্যকর্ম্মের অসীমতা বোধগম্য হইতেছে। যিনি যেমন প্রকৃতির লোক—যিনি যেমন ক্ষমতাপন্ন, পুরোহিত তাঁহাকে তদনুরূপ শিক্ষা, যুক্তি ও পরামর্শ দিতেন। এখন তাহার যথেষ্ট অন্যথাভাব হইলেও, স্থল-

বিশেষে ঐরূপ হইয়া আসিতেছে। হিন্দুরাজত্ব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে—আমাদের অপরাপর বিষয়ের অবনতির সঙ্গে—পৌরোহিত্য-ব্যাপারেরও ব্যতিক্রম হইয়াছে, হইতেছে। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, উত্তরোত্তর যে আরও অধোগতি না হইবে, কে বলিতে পারে? তাই সময় থাকিতে থাকিতে তদ্বিষয়ে বদ্ধপরিকর হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া এই গুরুতর কাণ্ডে হস্তার্পণ করা গিয়াছে। এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা, সিদ্ধিদাতার উপর নির্ভর করিতেছে। সকলই সেই ইচ্ছাময় পরম পুরুষের ইচ্ছা।

হিন্দুধর্ম্মেতর অপর কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করা হইবে না। তুলনা করিবার আবশ্যক স্থলে, অথবা সমালোচনার প্রয়োজন হইলে, যতটুকু বলা যুক্তিসঙ্গত, তন্মাত্রই আমাদের বক্তব্য হইবে। সেই সীমা লঙ্ঘন না করাই আমাদের নিয়ম। বঙ্গের অধিরাজ পরিবর্ত্তনের আনুষঙ্গিক অস্মৎ-সমাজে—হিন্দু-পরিবারে—বাঙ্গালির গৃহস্থালীতে—যে ত্রুটি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তত্তাবতের গোপন বা অপলাপ না করিয়া, যথাযথ সংস্কারের চেষ্টাও আমাদের বর্ত্তমান পুরোহিত প্রকাশের নানা অভিপ্রায়ের এক অঙ্গ। তুলনা করিয়া শিক্ষা দিলে, বা কোন বিষয়ের বর্ণনা করিলে, পাঠকের মনে উপদেষ্টব্য বিষয়, প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় হয় বলিয়া ভিন্নদেশীয় রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ইতিহাস-জীবনী, দর্শন-বিজ্ঞান, কবিতা-গীতিকাও ইহাতে ভাষান্তরিত হইয়া মুদ্রিত ও আলোচিত হইবে। মধ্যকালের সঙ্গে তুলনা করিলে বিদ্যমান-কাল, হিন্দুধর্ম্মালোচনায় কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ বোধ হয়। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়।

বঙ্গসমাজের যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা, তাহা দেখিয়া সময়ে সময়ে বড় আশঙ্কা হয়। শাস্ত্রপাঠ অথবা শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাত হইতে অল্প-সংখ্যকই অভিলাষী। ইংরাজি-শিক্ষিত লোকে, অনেক সময়ে হিন্দুশাস্ত্রকে কুসংস্কারপূর্ণ নিঃসার গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে শাস্ত্রের যথাযথ নিষ্কর্ষ বোধগম্য করিতে রীতিমত পন্থা অধিক কৈ? তদ্বিষয়ে সুযোগও সকল সময়ে সুচারুরূপে ঘটিয়া উঠে কৈ? সকলে যাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বোধগম্য করিতে সমর্থ হন; প্রাচীন সময়ের হিন্দু-রীতি-নীতির, আচার-ব্যবহারের গূঢ় তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন; প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রনিহিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ জানিতে পারেন; হিন্দুগণের দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ,

কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির অনুশীলন হয়; বিদ্যমান কালে হিন্দুসমাজে যে সকল অযৌক্তিক রীতি-নীতি প্রবিষ্ট হইয়াছে, তত্তাবতের অনুপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; এবং যাহাতে প্রত্যেক হিন্দুই, সমাজের হিত-সাধনে যত্নবান্ হন, "পুরোহিত" তাহার আনুকূল্য করিবেন। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের সকল কথা আমাদের আলোচ্য। "পুরোহিত" হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক, অসাম্প্রদায়িক পত্রিকা হইল।

বেদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ (১), উপনিষৎ, গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই অবসর মতে অনুশীলন করা যাইবে। ধর্ম্মসংক্রান্ত গল্প, ধর্ম্মভাবোদ্দীপক বৃত্তান্ত, শাস্ত্রীয় উপাখ্যান, উপদেশ ইত্যাদিও ইহাতে অপ্রকাশিত থাকিবে না। তদ্ভিন্ন সামাজিক ও সাহিত্যসংক্রান্ত আলোচনাও পুরোহিতে স্থান পাইবে। বিবিধবিষয়িণী সমালোচনাও না করা যাইবে, এমন নয়। প্রয়োজন বুঝিলে, চিত্রময় প্রতিরূপ, প্রতিকৃতি প্রকটিত হইবে। তদ্দ্বারা সমালোচ্য বিষয় বিশদ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এমন বস্তু বা বিষয় নাই, যাহা হইতে কোন না কোন শিক্ষা না পাওয়া যায়। উপদেশ লাভ করিবার উদ্দেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গল্প, উপন্যাস, আখ্যায়িকা ইত্যাদি আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে। সময়ে সময়ে ঐ সকল প্রকাশিত হইতে থাকিলে, তাহাতে শিক্ষা কিছু কিছু তো হইবেই হইবে; এতদ্ব্যতীত আমাদের অপর অভিপ্রায়ও না আছে, এমন নয়। প্রথম প্রথম শাস্ত্রীয় কথা, যাঁহাদের কর্ণকঠোর প্রতিভাত হইবে, ক্রমে তাঁহাদের মত, পরিবর্ত্তিত করিতেও ঐ উপায় এস্থলে উদ্ভাবিত। শাস্ত্রে আছে,—

"রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।"

কর্ম্ম করিলে তাহার ফল আছেই আছে। তবে অমুক কর্ম্মে এত অধিক ফল পাওয়া যায়, এরূপ উক্তি—কেবল কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্দেশেই রচিত। কর্ম্মপ্রবৃত্তির জন্যই শাস্ত্রের এরূপ শিক্ষা। দূর্ব্বাষ্টমী, অনন্তব্রত, সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি সকল ব্রত-কথাতেই আছে,—

"ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্"

(১) ব্রাহ্মণ—বৈদিকগ্রন্থ।

এই ব্রত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; এইরূপ বলিবার কারণ কি ? ব্রতের প্রতি ভক্তির উদ্রেক করান, কি তাহার কারণ নয় ? আর, নীতির উপদেশে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত উপদেশকদিগকে বালকদিগের সকাশে যেমন গল্পের ছলে বক্তব্য-বিষয়টী বিবৃত করিতে হয় (১), সেইরূপ আমাদিগকেও কূট, কঠোর অথচ প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উদ্দেশে ঐ সকলের অবতারণা করিতে হইবে। ধর্ম্ম, যাঁহাদের বিস্বাদ বোধ হয়, তাঁহাদের হিতার্থেই উক্ত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কটু, কষায়, অথবা তিক্ত দ্রব্য ব্যবহারের পর ভোক্তার—সুস্বাদু ফল, সুমধুর মধু বা অপর সুমিষ্ট দ্রব্য আস্বাদনে ব্যাকুলতা জন্মান যেমন স্বভাবসিদ্ধ, সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশে অনভ্যস্তকে ধর্ম্মপথের পথিক করিতে হইলে, ঐ উপায় অবলম্বনীয় হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে।

বৈদেশিক গল্পে যাঁহাদের বিরাগ—বিতৃষ্ণা, তাঁহাদের চিত্ততৃপ্ত্যর্থে আর একটুকু বলিতেছি। হিন্দুধর্ম্ম-মহীরুহ, এত বহু শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত যে, তত্তুল্য কল্পপাদপ, জগতের ইতিবৃত্তে দুর্লভ। বিদেশীয় ও বিজাতীয় উপদেশ-কথা, পরোক্ষ বা মুখ্যভাবে লইলে, তাহাতে কোন হানি নাই। ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারেরাই তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ বিষয়ে ক্ষতি হওয়া অপেক্ষা উপকারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তদর্থেই তাঁহারা বলিতেন,—

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং।
নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

সুতরাং অনুকরণে পাতিত্য কোথায় ?

স্বধর্ম্মনিরত, শাস্ত্রপারদর্শী জ্ঞানবান্ ; ভক্তিপরায়ণ সাধু ; আর বঙ্গসাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত ব্যক্তি,—এই শ্রেণীত্রয়ের লেখকের প্রবন্ধ আমরা মুদ্রিত করিব। তদ্ভিন্ন যাঁহাদের খ্যাতি নাই, অথবা কিছু কিছু নাম আছে, এমন একদল লেখককে উৎসাহিত করা, আমাদের এক অভিপ্রায়। ঐরূপ লক্ষ্য বলিয়া অযোগ্য কোন প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইবে না। আমাদের পত্রিকার

(১) "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।"—হিতোপদেশ।

লেখকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুতরাং বলা বাহুল্য-মাত্র যে, লেখকদের পরস্পর মতবিরুদ্ধ প্রবন্ধ, পুরোহিত-কলেবরে স্থান-প্রাপ্তি-বিষয়ে বঞ্চিত হইবে না। তবে যে যে স্থলে আমাদের বক্তব্য থাকিবে, তথায় টীকায় সম্পাদকীয় মতামত প্রকটিত না হইয়া, প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবে না। ভাষার বিশুদ্ধি-বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি থাকিবে। তবে যে লেখক, আমাদের ইঙ্গিতে সম্মত না হইবেন, তাঁহার ভাষা অবিকলই প্রকাশিত হইবে।

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, তত্ত্বাবধায়ক ও পরিদর্শকগণ নানাশাস্ত্রপারদর্শী অধ্যাপক; সুতরাং উদ্দেশ্য-সাফল্য-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অহিন্দু অথবা অসম্পূর্ণ হিন্দু অর্থাৎ অৰ্দ্ধ-হিন্দুভাবাপন্ন যাঁহারা, এরূপ লোকদিগকে আমাদের দলে আনিয়া সম্পূর্ণ হিন্দু করার চেষ্টা আমাদের যথাসাধ্য থাকিবে। যে সকল দোষ, গোপনে সংশোধিত করিতে পারা যাইবে, তাহা প্রকাশ্যরূপে না করাই, আমাদের মত। যাহা গোপনে ইঙ্গিত করিলেও অসংশুদ্ধই থাকিবে, তাহার প্রকাশ্য সমালোচনাই আমরা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া যথামতি তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। যাজক-সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি করাও আমাদের লক্ষ্য।

ধৰ্ম্মশাস্ত্র, দর্শনগ্রন্থ, সাহিত্য, ইতিহাস, বঙ্গভাষা ইত্যাদি বিষয়ে যদি কেহ কোন বিষয় প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সমস্ত প্রশ্নই পুরোহিতে প্রকাশিত হইবে। প্রাগুক্ত বিষয় ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের কোন তত্ত্বের কেহ জিজ্ঞাসু হইবার ইচ্ছা করিলে, তাহাও আমরা পরম সমাদরে পত্রস্থ করিব। শিক্ষা বা উপদেশ-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তাহাও এই পত্রে মুদ্রিত হইবে। অপর সাধারণ যে কেহ, উক্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিয়া পাঠাইলে, তাহাও মুদ্রিত করা যাইবে।

গৃহস্থের পুত্র-পৌত্র, পুরোহিতের নিকটেই হিতশিক্ষা, নীতি-উপদেশ ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশ ও বিদেশের গল্প, কবিতাদিও শুনিতে ভালবাসিতেন। সকল স্থলে না হউক, অতি অল্প স্থলে অদ্যাপি সেই প্রাচীন প্রথার ভগ্নাবশেষ-মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা প্রাচীনত্বের পক্ষপাতী, পুরোহিতের প্রলুপ্ত গৌরব রক্ষায় বদ্ধকটি,—সুতরাং আমাদের মুখ দিয়া শাস্ত্রোপদেশের আনুষঙ্গিক দেশবিদেশের নানা কথা, নানা তত্ত্ব বাহির হইবে।

প্রত্যেক হিন্দুই আমাদিগের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া আমাদিগকে

উৎসাহিত করিবেন। আমরা সকলেরই আনুকূল্যপ্রার্থী। মতের অনৈক্য-বশতঃ আমরা যেমন অপরকে অপ্রিয় মনে করিব না, তেমনই আমাদিগকেও যেন কেহ অপ্রিয় না ভাবেন। আমরা এস্থলে আর্য্য পিতামহগণের বাক্যে প্রার্থনা করি,—

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥

—অথং সং ১৯, ৬২, ১।

হে জগদীশ্বর! কেবল দেবজাতি ব্রাহ্মণদিগেরই প্রিয় করিও না, অথবা রাজজাতি ক্ষত্রিয়দিগেরই প্রিয় করিও না; কেবল বৈশ্যজাতিরই প্রিয় করিও না, অথবা শূদ্রজাতিরই প্রিয় করিও না; কিন্তু সকলেরই প্রিয় কর।

যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।

হে বিধাতা! যাহা কল্যাণ-কর, তাহাই বিধান কর।

শুভ অগ্রহায়ণ মাস।

জ্যোতিষ্ শাস্ত্র উচ্চরবে বলেন,—

মার্গশীর্ষে শুভে মাসি যায়াৎ যাত্রাং মহীপতিঃ।

মহীপতি, শুভ অগ্রহায়ণ মাসে যাত্রা-গমন অর্থাৎ রাজ্য-পরিক্রমণাদি করিবেন।

উক্ত অনুমতি, কেবল মহীপতির পালনীয় কেন, আমাদের সকলেরই পালনীয়। বলা বাহুল্য, পুরোহিত পত্রিকাও উক্ত অনুমতির বাধ্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং ঋতূনাং কুসুমাকরঃ।

—গীতা, ১০ অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক।

মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ মাস আমি। ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু আমি।

গীতার দশম অধ্যায়ে এই কথা আছে। তথাকার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। যাহা কিছু উত্তম, তাহাও তিনি। সত্য সত্যই মার্গশীর্ষ মাস, শুভ ও শ্রেষ্ঠ। এই মাস, কোন এক সৃষ্টির আদি, কোন এক যুগের মূল এবং কোন এক বৎসরের অগ্র অর্থাৎ প্রথমাংশ। এই মাসে নানাপ্রকার সুখসেব্য খাদ্যের উৎপত্তি হয়। সেই জন্য এ মাস সৃষ্টি-বিশেষের আদি। এই মাস, পরিবর্ত্তন-ক্রিয়ার মূলসূত্র। তন্নিমিত্ত এ মাস, যুগ-বিশেষের আদি। এই মাস হইতে বৎসর-বিশেষের গণনা আরব্ধ হইত, সে কারণেও এ মাস, বৎসরের অগ্র অর্থাৎ প্রথমাংশ। বৎসরের অগ্রভাগ বলিয়া শুভ মার্গশীর্ষ মাসের অন্য নাম অগ্রহায়ণ। অগ্র—প্রথমাংশ, হায়ন—বৎসর।

এতদ্দেশীয় শাস্ত্রবিশেষে ও কার্য্যবিশেষে পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন এইরূপ ক্রমানুসারে বৎসর গণনা করা হয়। দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়নে এক বৎসর। এতাদৃশ বৎসরের মূল বা গণনারম্ভকাল—মার্গশীর্ষ। অভিধানকর্ত্তা অমরসিংহ বলিয়াছেন,—

মার্গাদীনাং যুগৈঃ ক্রমাৎ।

মার্গশীর্ষাদি দুই দুই মাসে ক্রমান্বয়ে হিম প্রভৃতি ছয় ঋতু গণনা করা হইয়া থাকে। মার্গশীর্ষ ও পৌষ হিম, মাঘ ও ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ, এই ছয়টি ঋতু। ইহার সমষ্টিতে বৎসর হইয়া থাকে। এরূপ বৎসরের আদি মার্গশীর্ষ। সুতরাং মার্গশীর্ষ—অগ্রহায়ণ অর্থাৎ বৎসর-বিশেষের আদি।

মার্গশীর্ষ প্রভৃতি মাসের নাম নক্ষত্র-ঘটিত। পূর্ব্বকালে নক্ষত্র-বিশেষের নামে বিশেষ বিশেষ মাসের নামকরণ হইয়াছিল। মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা যে মাসে থাকে, সে মাস মার্গশীর্ষ। পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা যে মাসে থাকে, তাহাকে পৌষ মাস বলে, ইত্যাদি।

যেমন মাসের নাম নক্ষত্র-চিহ্নিত; তেমনই বর্ষের নামও নক্ষত্র-চিহ্নিত। তাহা জ্যোতিষ্ শাস্ত্রে অতি প্রসিদ্ধ। জ্যোতিষ্ শাস্ত্রে মাস-চিহ্নিত বর্ষও উল্লিখিত হইয়াছে, দেখা গিয়া থাকে। অনির্দ্দেশ্য অনাদি কাল হইতে এই বিস্তীর্ণ ভারত-বর্ষে লক্ষ লক্ষ রাজা প্রজা, জ্ঞানী গুণী, পণ্ডিত মনস্বী, জন্ম গ্রহণ করিয়া অস্ত-গামী হইয়াছেন এবং অসংখ্য প্রকার সামাজিক অবস্থাও বিপরিবর্ত্তিত হইয়া

গিয়াছে। সেই সেই সূত্রে এদেশের নানা রীতির মাস-বর্ষ-গণনাও উদয়প্রাপ্ত ও অস্তগত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন উপলব্ধ হয়। আমরা এতদ্দেশীয় জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের ও কর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় দ্বিবিধ চান্দ্র মাস, একবিধ সৌর মাস, সাবন মাস ও নাক্ষত্র মাস এবং সর্ব্বসমেত ১০৭ প্রকার বর্ষ থাকার সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। ১০৭ প্রকার বৎসর কি কি, তাহা বলিতেছি।

চান্দ্র বর্ষ	২
সৌর বর্ষ	১
সাবন বর্ষ	১
নাক্ষত্র বর্ষ	২৭
মাস বর্ষ	১২
সংবৎসর	১
পরিবৎসর	১
ইদাবৎসর	১
উদাবৎসর	১
প্রভবাদি বর্ষ	৬০
	১০৭

তিথি অনুসারে যে বৎসর গণনা করা যায়, তাহা চান্দ্র বর্ষ। শুক্ল প্রতিপদ তিথি হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে এক মুখ্য-চান্দ্র মাস হইয়া থাকে। এইরূপ ১২ মাসে যে বৎসর গণিত হয়, তাহা প্রধান চান্দ্র বৎসর। কৃষ্ণ-প্রতিপদ তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে এক গৌণ চান্দ্র মাস হয়। এইরূপ ১২ মাসে এক গৌণ চান্দ্র বৎসর হইয়া থাকে। যত দিনে সূর্য্যের এক রাশি ভোগ করা সমাপ্ত হয়, তত দিনে এক সৌর মাস হয়। এইরূপ ১২ মাসে এক সৌর বৎসর। ৩০ দিনে এক সাবন মাস হইয়া থাকে। এইরূপ ১২ মাসে এক সাবন বৎসর। নক্ষত্রের সংখ্যা ২৭। তদনুসারে ২৭ দিনে এক নাক্ষত্র মাস। এইরূপ ১২ নাক্ষত্র মাসে এক নাক্ষত্র বর্ষ। বৃহস্পতির অস্ত ও উদয় লইয়া একপ্রকার বর্ষ গণিত হইয়া থাকে। এ বর্ষও কতকটা নক্ষত্রঘটিত। সুতরাং তদনুযায়ী মাসের নাম অনুসারে বর্ষের নামকরণ হইতে দেখা যায়। যেমন কৃত্তিকা নক্ষত্রে বৃহস্পতি গ্রহের উদয় ও অবস্থিতি দৃষ্ট হইলে, সেইকাল কার্ত্তিক বর্ষ নামে প্রখ্যাত হয়,—তেমনই মৃগশিরা নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে মার্গশীর্ষ নাম প্রাপ্ত হইবে। ইহাকেই মাসবর্ষ কহে। সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, উদাবৎসর, জ্যোতিষ্শাস্ত্রীয় সঙ্কেত অনুসারে গণিত হইয়া থাকে। প্রভবাদি ৬০ প্রকার বৎসরও ঐ নিয়মানুসারে গণিত হয়। সময়ান্তরে সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইবে।

তিথি-বিহিত কার্য্যে চান্দ্র বর্ষের ব্যবহার দেখা যায়। বিবাহাদি সংস্কার-কার্য্যে ও তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর পূজায় সৌর বর্ষের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বেতন-দানাদি লৌকিক কার্য্যে সাবন বর্ষের ব্যবহার এবং আয়ু-গণনা প্রভৃতিতে নাক্ষত্র বর্ষের ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কোষ্ঠী গণনায় মাস-বৎসরের

ও বৎসরের ফলাফল-নির্ণয়ে সংবৎসরাদি বর্ষের গ্রহণ হইয়া থাকে। উপরোক্ত বর্ষচক্রের বিষয় সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা এক্ষণে মুদ্রিত বৃহৎ-পঞ্জিকা নির্দ্দেশ করিতে পারি।

দিগ্দর্শনের পঞ্জিকা দেখিলেই, ঐ সকল বর্ষের মর্ম্ম কি, বুঝিতে পারিবেন। উদাহরণের জন্য পঞ্জিকার দুই একটি কথা লিখিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন, এ বৎসরের পঞ্জিকাতেও এইরূপ লেখা আছে,—

"বিষ্ণুবিংশতো সৌরগতাশ্বিনস্য ঊনবিংশতিদিনাবধি এতদ্বর্ষীয়াশ্বিনস্য পঞ্চদশদিনপর্য্যন্তং বিশ্বনামা বর্ষঃ। * * তৎপরে প্রভবনামা বর্ষঃ। * * অস্মিন্ বর্ষে জ্যৈষ্ঠস্য তৃতীয়দিবসে ভরণীনক্ষত্রে গুরোরুদয়ে আশ্বিন-নামা বর্ষঃ * * ইত্যাদি।"

এ সকল দেখিলে প্রতীত হয় যে, পূর্ব্বে কার্য্যবিশেষে ১০।১৫ দিনেও এক একটি বর্ষ সমাপ্ত হইত। সে সকল বর্ষ, আমাদের নিতান্ত অপরিচিত থাকায় অথবা ব্যবহারগোচরে না থাকায়, আমরা ৩৬৫ দিনে বৎসর ব্যতীত ছোট ছোট বৎসর থাকা স্মরণ করিতে পারি না (১)। কেহ দশ হাজার বৎসর রাজ্য করিলেন, কেহ পাঁচ হাজার বৎসর তপস্যা করিলেন, কেহ লক্ষ বর্ষ বাঁচিলেন, এই সকল পৌরাণিক কথায় বোধ হয়, ঐ সকল ক্ষুদ্র বর্ষ অভিহিত হইয়াছে। শ্রুতিতে একটি সহস্র-সংবৎসর-সাধ্য যজ্ঞের বিধান আছে। মীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনি ঋষি, মীমাংসাস্থলে বলিয়াছেন, ঐ সংবৎসর শব্দ, দিনবাচী; অর্থাৎ ঐ যজ্ঞ, সহস্র দিনে সমাপনীয়। মীমাংসার উক্ত স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে,—

সহস্রসংবৎসরং তদায়ুষামসম্ভবান্মনুষ্যেষু।

—মীমাংসাদর্শন ৬, ৭, ৩১।

অর্থাৎ মনুষ্য ততকাল জীবিত থাকে না, সুতরাং ঐ শ্রৌতবাক্য দিনপর। মনুষ্য সহস্র বৎসর জীবিত থাকে না, এই কথায় আর একটি সিদ্ধান্ত-কথা মনে পড়িল। কি সত্যযুগ, কি ত্রেতাযুগ, কি দ্বাপরযুগ, কি কলিযুগ, মনুষ্য সকল

(১) মধ্যে কিছুকাল ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা হইত।—পুরোহিত-সম্পাদক।

কালেই শতায়ুঃ (২)। "লক্ষবর্ষং পরমায়ুঃ" পঞ্জিকায় লিখিত এ কথা শ্রৌত প্রমাণ অনুসারে সংকোচ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ—প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ৫, ৬।

মানবের আয়ু, শত বর্ষ। তবে যে সহস্র বৎসর, লক্ষ বৎসর, আয়ু এইরূপ কথা শোনা যায়, বোধ হয়, ঐ সকল বৎসর, প্রভব-বর্ষাদি গণনায় অভিহিত। শাস্ত্র, যখন দিবসকে বর্ষ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন আর তাহা আমরা বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন?

উপসংহার-কালে আরও বক্তব্য এই যে, অগ্রহায়ণ মাস শুভ মাস, এই বিশ্বাসের প্ররোচনায় অগ্রহায়ণ মাসেই এই শুভ মাসিক পত্রের প্রচার আরম্ভ করা গেল।

হায়নস্য বৎসরবিশেষস্য অগ্রং আদিঃ

এই নাম-নির্ব্বাচন-দৃষ্টে অনুমান হয়, কোন এক সময়ে অগ্রহায়ণ মাস হইতে বর্ষ গণনা আরব্ধ হইত। এখন যেমন বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হয়, বৈশাখ মাসই বৎসরের প্রথম মাস, তেমনই পূর্ব্বে হয়তো ভারতের কোন এক প্রদেশে অগ্রহায়ণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হইত; তদনুসারে উহা বর্ষের প্রথম মাস। যাহাই হউক, অগ্রহায়ণ মাস, এখন বৎসরের প্রথম মাস না হইলেও, শুভ মাস বটে।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

বঙ্গে দেবপূজা।

কবি গাইয়া গিয়াছেন ঃ—

"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।"

বাস্তবিক বঙ্গদেশের মত রঙ্গভরা দেশ আমরা কুত্রাপি দেখি নাই। অযোধ্যা, পঞ্জাব, সিন্ধু গিয়াছি; কলিঙ্গ, দক্ষিণ, মহারাষ্ট্রে গিয়াছি; বঙ্গদেশের

(২) সুপ্রাচীন বৈদিক কালেও যে মনুষ্যের শতবর্ষ পরমায়ু ছিল, তাহা সামগাচার্য্য শ্রীমৎ সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বিশদরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে; কোন সময়ে বলিব।—পুরোহিত-সম্পাদক।

মত পূজাপার্ব্বণ, ক্রিয়াকাণ্ডের ধূমধামে পূর্ণ কোন দেশ দেখি নাই। এখানকার সমাজে দিবারাত্র, দিন দিন, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে কেবলই পূজা-পার্ব্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, বার-ব্রত চলিতেছে। সামাজিক উৎসব, পারিবারিক উৎসব ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেশ অনুদিন আনন্দে পরিপূর্ণ আছে। আজি দুর্গোৎসবে দেশ মাতিয়াছে, কালি রাস, পরশ্ব সরস্বতীপূজা; আজি পৌষপার্ব্বণ, কালি জামাইষষ্ঠী, পরশ্ব ভ্রাতৃদ্বিতীয়া; এ সমস্ত উৎসব-ব্যাপারই, সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব। আবার দেখ, গৃহলক্ষ্মী, গৃহের কোণে বসিয়া শুদ্ধাচারে ঐকান্তিক ভক্তিতে ব্রতের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন; ব্রতের দিন সংযতচিত্তে—উপবাসে মুখ শুষ্ক বটে কিন্তু ধর্ম্মামোদে প্রফুল্ল হইয়া পূজার জন্য ধূপদীপ জ্বালিয়া দিতেছেন। পূজা হইতেছে, তিনি ভক্তির মনে ধর্ম্মানন্দে পুরোহিত-পার্শ্বে বসিয়া সমুদায় শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন; তত একাগ্রচিত্ত আর বুঝি কাহাকেও দেখি নাই। এ সমস্ত ইংরাজী চর্চ্চের শুষ্ক ব্যাপার নহে; মসিদের ফাঁকা আওয়াজ নহে। ব্রহ্মচর্য্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে হিন্দু দেবোপাসনায় অনুরক্ত। এই আমোদে দেশশুদ্ধ প্লাবিত ও উন্মত্ত।

হিন্দুর জীবন সূতিকাগার হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। মৃত্যুর পরও তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। তাহার পূজা নির্জ্জনে ও নিভৃত গৃহমধ্যে। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া নিজ অন্তরে দেবতাকে দেখেন, উপর দিকে শূন্য আকাশের পানে চাহিয়া উপাসনা করেন না। তাঁহার দেবমন্দির চর্চ্চ্ ও মসিদের মত শূন্য নহে, তাহাতে দেদীপ্যমান দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এই দেবমূর্ত্তি সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-দেবেরই রূপপ্রতিমা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই ব্রহ্মাণ্ডদেব যে অনন্তশক্তিতে সাধকের মনে উদয় হন, তাহারই এক একটি কল্পনা-বিকাশ ও সাধনোপযোগী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই অনন্ত ঈশ্বরকেই হিন্দু পূজা করেন। যে সচ্চিদানন্দের রূপ যোনি বা শিবলিঙ্গ, তাহাই বাঙ্গালীর দশভূজা, জগদ্ধাত্রী ও কালী। হরপার্ব্বতী পুরুষপ্রকৃতির রূপ; বেদ ও গায়ত্রীর মূর্ত্তি সরস্বতী। আর আত্মার সহিত পরমাত্মার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ যোগ দ্বারা ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার একেবারে সম্মিলন ঘটিয়া আত্মার মুক্তি-সাধন হয়, সে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কেবল স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। এজন্য যোগের সেই ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ, হিন্দুঋষি কৃষ্ণরাধার লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন। রাধিকা প্রকৃতির পরম তত্ত্ব, কৃষ্ণ পুরুষের রূপ ; তাঁহাদের আসক্তিই কৃষ্ণরাধার প্রেম। আত্মা যখন সংসারের কুটিলতা ও মায়া হইতে পরিব্রাজিত হয়েন, তখন তাহার ব্রজভাব ঘটে। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী ; ব্রজেশ্বরীর মিলন বৃন্দাবনে। যত দিন না আত্মার সংসারবীজ সমস্ত বিনষ্ট হয়, তত দিন তাহার মুক্তি নাই। এই সংসারবীজ ও সাংসারিকতা নির্ব্বাণ করিবার জন্য কৃষ্ণবিরহ। প্রকৃতিপুরুষের ঘনিষ্ঠতাই জগৎসংসার, জগতেই পুরুষপ্রকৃতি ঘোর আসক্ত ; তাহাদের বিচ্ছেদই মুক্তির সোপান। রাধার শত বৎসর বিচ্ছেদে—জীবাত্মার শত বৎসরের অনাসক্তিতে মুক্তিলাভ। শত বৎসরের পর রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলন। মিলনে জীবাত্মার মোক্ষপদ। যোগের এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব এক একটী করিয়া হিন্দু, অবয়বী কল্পনায় কৃষ্ণলীলায় মুর্ত্তিমান করিয়া দেখাইয়াছেন। যোগে জীবাত্মা পরমাত্ম-তত্ত্বের সহিত যত ভাবে রমণ করেন, তাহার অনুভব ও মিলনের যত প্রকার স্তর অথবা পারমার্থিক অবস্থা আছে, তৎসমুদয় কৃষ্ণলীলায় প্রকটিত। কৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন তিনি সাংখ্যের উদাসীন পুরুষ—প্রকৃতিতে অনাসক্ত—বিষ্ণুশক্তিতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিতেছেন—মহাযোগী জগতের হিতব্রতে ব্রতী। দ্বারকা-লীলায়ও সেই ব্রত। রুক্মিণীর উদ্বাহে ভক্তের উদ্ধার-সাধন। যোগী ভিন্ন কে এ ভাব বুঝিবে ? এ ভাব পিতা-পুত্রের, বা প্রভু-ভৃত্যের, বা রাজা-প্রজার দূর সম্বন্ধ নহে। প্রজাপালনরূপ গোপালনে (গো অর্থে প্রজা) কৃষ্ণ, সংসার-ধাম-রূপ গোষ্ঠে বিহার করেন। অপরাপর গোপালেরা (প্রজাপালক বা দেবতারা) সখ্যভাবে তাঁহার সহিত সেই গোষ্ঠে ক্রীড়া করেন। রাধিকা অতি মধুর-ভাবে আরাধনায় রত ; রাখালরাজের সহিত মিলনের জন্য একান্ত আকুল। রাধার অনুরাগ সহস্ররূপে গোষ্ঠলীলায় ব্যাখ্যাত। নন্দালয়ে পিতা পুত্রের সম্বন্ধে কৃষ্ণ দেখা দিয়াছেন। কিন্তু অপরাপর ধর্ম্মে যেরূপ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ, এ সেরূপ সম্বন্ধ নহে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের অনুরাগ তত প্রগাঢ় নহে, যত সন্তানের প্রতি মাতাপিতার অনুরাগ। বাৎসল্য, বোধ হয় ভক্তি অপেক্ষা প্রগাঢ়তর। হিন্দুর ঈশ্বরানুরাগ, বাৎসল্য অপেক্ষাও বোধ হয় অধিক। যশোদা ও নন্দের বাৎসল্য একদা হিন্দুর দেবানুরাগের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। সেইরূপ অনুরাগে হিন্দুরা দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন। হিন্দুরা দেব-

তাকে ক্ষীর ননী খাওয়ান। হৃদয়ের উৎকৃষ্ট উপহার পুষ্প-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বিতরণ করেন। এ ভাবকে ভক্তি বলিলে যেন কিছু দূর দূর বুঝায়। তবে বল বাৎসল্য; শুধু বাৎসল্য, নহে—যশোদা ও নন্দের স্নেহানুরাগ—যে স্নেহ শত রজ্জুতে কৃষ্ণকে বাঁধিতে চাহে। কিন্তু সে স্নেহ অপেক্ষা বুঝি আরও কিছু উৎকৃষ্ট জিনিষ আছে। যদি আর কিছু উৎকৃষ্ট জিনিষ থাকে, সে দ্রব্য রাধিকার কৃষ্ণানুরাগ। হিন্দুর দেবানুরাগ ক্রমশঃ স্ফূরিত হইয়া বাৎসল্য ভাব অপেক্ষাও প্রগাঢ়তর হইয়াছে। প্রগাঢ়তর হইয়া রাধার প্রেমে উপনীত হইয়াছে। কৃষ্ণ আরও ঘনিষ্টতর হইয়া আসিয়াছেন। আসিয়া পতি-পত্নীর সম্বন্ধে মিলিত। কিন্তু ঠিক্ পতি-পত্নীর সম্বন্ধেও একটু যেন দূর-ভাব আছে। পত্নী, পতিকে খুব নিকট দেখেন বটে, অথচ যেন একটু উচ্চ উচ্চ প্রভুভাবে দেখেন। কেবল যে ললনা লুকাইয়া পতি-অনুরাগিণী হন, তাঁহার প্রেমে সে প্রভুতার দূরভাব নাই। রুক্মিণীর প্রেম সেইরূপ প্রেম, আর রাধার প্রেম সেইরূপ প্রেম। সেই গোপনীয় প্রেমে রাধা, কৃষ্ণকে ভালবাসিতেন। তাঁহার সহিত ক্ষণিক মিলনের জন্য লালায়িত হইতেন। মিলন হইলে আনন্দসাগরে ভাসিতেন। যেমন বিষয়ী, অর্থের জন্য লালায়িত; যেমন যোগী, ঈশ্বরের জন্য লালায়িত; সেইরূপ লালায়িত রাধিকা। ক্ষণিক মিলনে যেমন যোগীর আনন্দ, রাধিকার আনন্দ ততোধিক। রাধিকা এইরূপ অনুরাগে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। এ যোগ, পতি-পত্নীর যোগ অপেক্ষাও গাঢ়তর। এ প্রেম, স্ত্রীপুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ঠ অনুরাগ। এ অনুরাগ যোগীর অনুরাগ। যে অনুরাগ সংসার-মায়ার উপর বিজয়ী, সেই অনুরাগ রাধিকার অনুরাগ, সেই অনুরাগ হিন্দুযোগীর ঈশ্বরানুরাগ। সেই অনুরাগের ক্রম-স্ফূর্ত্তি যোগতত্ত্বে অনুভবনীয়। সেই ক্রম-স্ফূর্ত্তির বাহ্যবিকাশই কৃষ্ণলীলা। হিন্দু এইজন্য রাধিকা ও কৃষ্ণলীলায় উন্মত্ত হন—নন্দ-বিদায় ও রাধার প্রেম দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করেন—দেব-দোল ও রাসে মাতিয়া যান।

ভারতের অন্যত্র হিন্দুর যে সমস্ত সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত দেখা যায়, বঙ্গদেশে সেই ভাব সহস্র আকারে প্রকটিত। বাঙ্গালী ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেরও পূজা করেন। বঙ্গে সকল দেবতারই আদর। বঙ্গবাসিগণ দেব-দেবীর এত আদর করিয়া থাকেন যে, শুদ্ধ পৌরাণিক দেব-দেবী নহে, শীতলা প্রভৃতি

অপর দেবতারও পূজা করিয়া থাকেন। অনন্তদেব সর্ব্বরূপেই পূজিত। সকল দেবপূজার অগ্রে শালগ্রাম-শিলায় অনন্তদেবতার নিদর্শন রক্ষিত হয়। সম্মুখে অনন্তদেব, তবে দেবপূজা। অনন্তদেবের সাক্ষিভূত যেমন শালগ্রাম, তেমনই সমস্ত দেবতা। সমস্ত দেবতার পূজায় সেই অনন্তদেবই পূজিত হইয়া থাকেন। পূজিত হন, ষোড়শোপচারে। এ পশ্চিমাঞ্চলীয় শৈব-দিগের শিবপূজা নহে। বাঙ্গালী, দেবতাকে অষ্টালঙ্কারে ভূষিত করেন, সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপহার দেন। যাহা কাহাকেও না দেওয়া হয়, অগ্রে তাহা দেবতাকে সমর্পিত হয়। দেব-প্রসাদী না হইলে নূতন সামগ্রী ব্যবহৃত হয় না। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, দেবভক্তি উভয়েরই সমান। বৈষ্ণবও হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে পরিপূরিত। উভয়েই নব পট্ট-বস্ত্রে, পবিত্র-চিত্তে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া, শুষ্কমুখে অথচ প্রফুল্ল হৃদয়ে, দেব-সম্মুখে ভক্তির সহিত কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান। দেবতাকে শত-সুন্দররূপে একদৃষ্টিতে দেখেন। দেব-প্রসাদ-লাভার্থ কোটি কোটি স্তব-স্তুতি করেন। চিরব্রহ্মচারী বৈষ্ণবদিগের দেবানুরাগ বুঝি আরও প্রগাঢ়তর। তাঁহারা রাধার প্রেমাদর্শে নিজ হৃদয়কে ভক্তিপূর্ণ করিতে চাহেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য ততই লালায়িত হইতে চাহেন। তাঁহারা রাধার প্রেমাদর্শে উন্মত্ত, সেই প্রেমে গদ্গদচিত্ত। ভক্তের অনুরাগে রাধাকে ভালবাসেন। রাধাকে ভালবাসেন এই জন্য যে, তিনি সমভাবে কৃষ্ণের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি দেবতা। তিনি মানব-প্রকৃতির পরমেশ্বরী। সেই রাধা, বৈষ্ণবদিগের জপমালা। রাধা জপমালা নয়, তাঁহার অমানুষ দেবতুল্য প্রেমই জপমালা। কৃষ্ণের প্রতি তাকাইয়া তাঁহারা রাধার প্রেমে একদা অশ্রুবর্ষণ করেন। সেই প্রেমাশ্রুর তুল্য আর বুঝি কিছু পৃথিবীতে নাই। সেই প্রেমে বৈষ্ণবেরা সদানন্দচিত্ত ও সংসারবিরাগী—সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন; বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত জীবনকে কৃষ্ণ প্রেমে উৎসর্গ করিয়াছেন। এ কি মনুষ্যজীবন? দেবজীবন—নারদের দেবর্ষি জীবন! এ কি ভক্তি! দেবতার অনুরাগ—ভাগবতের দুর্লভ বিষয়। ভাগবত দেদীপ্যমান—সশরীরে দেদীপ্যমান! বাস্তবিক বৈষ্ণবদিগের ভক্তি দেখিলে আনন্দ জন্মে। তাঁহাদের সংকীর্ত্তনে বঙ্গদেশ অহরহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, জয়দেবের সুন্দর ললিত পদাবলীতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তাঁহারা দিবারাত্র

হরিনামামৃত পান করিয়া কালাতিপাত করেন। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, সকলেই সামাজিক ধর্ম্মোৎসবে সর্ব্বদা দেশকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ভারতের অন্যত্র এরূপ ঘটে নাই কেন? পুরাণের অধিকারী তো সবাই, আর এই পুরাণমধ্যে তো অনেক দেবতার কল্পনা আছে। শাস্ত্রে তাঁহাদের পূজার পদ্ধতিও দেওয়া হইয়াছে; তবে ভারতের অন্যান্য দেশে বাঙ্গালার ন্যায় পূজার বাড়াবাড়ি ও ধুমধাম নাই কেন? সেখানে আছে বটে, কিন্তু এতদূর নহে। তাহার বিশেষ কারণ আছে। বঙ্গদেশের ভূমির মত অপর কোন দেশের ভূমি তত উর্ব্বরা নহে। এখানকার চাষীরা সহজে প্রভূত ধন-ধান্যের অধিকারী হয়। কিছুদিন পরিশ্রম করিয়া বৎসরের বাকি দিন বসিয়া খায়। শুদ্ধ বসিয়া কি করিবে? ধন হইলেই লোকের দেবোত্তর বাড়ে। সুতরাং দেবারাধনা, পূজা, বার-ব্রত ও পার্ব্বণাদির উৎসবে বাঙ্গালী সংবৎসর সুখ-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করে। চাষীরা চাষ করে, ভদ্রজনগণ কৃষি-কার্য্যের ফল লাভ করিয়া গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলে। গৃহ পূর্ণ রাখিয়া উৎসবাদিতে সংবৎসর উন্মত্ত থাকে। কি ভদ্র, কি ইতর, জনসমাজের সমস্ত হিন্দুই ধর্ম্মোৎসবে উন্মত্ত। পূজার আয়োজনে সবাই ব্যতিব্যস্ত। ধনীর বাড়ীতে পূজা; দরিদ্রও আপনার পূজার সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, ভক্তি-সহকারে তাহাই দেব-সমক্ষে সমর্পণ করিয়া তবে তৃপ্তি-লাভ করেন। সন্ধ্যা আহ্নিক নহিলে হিন্দু জলগ্রহণ করেন না। প্রতিদিন এই কার্য্য ও অনুষ্ঠান। বঙ্গদেশের দেবপূজা, সামাজিক ধর্ম্মোৎসব, পূজার উন্মত্ততা এবং আনন্দের মত, বুঝি সে দেশে আর কিছু উৎকৃষ্টতর পদার্থ নাই। ধন-ধান্য-পূর্ণ বঙ্গদেশ ধর্ম্মোৎসবে পরিপূর্ণ। ধন-ধান্য-পূর্ণ বঙ্গদেশ বিলাসিতায় পূর্ণ নহে। সুখে, সমৃদ্ধিতে, আনন্দে—হিন্দু-বঙ্গ-সমাজ, হিন্দুর ধর্ম্মা-মোদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বঙ্গদেশের এ সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

বঙ্গে প্রতিমা-পূজা এক বিশেষ আকারে পরিস্ফুট হইয়াছে। বঙ্গদেশ ধান্যপূর্ণ ও শস্যপ্রাচুর্য্যে সুশ্যামল। এই সুশ্যামল দেশ, সৌকুমার্য্যে ও মধুরতায় পরিপূর্ণ। বসন্ত এখানে অতি সুমোহন বেশ ধারণ করে। তখন বঙ্গদেশের চারি দিকই মাধুরীময়। শরতের সুশ্যামকান্তি সৌন্দর্য্যে ক্রমশঃই মনোহর হইয়া উঠে। হেমন্তে শস্যক্ষেত্র হাসিতে থাকে। প্রাবৃট্‌কালে প্রবাহিনীর

শোভা, নৈদাঘে মনোমোহন মূর্ত্তি, এ সমস্তই সুন্দর ও রমণীয়। এই সুন্দর ও মাধুরীময় দেশে যে মানবজাতি থাকিবে, তাহাদের হৃদয় তেমনই গড়িয়া আসিবে। বঙ্গবাসিগণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রফুল্ল, মাধুরীতে চিরদিন বিমুগ্ধ। তাহাদের হৃদয় কে যেন সেই মাধুরী দিয়া কোমল করিয়া আনিয়াছে। বাঙ্গালীর হৃদয় সৌকুমার্য্যের আধার। কবির কমনীয় রসে বাঙ্গালী সুরসিক। অতি সুকুমার-রসে সে হৃদয় চিরদিন আর্দ্র আছে। মানবের যত কোমলভাব বাঙ্গালীর হৃদয়কে এজন্য অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গালীর ভক্তিতে আমরা সেই সৌকুমার্য্যের অনুভব করি। বাঙ্গালীর দেবতা সমস্ত দেবী। ভগবতীর মোহিনী মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রীর সুশান্ত রমণীয় ভাব, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সৌন্দর্য্য, শ্যামার করাল কান্তি, বাঙ্গালী আরও রমণীয় বেশে সুসজ্জিত করেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসের ও নারদের কৃষ্ণ নহেন—সে কৃষ্ণ যশোদানন্দন—যশোদার স্নেহমাখা পুত্তলী। বাঙ্গালী রাধার প্রেমে উন্মত্ত। যশোদার স্নেহে গলিয়া কৃষ্ণকে দেখেন। গোষ্ঠ ও মাথুর রসে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসেন। বৈষ্ণবের সুধাসঙ্গীত, কীর্ত্তনের মধুর তরঙ্গে প্রবাহিত। সেরূপ ধর্ম্মগীত ভারতের আর কুত্রাপি নাই। রামপ্রসাদের ভক্তিরসে শ্যামা ও কৃষ্ণ সুসংগীত। কবিওয়ালাদের গানে ভক্তি উৎসারিত। বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলীতে কৃষ্ণরাধার প্রেমের লালিত্য। কথকের মনোমুগ্ধকর বাক্যস্রোতে ও রসাভাষে বাঙ্গালীর হৃদয় বিগলিত। আর পূজার চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর মোহিনীমূর্ত্তি। তাঁহার মহাদেব উমাপতি—ভগবতীর বিরাটমূর্ত্তির শিরে ক্ষুদ্রাকারে চিত্রিত। দেবসেনা-পতি মহাবীর কার্ত্তিকেয় অতি সুন্দররূপে কলাপীর পৃষ্ঠোপরি আরোহিত। মেনকার স্বপ্নে ও আগমনীর সঙ্গীতে ভগবতীর উদয়। রাসের সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণরাধা শোভিত; দোলের প্রেমরাগে দোদুল্যমান। এইরূপ সুন্দর ও কোমলভাবে বাঙ্গালীর ভক্তিভাব প্রকটিত। বঙ্গদেশের দেবপূজা বঙ্গবাসি-গণের সুকোমল হৃদয়ের সুন্দর পরিচয়।

বঙ্গদেশের পূজা-পদ্ধতি ও ধর্ম্মামোদ, কি পৌত্তলিকতা? সে কি খৃষ্টানদিগের নিন্দার সামগ্রী Idolatry (পৌত্তলিকতা)? যে ধর্ম্মোৎসব সমগ্র জনসমাজকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কি নিন্দার বিষয়? যে জিনিষ ধন-ধান্য-পূর্ণ, সুখ-সমৃদ্ধ বঙ্গসমাজকে বিলাসিতা হইতে রক্ষা করিয়া ধর্ম্মানন্দে পরিপূর্ণ করি-

আছে, সে কি রকম নিন্দার জিনিষ? ধর্ম্মামোদী হিন্দুসমাজ খৃষ্টানের কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। খৃষ্টান মিশনরীগণ মহাভ্রান্ত। হিন্দুদিগের দেবপূজা Idolatry নহে, তাহা Symbollism। যাঁহারা হিন্দুদের দেবপূজার বিষয় ভালরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, সেই কোলব্রুক্ প্রভৃতি মহাজনগণ খৃষ্টান হইয়াও হিন্দুদের দেব-দেবীকে Symbollism বলিয়া গিয়াছেন। এই Symbollism অর্থাৎ দেবশক্তির নিদর্শনানুযায়ী প্রতিমা-পূজার ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম্মে প্রচলিত কেন? আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণ মানব-সমাজকে বিলক্ষণ বুঝিতেন বলিয়া এই ব্যবস্থা। তাঁহারা বুঝিতেন, জনসমাজের সকল লোক, সমান নহে; সবাই সমান জ্ঞানী নহে। জ্ঞানভেদে দেবানুভব বিভিন্ন হয় এবং তজ্জন্য দেবানুরাগও বিভিন্ন হইয়া পড়ে। লোকের জ্ঞানাধিকার যখন সমান নহে, তখন জ্ঞানীদের জন্য যে ব্যবস্থা, অজ্ঞানীদের জন্য সে ব্যবস্থা করা বিড়ম্বনামাত্র।

যাহাদিগের তর্ক করিবার শক্তি নাই, বিশ্বাসই যাহাদিগের প্রবল ও বিচারস্থানীয়, যাহারা কেবল সামান্য সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া চিরজীবন অতিবাহিত করে; শাস্ত্রালোচনা করিবার শক্তি, অবকাশ বা অধিকার যাহাদিগের নাই, সেই অসংখ্য, অগণ্য লোক সকলের দশা কি হইবে? অজ্ঞ শূদ্রজাতি, স্ত্রীজাতি, নীচবৃত্ত ও কলুষিত জনগণের সংখ্যাই জনসমাজে অধিক। এই সমস্ত লোকের জ্ঞানদ্বার যেমন অবরুদ্ধ, তাহাদের হৃদয় তেমনই প্রসারিত। সেই প্রসারিত ও প্রবল হৃদয়ের বিষয়ীভূত কি হইবে? সে হৃদয় তো শূন্য থাকিতে পারে না। যে হৃদয়ের পুত্রবাৎসল্য, মাতৃভক্তি, মমতা, মায়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, সে হৃদয় কি ঈশ্বরশূন্য হইয়া কেবলই সংসারে আবদ্ধ থাকিবে? হৃদয়ই যাহাদের সর্ব্বস্ব, সেই হৃদয়-বিশিষ্ট অসংখ্য জনগণের জন্য স্বতন্ত্র পূজাপদ্ধতি আবশ্যক। ব্যাস ভাবিয়া দেখিলেন, হিন্দুধর্ম্মে তো সে পূজাপদ্ধতির ব্যবস্থা বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। বেদে, উপনিষদে, দর্শনে দুই প্রকারই ব্যবস্থা আছে। জ্ঞানীদের জন্য নির্গুণ-বিদ্যা, অপরাপর জনগণের জন্য সগুণ-বিদ্যা। নির্গুণ-বিদ্যায় যাহারা অধিকারী নহে, তাহারা সগুণ ঈশ্বরোপাসনার অধিকারী। এই অধিকার লইয়াই হিন্দু-ধর্ম্ম গঠিত ও সম্পূর্ণ। অধিকার-তত্ত্ব হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান লক্ষণ। বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনে যে সগুণ ঈশ্বরোপাসনা পরিব্যক্ত আছে, তাহা আয়ত্ত

করা সামান্য ও অজ্ঞ জনগণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। যাহারা সে শাস্ত্রের অধিকারী নহে, যাহাদের বিশ্বাসই প্রবল, বিচারশক্তি অতি দুর্ব্বল, সেই সামান্য জনগণের জন্য বিশ্বাস-প্রধান কোন শাস্ত্র আবশ্যক। অধিকার-তত্ত্বানুযায়ী সমাজে সকল বিষয়েরই ব্যবস্থা আছে। সামান্য পাঠশালে ও বিদ্যালয়ে অধিকার অনুসারেই বালকগণকে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। লোকের খাদ্যাখাদ্য ও পথ্যাপথ্য অধিকার অনুসারেই নিয়মিত হয়। বিষয়-কার্য্য অধিকার অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট। ব্যবসায়-বৃত্তিও অধিকার নিয়মে পালিত। সকল বিষয়ই যখন অধিকারভুক্ত, তখন কি কেবল ধর্ম্মপ্রণালীই তাহা বর্জ্জিত হইবে? বরং ধর্ম্মপ্রণালীতে তাহা অধিকতর আবশ্যক। জনসমাজকে যখন পুণ্যপথের শাসনাধীন করিতে হইবে, তাহাদের হৃদয়কে যখন ভিজাইতে হইবে, তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি সমুদয় যখন দমনে রাখিতে হইবে, যখন জনসমাজকে এক বিশেষ প্রকার শিক্ষাধীন করিয়া ধীরে ধীরে মোক্ষ ও শান্তি আনিতে হইবে, তখন অধিকার অনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী ও তরিবদেরই তো অত্যন্ত প্রয়োজন। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্বে লোককে একেবারে লইয়া যাওয়া যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সে দিন-মাত্র এ কথা বুঝিয়াছেন; আমাদের দেশে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষিগণ তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, সামান্য জনগণের নিকট স্থূল তত্ত্বই গ্রহণীয়। স্থূল প্রতিমার পূজা তাহাদের যত মনোজ্ঞ, সূক্ষ্ম মানসিক উপাসনা তত প্রীতিকর হইবে না। সূক্ষ্মে উপনীত হইতে অনেক দেরি লাগে। সকলের বুদ্ধি তত দূর উচ্চ অধিকারশালিনী নহে। দেবমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া লোককে ভয় দেখাইতে হইবে। নহিলে শূন্যদেবতায় সামান্য জনগণ তত ভয় পায় না। যে পাপকার্য্যে দেবকোপ, সেই দেবতা সম্মুখে দেদীপ্যমান চাই। সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্করও হওয়া চাই, অথচ তাহাতে দেবসৌন্দর্য্য এবং জ্যোতিও চাই। এ সমস্ত উপায় নহিলে, সামান্য জনগণ শাসিত হইবে না, তাহাদের দেবপূজা হইতে পারে না। সেইজন্য ব্যাস, বেদ, উপনিষৎ ও দর্শন হইতে সগুণ-বিদ্যার মূলতত্ত্ব সকল গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা বিশ্বাসমূলীয় উপন্যাসাকারে কবিত্বপূর্ণ নানা পুরাণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ, হৃদয়ই যাহাদের সর্ব্বস্ব, জ্ঞানপ্রধান নীরস কথা তাহাদের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না, সে হৃদয়ের আকর্ষণ শুধু সৌন্দর্য্যময় কাব্য। সগুণ ঈশ্বরো-

পাসনার ভক্তিতত্ত্ব গীতায় নিহিত করিয়া, মহাভারতের বৃহৎ অবয়বী কল্পনায় সেই তত্ত্ব সমুদয় মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইলেন। কিন্তু এ ভক্তিতত্ত্ব তো সকলের জন্য নহে। রামায়ণেও সেই ভক্তিতত্ত্ব অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; তদনুসারে সমগ্র সমাজ চালিত হইতে পারে না। জনসমাজের উচ্চ অধিকারী জনগণের পক্ষে গীতার নিষ্কাম ভক্তিতত্ত্ব বিহিত হইতে পারে। আপামর সাধারণ জনগণের দশা কি হইবে? তাহারা যে নিম্ন-অধিকারী। জনসমাজে যে অগণ্য শ্রেণীর লোক বিদ্যমান। সেই নিম্নতর অধিকারী জনগণের জন্য সকাম ভক্তিতত্ত্বমূলক পূজা-পদ্ধতি আবশ্যক। মহাভারতে জ্ঞানাংশ এত অধিক যে, তাহা পঞ্চম বেদস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইল। বিশ্বাস-প্রবণ, প্রবল-ভক্তি-পরায়ণ লোকের হৃদয় রামায়ণ ও ভারতের কল্পনা-সৃষ্টি-প্রভাবে নিশ্চয় আর্দ্র হইয়া যখন দেবপূজোন্মুখী হইবে, তখন সেই আর্দ্রচিত্ত কিসের উপাসনা করিবে? সেই উপাসনার জন্য বিবিধ পুরাণ, উপপুরাণ, ও তন্ত্রের সৃষ্টি হইল। তাহাতে ভক্তির উপাস্য প্রতিমা স্থাপিত হইল, এবং বিশ্বাসের পরিতোষসাধক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ঘটনা-সৃষ্টি কল্পিত হইল। উভয় উপকরণেই নিশ্চয় হৃদয় আকৃষ্ট হইবে। শিশুগণ পিতামহীর অদ্ভুত রূপকথা কত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে; স্ত্রীলোকেরা সেই গল্পই বা কেমন বিশ্বস্ত-চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকে। অদ্ভুত-রসই সামান্য জনগণের হৃদয় ভিজাইবার প্রধান উপায়। অদ্ভুত কথায় সামান্য জনগণ কোন সন্দেহ করে না; তাহাতেই তাহাদের সম্পূর্ণ আস্থা। তাহারা অনায়াসে, অকাতরে, আগ্রহের সহিত সে কথা শুনিয়া যায়, কোন দ্বিরুক্তি করে না। অদ্ভুত কথা তাহাদের যেমন স্মরণ থাকে, এমন অন্য কোন কথা নয়। তাহারা সে কথা কখন ভুলিয়া যায় না। তাই পুরাণে সেই অনৈসর্গিক বর্ণনার ছড়াছড়ি। কারণ, অনৈসর্গিক ঘটনা-কল্পনায় ভক্তির বিরাট বিকাশ হয়। যখনই কোন দেবভাব বা কোন অলৌকিক ভক্তিভাব প্রকটিত করিতে হইবে, তখনই অনৈসর্গিক বর্ণনার অবতারণা আবশ্যক। সেইরূপ বর্ণনা আছে বলিয়া পুরাণোক্ত বিষয় সমুদয়, লোকের মনে চিরকাল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কেহ তাহা অবিশ্বাস করে না।

দর্শনাদির নিগূঢ় তত্ত্ব যখন পুরাণাকার ধারণ করিল, তখন তাহা গল্পের

ছাঁদে ইতিহাসরূপে বর্ণিত হইল। ব্রহ্মাণ্ডপতির যে সমস্ত শক্তির নিদর্শন ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যক্ত আছে, সেই সমস্ত শক্তি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মূর্ত্তিমান হইয়াছে। অনন্তদেব জগতে প্রথমে ত্রিবিধ প্রধান শক্তির পরিচয় দিতেছেন। সেই ত্রিবিধ শক্তি—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। এজন্য আদিতে তিনি ব্রহ্ম-মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিলেন; সৃষ্টি করিয়া যে শক্তিতে পালন করিতেছেন, তাহা সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু; আর যে শক্তি-প্রভাবে জগতের সংহার-কার্য্য চলিতেছে, সেই শক্তি মহেশ্বর। এই ত্রিবিধ শক্তি, অনন্ত কালই কার্য্য করিতেছে এবং অনন্ত কালই বর্ত্তমান আছে। শুদ্ধ তাহাই নহে, তাহারা অভিন্ন হইয়াও জগতে কার্য্য করিতেছে, কিন্তু তাহাদের কার্য্যের পরিচয় মানবের স্থূল মানস-দৃষ্টিতে স্বতন্ত্ররূপে প্রতীত হয় বলিয়া তাহারা ত্রিবিধ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তোমার শরীরই দেখ, প্রতিক্ষণে এই শরীরে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, এক সঙ্গে হইতেছে; অথচ ভাল করিয়া ভাবিয়া না দেখিলে তাহা তোমার প্রতীতি হয় না। অনাদিকালই অনন্তদেব বর্ত্তমান, তাঁহার রূপময় ব্রহ্মাণ্ডও অনাদি। কিন্তু পুরাণে সেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, পূর্ব্বাপর ঘটনারূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য ত্রিবিধ দেবতারও কল্পনা হইয়াছে। এই তিন প্রধান দেবতার মধ্যে প্রত্যেকের বিভিন্ন বিভিন্ন নিদর্শানুসারে পরে তেত্রিশ শ্রেণীর দেবমূর্ত্তি হইয়াছে, সেই তেত্রিশ দেবতা ক্রমশঃ তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছেন। সাংখ্যের উদাসীন পুরুষ, এই ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকৃতি। এজন্য, সেই প্রকৃতি সতী, উমা ও রাধিকা। এ সমস্তই অনন্তদেবের অনন্ত-শক্তির পরিচয়। পুরাণে যখন এই সমস্ত দেবতার স্বতন্ত্র কল্পনা হইল, তখন সুতরাং তাঁহাদের স্বতন্ত্র সংসার, রাজ্য, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ও স্বর্গধাম কল্পিত হইল। সেই দেবরাজ্য পুণ্যধাম হইতে এই মর্ত্তধামে তাঁহাদের অবতরণও ঘটিতে লাগিল। দেবতারা অমর; যেহেতু অনন্তদেব নিত্য। আর সেই অনন্তদেব যেরূপে বর্ত্তমান, সেই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, এজন্য জগৎ মর্ত্তধাম। বেদান্তানুসারে এক অনন্তদেবের বিভিন্নরূপ পরিবর্ত্তনই মায়াময় জগৎ। যাহা অনিত্য ও চিরকালই গমন করিতেছে, তাহাই জগৎ। এই জগতের ইংরাজী দার্শনিক নাম ফিনোমেনা (Phenomena) এবং নির্গুণ অনন্ত সত্তার নাম নাউমেনা (Noumena)। দর্শনমতে এই অনন্তদেব, জগৎ রূপে মানবদেহে প্রকৃতির বিকৃতি-সত্তায় যতই দেবভাবে পরিণত ও উন্নত

হইতে থাকেন, ততই তাঁহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মাণ্ড ও ঈশ্বর এক হইলে অন্যবিধ অবতার সম্ভবে না। কিন্তু পৌরাণিক অবতার এরূপ নহে, পৌরাণিক অবতার—স্বর্গ হইতে দেবতার অবতরণ। মর্ত্তলোকের হিতার্থ ও ধর্ম্মরক্ষার্থ মর্ত্তধামে দেবতার রূপধারণই পৌরাণিক দেবাবতারের অবতরণ। এরূপ না হইলে দেবরাজ্যের সঙ্গতি থাকে না। সেই সঙ্গতির রক্ষার জন্য বিভিন্নকালে এক একটির প্রয়োজন কল্পিত হইয়াছে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে এক এক দেবতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন। যে মূর্ত্তিতে যাহার উদয় কল্পিত হইয়াছে, সেই মূর্ত্তিতে তিনি দেবরূপে জগতে পূজিত হইতেছেন।

এই পৌরাণিক দেব-সংসারের সৃষ্টিহেতু সামান্য লোকের মনে এমত সংস্কার জন্মিয়াছে, যেন ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্তদেব জগৎ হইতে এক স্বতন্ত্র দেব-পদার্থ। অদ্বৈতবাদ এইরূপে দ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে। পুরাণ কিন্তু এরূপে সৃষ্ট যে, জ্ঞানীরা সেই অদ্বৈতবাদই দেখিতে পান, তাঁহারা দার্শনিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে পান। সামান্য লোকের সে চক্ষু নাই, সুতরাং তাঁহারা সেই ইতিহাস-বর্ণিত তত্ত্ব সকল প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মনে যে সমস্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সে সমস্ত বিশ্বাসই ভক্তিমূলক। সে ভক্তি বর্দ্ধিত করাই ভাল, সে ভুর না ভাঙ্গাই ভাল। এই লৌকিক বিশ্বাসমূলক দ্বৈতবাদ এবং তদ্ধেতু পৌরাণিক-সৃষ্টি ও অবতারবাদ ক্রমশঃ অপরাপর দেশে প্রচারিত হইয়া এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখা যায়। খৃষ্টীয়, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মে তাহা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের সহিত অপরাপর ধর্ম্মের প্রভেদ এই, অপরাপর ধর্ম্মে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ এবং তদনুসারী সৃষ্টি ও অবতারবাদ দেখিতে পাওয়া যায়; হিন্দু ধর্ম্মে দ্বৈতবাদের মূল অদ্বৈতবাদ এবং সৃষ্টি ও অবতারবাদেরও মূলীভূত হেতু যাহা, সে সমস্তই জাজ্বল্যমান। হিন্দু, বেদ উপনিষৎ ও দর্শন হইতে পুরাণ দেখেন এবং পুরাণ হইতে বেদে উপনীত হন। হিন্দুধর্ম্মে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-প্রণালীর পূর্ণ অবয়ব লক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম্ম পূর্ণাবয়বী, অপরাপর ধর্ম্ম অঙ্গহীন। অপরাপর ধর্ম্মে দেহ আছে, মস্তক নাই, কেবল হিন্দুধর্ম্মেই ধর্ম্মের পূর্ণমূর্ত্তি!

এক্ষণে আমরা হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বে উপনীত হইলাম! হিন্দুর ধর্ম্মভাব কেমন বিস্তৃত ও প্রশস্ত, তাহা এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। হিন্দুর ধর্ম্ম অধি-

কার-ভেদে জনসমাজের সর্ব্বজন-সাধ্য। সবাই তাহার সেবক; সর্ব্বজাতি ও সকল ব্যক্তিরই তাহা অধিগম্য। সমস্ত জনসমাজকে লইয়া হিন্দুধর্ম্ম। কি সংসারী, কি বনবাসী তপস্বী, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, সবাই তাহার অধি-কারী। সকলেরই জ্ঞান পরিমাণ-অনুসারে ধর্ম্ম-সজ্জিত হইয়াছে। এ ধর্ম্মে সকলেরই পারমার্থিক ক্ষুধা সন্তৃপ্ত হয়। আবাল-বৃদ্ধ সবাই ধর্ম্মে পরিপুষ্ট হয়। এ ধর্ম্ম শুধু বেদ নয়, উপনিষৎ নয়, দর্শন নয়, স্মৃতি নয়, পুরাণ নয়, তন্ত্র নয়, বৈষ্ণব-শাস্ত্র নয়, কিন্তু সে সমস্তই। শুধু নির্গুণ-বিদ্যা নয়, সগুণ-বিদ্যা নয়, প্রতিমা-পূজা নয়, কিন্তু সে সমস্তই। চার্ব্বাক, বৃহস্পতি, যোগী, ঋষি, মুনি, আচার্য্য, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বৈরাগী, সংসারী, নারী, ভৈরবী, জাপক, তপস্বী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য— সবাই হিন্দু। সমগ্র প্রবৃত্তিপথ এ ধর্ম্মের মহাশরীর, কাম্যকর্ম্মাদি এ ধর্ম্মের বিশাল দেহ, নিষ্কামতত্ত্ব সেই দেহের স্কন্ধ, নির্গুণ-বিদ্যা তাহার শির এবং মোক্ষ তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র। এ ধর্ম্ম ফল-পুষ্প-সমন্বিত, শাখা-প্রশাখায় সুবিস্তৃত, পত্রাদি-পরি-পূর্ণ, মহাকায়-সমৃদ্ধ মহীরুহ। যোগী, তপস্বী, সংসারী, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, কীট, সমস্ত সংসার, সেই জগৎ ব্যাপ্ত প্রেমময় অহিংসক বৃক্ষের আশ্রিত। এ ধর্ম্ম শুদ্ধ নিষ্কাম ধর্ম্মের ক্ষুদ্র কেয়ারী করা কামিনী ফুলের গাছ নহে। হিন্দুধর্ম্মের উদ্যানে সর্ব্ব বৃক্ষ সুসমৃদ্ধরূপে সঞ্জাত হয়। এ ধর্ম্ম শুদ্ধ শুষ্ক নীরস জ্ঞান নহে, শুদ্ধ হৃদয়ের ব্যাপার নহে, কিন্তু তদুভয়ই।

এ ধর্ম্ম, সকলকেই শান্তিপথে লইয়া যাইতে চাহে। হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত জনগণ, অতি ধীর-প্রকৃতি ও শান্ত-স্বভাব। অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী সামান্য জনগণের সহিত সাধারণ হিন্দু-সমাজের তুলনা করিয়া দেখ, এমন সদ্ভাবসম্পন্ন, সহৃদয়, শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, সচ্চরিত্র লোকসমাজ কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। অধিকার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচলিত আছে বলিয়া হিন্দু-সমাজে এই ফল ফলিয়াছে। কিন্তু খৃষ্টীয় সমাজ দেখ, সেখানে এরূপ ফল ফলে নাই। খৃষ্টীয় সমাজের সামান্য জনগণ অতি দুরন্ত, বর্ব্বর-স্বভাব, পাপা-সক্ত, নির্ম্মম ও ভয়ঙ্কর। তাহাদের ধর্ম্ম, একমাত্র বাইবেলে নিহিত আছে। সেই বাইবেলের নীরস ধর্ম্মতত্ত্ব ও জ্ঞান, ইতর ও মূর্খ জনগণের হৃদয়গ্রাহী নহে। সুতরাং তাহাদের প্রকৃতি, ধর্ম্ম দ্বারা তত শাসিত হয় না। সে প্রকৃতি

দুর্দ্দম্য হইয়া বন্য তৃণলতা ও বৃক্ষাদির ন্যায় অতি উদ্দামভাবে বাড়িতে থাকে। তথায় পশুভাবেরই প্রাবল্য হয়; ধর্ম্মতৃষ্ণা অতৃপ্ত থাকে। খৃষ্টীয় সমাজে ধর্ম্ম, অতি শুষ্ক, নীরস জ্ঞান-মাত্র। সাধারণ হিন্দু-জনসমাজের ধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টানের ধর্ম্ম, হৃদয়ের ব্যাপার, প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস, নিষ্ঠার ক্রিয়া-কলাপ ও শ্রদ্ধার সামগ্রী নহে। যাহাতে ভক্তির উৎস উৎসারিত হইবে, হৃদয়ানুরাগ উচ্ছ্বসিত হইবে, প্রেমের উদ্রেক হইবে, দয়ার সঞ্চার হইবে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে সে ভাব লক্ষিত হয় না। খৃষ্টধর্ম্ম কেন, হিন্দু ভিন্ন কোন ধর্ম্মে সমস্ত হৃদয়ের প্রবৃত্তি-অনুসারিণী পূজাপদ্ধতি প্রচলিত নাই। অপরাপর ধর্ম্মে অনন্ত জ্ঞানময়ের মানসিক-পূজা থাকিতে পারে, সর্ব্বশক্তিমানের নিরাকার পূজা থাকিতে পারে; কিন্তু সমস্ত হৃদয়ানুরাগ দ্বারা সর্ব্বসুন্দরের প্রতিমা-পূজা কোন ধর্ম্মে নাই। যে সাকার-পূজা লইয়া হিন্দুধর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা অন্য ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা সাধন করে নাই। যে সাকার-পূজা, সমস্ত হৃদয়ের উৎসর্গ-ব্যাপার—যে হৃদয়োৎ-সর্গ-ব্যাপার, বাহ্য-বিকাশ না পাইলে সন্তুষ্ট হয় না, যাহা সমস্ত জগৎ উৎসর্গ করিয়া যেন তৃপ্ত নহে,—যেন আরও কিছু পাইলে দেবচরণে সমর্পণ করিত—যে হৃদয়-ব্যাপার যেন কি করিবে, কি দিবে খুঁজিয়া পায় না—যাহা সহস্র-রূপ বাহ্য-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট নহে, যেন আরও কত কি করিতে আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে না—হৃদয়ের সেই সহস্র-রূপ বাহ্য-বিকাশ-সংবলিত পূজা-পদ্ধতি, হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের ত্রিসীমায়ও যায় না। লোকে জ্ঞানে আকৃষ্ট হয় বটে, শক্তিকে আশ্চর্য্য হইয়া অবলোকন করে বটে, কিন্তু সুন্দরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। হিন্দু মোহিত হইয়া সুন্দরকে দেখিয়াছে। কিন্তু হিন্দু মোহিত হইয়া সে সর্ব্বসুন্দরকে পূজা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। সেই মোহে অনন্ত জ্ঞানবান্‌কে সুন্দর করিয়া দেখিয়াছে এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্‌কেও সুন্দর করিয়া দেখিয়াছে। দেখিয়া আবার সমস্ত হৃদয়ের সহিত সেই জ্ঞান এবং শক্তিরও পূজা করিয়াছে। হিন্দু শৈব, সৌর, শাক্ত, গাণ-পত্য এবং বৈষ্ণব। কিন্তু কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব—সকলেরই পূজা হৃদ-য়ের পূজা। যে হৃদয়ে বৈষ্ণব, শ্যামসুন্দরের পূজা করে, সেই হৃদয়ে শৈব, দেব-দেব মহাদেব মহেশ্বরের পূজা করে এবং সেই হৃদয়েই শাক্ত, আদ্যাশক্তি ভগবতীর পূজা করে। হিন্দু কবি হইয়া কাব্যরসে দেবপূজা নিষিক্ত করে।

হিন্দুর পূজা কবির পূজা—সে পূজা, ভক্তি-মহাকাব্যের বিরাট বিকাশ—তাহা জ্ঞানের নীরস ব্যাপার নহে। যে মানসিক নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা শুদ্ধ উচ্চাধিকারী হিন্দুজ্ঞানিগণের জন্য ব্যবস্থিত—যাহা হৃদয়বান্ সামান্য জনগণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ, অপরাপর ধর্ম্মে শুদ্ধ সেই নিরাকারের মানসিক উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে কি জনসমাজের সাধারণ অগণ্য লোকের তৃপ্তিসাধন হয়? সেইরূপ নীরস জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম। তাহাতে জ্ঞান আছে, ধ্যান আছে, কিন্তু হৃদয়ার্দ্রকরী রস-সংযুক্ত পূজাপদ্ধতি নাই। ইসলাম-ধর্ম্ম ততোধিক নীরস। ইউরোপীয় খৃষ্ট-সমাজের ধর্ম্ম আরও নীরস। তাহা শুদ্ধ যাজক ও পাদরীগণের সাধ্য হইয়াছে। সাধারণ জনসমাজ, ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছে। তাহারা এক নির্দ্দিষ্ট দিনে দেশীয় রীত্যনুসারে চর্চ্চে গিয়া কতক গুলি জ্ঞানগর্ভ নীরস ও শুষ্ক কথা শুনিয়া, কতকগুলি অভ্যাস-আচরিত অনুষ্ঠান, ও শুষ্কবাক্য উচ্চারণ করিয়া ধর্ম্মপালন করিয়া আইসে—ধর্ম্মের দায় হইতে মুক্ত হয়। সে ধর্ম্মব্যাপার সমস্ত অভ্যস্ত ব্যাপার। পাদরীর জ্ঞানগর্ভ কথা সকল তাহাদের হৃদয়ে পৌঁছে না, আপনাদের অভ্যস্ত অনুষ্ঠান ও বাক্যাদি হৃদয় হইতে সমুত্থিত হয় না। আবার যাঁহারা বাইবেল-নিবদ্ধ জ্ঞানেরও উচ্চে উঠিয়াছেন, খৃষ্ট-সমাজের সেই জ্ঞানিগণ কি করেন? তাঁহারা হয় তো চর্চ্চের ত্রিসীমায়ও যান না। কারণ পাদরীগণের নিকৃষ্ট জ্ঞানমূলক কথায় ও উপাসনা-পদ্ধতিতে তাঁহারা যোগ দিতে পারেন না। তাঁহারা দেখেন, বাইবেল না সূক্ষ্মজ্ঞান-সম্মত, না কাব্যরসাশ্রিত। উচ্চ জ্ঞানিগণের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহাতে শত ছিদ্র দেখিতে পায়। যে খৃষ্টীয় জ্ঞানিগণ বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্ব মানিতে চান না, অথচ যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অদ্বৈতবাদে আসিয়া উপনীত হন নাই, তাঁহারা সুতরাং নিরীশ্বরবাদী হইয়া থাকেন। ধর্ম্মে তাঁহাদের আস্থা নাই। পাদরীর বুজ্‌রুকি ও বাক্যজালে তাঁহারা ভুলিতে চাহেন না। এদিকে সামান্য জনগণের রসাশ্রিত হৃদয় পাদরীর নীরস উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে না, সুতরাং বাইবেল, শুদ্ধ সমাজের এক সামান্য অংশের জন্য রহিয়াছে। সেই শ্রেণীস্থ জনগণের নিম্নে ও ঊর্দ্ধে যে নানা শ্রেণীর লোক বিদ্যমান রহিয়াছে, বাইবেল তাহাদের কিছু করিতে পারে না। তাহাদের ধর্ম্মভাব স্বভাবতঃ যেরূপে প্রবৃদ্ধ অথবা নীচগামী হইতে চায়, সেইরূপই বাড়িতে থাকে অথবা নীচগামী হইয়া

পড়ে। সকল লোকের অধিকার-অনুসারে ধর্ম্মকে না গড়িলে জনসমাজের গতি এইরূপ হইবেই হইবে। এজন্য বেদ হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এবং সকাম ও নিষ্কাম পথের ধর্ম্ম-পদ্ধতি প্রচলিত। সেই অধিকার-তত্ত্ব হিন্দু-জনসমাজ হইতে, ছাড়িয়া দেও, হিন্দুশাস্ত্র সমুদয় অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। আর অধিকার-তত্ত্ব ধর, হিন্দুশাস্ত্রের নানাবিধ মতামত অতি পরিষ্কার হইয়া যায়। সমস্ত জনসমাজের উপযোগী করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সৃষ্টি। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন, এ উপযোগিতা আর কোন ধর্ম্মে নাই। এজন্য বলিয়াছি, অপরাপর ধর্ম্ম অঙ্গহীন, কেবল হিন্দুধর্ম্মই পূর্ণাবয়বী।

যদি সংসারের পাপস্রোত নিবারণ করা, যদি ইন্দ্রিয় ও রিপুর সংযম করা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, শুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মেই সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। অতীত-সাক্ষী ইতিহাস ও পুরাবৃত্তই এ কথার প্রমাণ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ খৃষ্টীয় জনসমাজের ইতিহাস গ্রহণ কর। সে ইতিহাস তোমার সমক্ষে খৃষ্টীয় জাতিসমূহের কিরূপ বিবরণ দিতেছে? ঐ দেখ, ইউরোপীয় জাতিগণ লোভের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীময় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। তরবার, কামান, বহ্নি ও লুণ্ঠন-ব্যাপারে পৃথিবী ছারখার করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিজ খৃষ্টীয় জনসমাজে ইউরোপীয় জাতিসমূহ পরস্পর রক্তারক্তি ও লুণ্ঠন ব্যাপারে প্রবৃত্ত। কেহ কাহারও মিত্র নহে। এক খৃষ্টীয় জাতি অপর খৃষ্টীয় জাতির পরম শত্রু। খৃষ্টীয় জাতিগণ পরস্পরকে ঘৃণা-চক্ষে দেখে। এ কি খৃষ্টীয় প্রেম? খৃষ্টান জাতির প্রেম কেবল মুখে মাত্র। খৃষ্টীয় ইতর জনসমাজ-মধ্যে পাপস্রোত দুর্নিবার বেগে প্রবাহিত হইতেছে। সেই সমাজের পাপ-পরিমাণ, হিন্দু-জনসমাজের পাপ পরিমাণের সহিত তুলনাই হয় না। ইউরোপীয় খৃষ্ট-জাতির ইতিহাস পড়িবার যো নাই। তাহার প্রতি-পত্র রক্তরাগে কলঙ্কিত। পড়িতে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। ইউরোপীয় ধর্ম্মেতিহাস আরও ভয়ঙ্কর। প্রাচীন ক্যাথলিক্-ধর্ম্মের ইতিহাস ঘোর পাপাচার ও নির্দ্দয় অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। হত্যাকাণ্ড তাহাকে রুধিরাক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ক্যাথলিক্ ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ সম্প্রদায়ের বিগ্রহ-ব্যাপার আরও ভয়ঙ্কর। সে কি ধর্ম্মের ইতিহাস? মহাভারত! খৃষ্ট যদি আজি জীবিত হন, তিনি ইউরোপ-প্রচলিত ধর্ম্মের ইতিহাস দেখিয়া নিশ্চয় বলিবেন, আমি তো এ ধর্ম্মের কখন উপদেশ দিই নাই। পাদরীগণের উচিত খৃষ্টোক্ত প্রকৃত খৃষ্ট-

ধর্ম্ম, ইউরোপীয় জনসমাজে প্রচার করা। তাঁহারা অগ্রে স্বদেশকে প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টান করুন, তার পর অন্য দেশে যাইবেন। যদি ফল দেখিয়া ধর্ম্মের বিচার করা যায়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, খৃষ্টধর্ম্ম নিশ্চয় বিফল হইয়াছে। তাহাতে জনসমাজের পাপস্রোত বরং বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক ফলাফল দেখ; দেখিয়া বল দেখি, কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? যদি জনসমাজের পাপস্রোত নিবারণ করা, যদি জনসমাজকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে আনা, যদি পাশবভাব দমন করিয়া দেবভাবের স্ফূর্ত্তিসাধন করা ধর্ম্মের লক্ষ্য হয়, তবে বলিতে হইবে, হিন্দুধর্ম্মে সে লক্ষ্য সুসম্পাদিত হইয়াছে। যদি জনসমাজকে মনুষ্যত্ব প্রদান করা ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, হিন্দুধর্ম্ম সেই লক্ষণসম্পন্ন। আজি পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, ধর্ম্মের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সকল লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের উপযুক্ত নহে। হিন্দুধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলে এই দাঁড়ায়—

To humanize the whole society is religion.

যাহাকে মনুষ্যত্ব বলে, সেই মনুষ্যত্বে সমগ্র লোকসমাজকে ভূষিত করাই ধর্ম্মের কার্য্য। কঠিনকে কোমল করা, দুরন্তকে শান্ত করা, অশিষ্টকে শিষ্ট করা, দুর্বৃত্তকে সুশীল করা, কোপনস্বভাবকে ক্ষমাশীল করা, নির্দ্দয়কে দয়াপূর্ণ করা আর সমুদায় সংসারকে প্রেমে আবদ্ধ করিয়া মুক্তিপথে আনা, যদি ধর্ম্মের কার্য্য হয়, তবে সে কার্য্য, হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা এত কাল সুসম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম, লোককে মোক্ষপথে আনিয়া থাকে। হিন্দুর মোক্ষপথ অতি সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত। প্রবৃত্তিপথে সেই মোক্ষ আরব্ধ হইয়া ক্রমে নিবৃত্তিপথে আইসে। অজ্ঞানীর জন্য ভক্তিপথ এবং জ্ঞানীর জন্য জ্ঞানপথ। ক্রমে মানব, পাপপথ হইতে পুণ্যপথে আইসে। এই মোক্ষ-পথে বিভিন্ন জনগণের জন্য নানা উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সেই উপায় ধরিয়া লোকে মোক্ষে উপনীত হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মত একমাত্র উপায়ে হিন্দুধর্ম্ম, মোক্ষপথ নির্দ্দেশ করে নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে একজনের পাপ আর একজনের ঘাড়ে দিয়া লোকে মুক্তিলাভ করে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মোক্ষপথ একটী গ্রাণ্ড্ ট্রান্সফার এণ্ট্রি। সেরূপ অলৌকিক উপায়ে হিন্দুর মুক্তিসাধন হয় না। হিন্দুর মুক্তি, সংযমপথে। ক্রমে সংযমী হইয়া হিন্দু, মোক্ষপথে অগ্রসর হন। নানাবিধ উপায়ে যে, যেমন অধিকারী,

তাহার তদ্রূপ উপায়ে মোক্ষলাভ হয়। এজন্য হিন্দুধর্ম্মের মোক্ষপথ নানাবিধ। এক অধিকার-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই সেই পন্থা সমস্ত বোঝা যায়। পন্থা বিবিধ বটে, কিন্তু মোক্ষ এক। জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিই মোক্ষ। নির্ব্বাণ বল, লয় বল, সাযুজ্য বল, সকলই একস্থানে আসিয়া উপনীত। মোক্ষ এক বলিয়া, লক্ষ্যও এক। সংসারের প্রবৃত্তিপথের যে লক্ষ্য, নিবৃত্তিপথেরও সেই লক্ষ্য। এক লক্ষ্য ও মোক্ষ ধরিয়াই হিন্দুধর্ম্ম সৃষ্ট। অধিকার-তত্ত্বই সেই লক্ষ্য অনুসারে জনসমাজকে গড়িয়া আনিতেছে। সংসারে ভোজনে, পানে, বিবাহে, ক্রিয়াকলাপে, বিষয়ব্যবসায়ে হিন্দুর কোন্ কার্য্যে সে লক্ষ্য প্রতীয়মান না হয়? আবার তত্ত্বপথে, আরণ্যআশ্রমে, সেথায়ও সেই লক্ষ্য। হিন্দুধর্ম্ম হৃদয়ের ব্যাপার, জ্ঞানের ব্যাপার, শরীরের ব্যাপার। মনুষ্যের সমস্তটাই হিন্দুধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য, সংসার আশ্রম, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এ সমস্ত লইয়া হিন্দুধর্ম্ম। সুতরাং হিন্দুকে সুগঠিত করিয়া ধর্ম্ম মোক্ষপথে লইয়া যায়। সংসারের প্রবৃত্তিপথ এরূপে সজ্জিত যে, সে সংসারের হৃদয়ের ভাবে, সামাজিক ব্যবস্থায় ও প্রেমপ্রভাবে তোমাকে নিশ্চয় নীয়মান ও সুগঠিত হইতে হইবে। সংসারের অলক্ষিত প্রভাবে তোমাকে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। হিন্দু-সংসার এইরূপে সজ্জিত আছে। হিন্দু-জনসমাজকে নিয়মিত করা, প্রবৃত্তি-মার্গের মহা উদ্দেশ্য। সংসার আশ্রমে হিন্দুর জনসমাজে সে উদ্দেশ্য অতি প্রকৃষ্টরূপে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আজি শত-সহস্র বৎসরের হিন্দুজাতির ইতিহাস এ কথা প্রতিপন্ন করিতেছে। সেই সংসারাশ্রমস্থ হিন্দু, জন-সমাজকে গড়িয়া আনিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রের সগুণ বিদ্যার বিস্তারিত সৃষ্টি। জনসমাজকে সৎপথে রক্ষা করিবার জন্য সংসারকে ধারণ করিবার জন্যই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের সূত্র ধরিয়া হিন্দুঋষি সগুণ উপাসনা-পদ্ধতির এত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে নির্গুণবাদের শাস্ত্রাদি তত বিস্তৃত নহে। যেহেতু নির্গুণবাদী আপনার পথ আপনি বুঝিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যেখানে জনসাধারণের মূর্খতাই প্রবল, সবাই মায়া-মোহে অন্ধ। সেখানে সেই মূর্খ জনগণকে নিয়মিত করাই প্রধান কার্য্য। তজ্জন্যই স্মৃতি ও পুরাণাদির বিশাল সৃষ্টি। সেই পুরাণ-সৃষ্টির মোহে যেন জনগণ অন্ধ হইয়া কার্য্য করিতে পারে, এরূপ করিয়া সে শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। সে অভিপ্রায় বিলক্ষণ সুসিদ্ধ

হইয়াছে। হিন্দু-সমাজ, পুরাণের মোহ-নিগড়ে আবদ্ধ। জনসমাজ, প্রবৃত্তি-পথে সংসার-স্রোতে ধর্ম্মানন্দে ভাসিয়া যাইতেছে।

এই পুরাণ সমস্ত, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের অতুল সম্পত্তি। আর কোন ধর্ম্মে এরূপ সাহিত্য রচিত হয় নাই। এক এক খানি পুরাণ, এক একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। সে কাব্যের শীর্ষ-স্থানে রামায়ণ ও মহাভারত। ঘটনা-কল্পনার প্রাচুর্য্যে, দেবমূর্ত্তি-কল্পনার অদ্ভুত কবিত্ব-বিকাশে এবং ভক্তিরসের তরঙ্গে সমস্ত পুরাণই আপ্লুত। কল্পনার সমৃদ্ধ সৃষ্টিপ্রভাবে, কবিত্বের সৌন্দর্য্যে এবং ভক্তির মহিমায় অমানুষী বর্ণনা কোথায় যে ডুবিয়া যায়, তাহার ঠিক্ থাকে না। এক এক পুরাণ পড়িলে, মন ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হয়; তাঁহার কল্পনারাজ্য, মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। তাহার চিত্র সকল, হৃদয়ে সজীবতা লাভ করিয়া সশরীরে বিচরণ করিতে থাকে। কল্পনায় আমরা তাহাদিগকে যেন সত্য জীবিত চরিত্র-রূপে দেখিতে পাই। সেই চরিত্রাশ্রিত রসপ্রাচুর্য্যে হৃদয় আর্দ্র হয়। চিত্ত, দেবপূজার জন্য উন্মুখী হয়। হৃদয়, কাব্য গড়িয়াছে; কাব্য আবার হৃদয়কে গড়িয়া আনে। মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে। প্রশংসা করিব—পুরাণের কল্পনা-সৃষ্টিকে, না—তাহার রসপ্রভাবকে? ব্যাসের পৌরাণিক সৃষ্টি ও কবিত্ব, এতই সুন্দর ও মনোহর! জগতে এরূপ কাব্যাবলি অতুলনীয়। ব্যাস, সেই পুরাণের সৃষ্টি করিয়া হিন্দুসমাজকে এক অতুল ভক্তিরসে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। সগুণ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি সকল, মূর্ত্তিমান্ করিয়া দেখাইয়াছেন। মানসিক-দেবভাব, সশরীরে আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। নিরাকার ঈশ্বর, ভক্তের মানসে যে সমস্ত শক্তি-রূপে বর্ত্তমান, সেই শক্তি-সমূহ, বাহ্যাবয়বে হৃদয়ের অর্চ্চনার সামগ্রী হইয়াছে। তিনি নিরাকার ভাবে হৃদয়েই বিরাজ করুন, বা সেই ভাব বাহ্যাবয়বেই প্রকটিত হউক, সে একই কথা—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। সামগ্রী যা, তাই আছে। ঈশ্বর যাহা, তাহা হৃদয়েই অনন্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই হৃদয়ের প্রতিবিম্ব-রূপই প্রতিমা। আন্তরিক পূজার প্রতিবিম্ব-পূজাই প্রতিমা-পূজা।

ব্যাস, পুরাণের সৃষ্টিতে হিন্দু-সমাজে প্রতিমা-পূজার সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে জনসমাজের হৃদয়ধামে দৃঢ়-প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। ঔপনিষদিক ও দার্শনিক জ্ঞান, কবিত্বে কুসুমিত হইয়া সামান্য জনগণের

চিত্তরঞ্জন করিয়াছে। পূজাদি, উৎসব-ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। পূজার সময় জনসমাজ, উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া উৎসবে মত্ত হইয়া পড়ে। তত আনন্দ হৃদয়ে বুঝি আর ধরে না! লোকের এই ভাব, প্রতিমাপূজায় বাহির হইয়াছে। এই সর্ব্বসাধারণের ভক্তিমূলীয় উৎসব-ব্যাপার, হিন্দুজনসমাজ পরিত্যাগ করিতে পারে কি? এ তো শুষ্ক মানস-ব্যাপার নহে; এ হৃদয়ের তরঙ্গোচ্ছ্বাস—ব্যাসের কবিত্বময় উদ্যান—কুসুমিত উদ্যানে হৃদ্বৃত্তিরূপা কামিনীগণের বিলাস ও বিহার—গোপকন্যাগণের কৃষ্ণলীলা—হৃদয়-ভাবে সমস্ত জনসমাজকে পূর্ণ করা। পৌরাণিক অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তিতে জনগণের হৃদয়, অসংখ্য স্রোতে বিসারিত হয়। শুদ্ধ মন্ত্রে হিন্দু, পূজা করিয়া সন্তুষ্ট নহেন। সেই মন্ত্রকে তিনি অবয়বী করিয়া মূর্ত্তিমান্ করেন। মন্ত্র-ব্রহ্ম বাহ্যরূপে দেদীপ্যমান হন। তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ করেন কি জন্য? ষোড়শোপচারে পূজা করিবার জন্য। শুদ্ধ ভক্তি করিয়া হিন্দু তুষ্ট নহেন—প্রীতি, বাৎসল্য, স্নেহ প্রভৃতি যত প্রকার কোমল ভাব, হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, হৃদয়ের সেই সমস্ত কোমল ভাবে দেবতাকে কুসুম-মাল্যায় শোভিত ও তাঁহার পাদপদ্মে প্রস্ফুটিত কমলদল অর্পণ করিয়া হিন্দু, পূজা করিতে চাহেন। হিন্দুর এই সর্ব্বব্যাপী হৃদয়ের প্রসারণ বুঝিয়া ব্যাস, পুরাণের দেবদেবী ও প্রতিমার সৃষ্টি, হিন্দুজনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। এরূপ না করিলে সে সর্ব্বব্যাপী, বিশাল হৃদয় সন্তৃপ্ত হইত না। তিনি সাধারণ জনগণকে স্বর্গের রসাস্বাদনে সম্ভোগী করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞানীর কুটীরে বা ঐশ্বর্য্যালয়ে ধর্ম্মের মহারত্ন বিতরণ করিয়াছেন। তিনি নিজে ব্রহ্মজ্ঞানে যে আনন্দে উন্মত্ত, সেই আনন্দের কিয়ৎপরিমাণ সকলকে দিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনার ও কাব্যসৃষ্টি-শক্তির অভাব ছিল না। তাই সমদর্শী ব্যাসদেব, হিন্দু-সমাজকে চিরদিনের জন্য এক অপূর্ব্ব আনন্দে ও পারমার্থিক উৎসবে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

প্রতিমা-পূজা আছে বলিয়া, হিন্দুদের দেবভক্তি এত প্রবলা। সামান্য জনগণের দেবভক্তির এই জন্য এত উন্মেষ হইয়াছে। অতি শৈশবাবস্থা হইতে হিন্দুরা দেবদেবীর প্রতি ভক্তি করিতে শেখে। পূজার আনন্দে বালক-বালিকারাও মাতিয়া যায়; প্রতিমার সম্মুখে যোড়-হস্তে প্রণিপাত করে; দেবতা দেখিলেই প্রণাম করে। সেই ভক্তি ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে স্ফুরিত

হইতে থাকে। স্ত্রীলোক ও মূর্খজনের ভক্তি, শিশুদিগের ভক্তির মত ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিলাভ করে। ব্রহ্মচর্য্যধারিণী হিন্দু বিধবাগণ, দেবপূজা ও দৈবারাধনা লইয়াই কালাতিপাত করিয়া থাকেন। তাহাই তাঁহাদের জীবনের কার্য্য ও মহাব্রত। সাক্ষাৎ দেবতা না দেখিলে সামান্য জনগণের দেবভক্তির বিকাশ, হিন্দুদের মত সম্ভবে না। হিন্দুদের দেবদেবী যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সে স্থানের মাহাত্ম্য অধিক। অধিক কি জন্য? দেবাধিষ্ঠানের জন্য। দেবাধিষ্ঠানের জন্য তাহা তীর্থস্থান। লোকে কত ভক্তি-সহকারে, কত ক্লেশ সহ্য করিয়া এক এক তীর্থস্থানে আসিয়া দেবদর্শন করে। ভক্তির টানে সবই সহ্য হয়। দেবতার প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা না থাকিলে, কি এত দূর ভক্তির টান হয়? স্ত্রীলোকের এ টান দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোলের শিশুসন্তান ফেলিয়াও কুলবধূগণ তীর্থধামে ছুটিতেছেন। তীর্থদর্শন, হিন্দুকুলবিধবাগণের একটি প্রধান কার্য্য। নারীগণ, পথের অসহ্য ক্লেশ অনায়াসে বহন করেন; দেবদর্শনে পরমপুলকে পূর্ণ হন। এ আনন্দ বুঝি আর কিছুতে হয় না। হিন্দুসমাজ, এই ধর্ম্মামোদে ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

হিন্দুর প্রতিমা যেখানে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু সেই মন্দির-সমক্ষে আসিলেই এক বার ভক্তিসহকারে ব্রহ্মাণ্ডপতি বা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী প্রতুলকর্ত্রীকে স্মরণ করেন; স্মরণ করিয়া করপুটে প্রণাম করেন। দৈবানুরাগী সকাম ভক্ত, নিজ ইষ্ট-সাধনার্থ দেবকৃপা প্রার্থনা করেন। নিষ্কাম ভক্ত, কুন্তীদেবী বা প্রহ্লাদের মত কেবল ভক্তিই প্রার্থনা করেন। এ সুবিধা মুসলমানের মসিদে ও খৃষ্টানের চর্চ্চে নাই। মুসলমান, মসিদ পার হইয়া যাইতেছে, কেহ এক বার দাঁড়াইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করে না। কত খৃষ্টান চর্চ্চ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, কেহ চর্চ্চের সম্মুখে একবারও ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার জন্য ক্ষণিক স্থির হয় না। কিন্তু হিন্দুর অমনই দেবমন্দির পার হইবার যো নাই। যে স্থানে যত বার দেবমন্দিরে বিগ্রহকে দেখিবে, হিন্দু তত বার নতশির হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। যে না করে, সে হিন্দু নহে। হিন্দু সেই বিগ্রহকে প্রণাম করে না; সেই মূর্ত্তি, যে নিরাকার সর্ব্বব্যাপ্ত ঈশ্বরের নিদর্শন, সেই ঈশ্বরকে একবার ভক্তিপূর্ব্বক মনের উৎসাহে ও আনন্দে ডাকিয়া লয়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী ভগবতী

বা দেবদেব মহেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করেন। তখন তাহার মনে সে বিগ্রহমূর্ত্তি কোথায়? সেই বিগ্রহমূর্ত্তি তাহার নিকট নিদর্শনমাত্র। বৈষ্ণব, কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া অনন্তদেব নারায়ণকে স্মরণ করেন। এ কি প্রতিমা পূজা? না অনন্তদেবের উপাসনা। প্রতিমা দেখিলে হিন্দুর মনে কি ভাবের আবির্ভাব হয়? সেই ভাবে হিন্দু এক বার ব্রহ্মাণ্ডপতিকে ডাকিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। হিন্দুর মনে যে ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা কি পৌত্তলিকতা? হিন্দুর মনে মূর্ত্তিপূজা কৈ? সেই মূর্ত্তি যাঁহার নিদর্শন, হিন্দুর মনে তিনিই সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিতেছেন। প্রতিমা তাঁহাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। তজ্জন্য হিন্দুর মনে সততই অনন্তদেব বিদ্যমান রহিয়াছেন।

এক্ষণে বোধ হয়, বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, হিন্দুদিগের প্রতিমা-পূজার অনুষ্ঠান, শুধু আন্তরিক পূজা নহে। উহাতে সামাজিক পূজাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরাকারের আন্তরিক পূজা যাহা, তাহার সহিত বাহ্য প্রতিমা-পূজার প্রভেদ কিছুই নাই বলিলে হয়। যেহেতু ঈশ্বর অন্তরেই থাকুন, বা ভক্তের সমক্ষে নিদর্শানুযায়ী বাহ্যাবয়বেই প্রকটিত হউন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যে ঈশ্বরকে ভক্ত, হৃদয়ে পূজা করেন, বাহিরে প্রতিমার নিদর্শনেও সেই ঈশ্বরকে পূজা করেন। অন্তরে নিরাকার-শক্তিরূপিণী, বাহিরে সাকার-শক্তিরূপিণী। নিষ্কাম উপাসক, যেমন সমস্ত কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া থাকেন, ঈশ্বর-প্রাণগত-সকাম উপাসকও, তেমনই সমস্ত কার্য্যেই ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া থাকেন। দৈববলে তাঁহার ঘোর বিশ্বাস। সকাম উপাসক, দৈববল ভিন্ন কার্য্যসিদ্ধির কোন উপায় নাই বলিয়া, সেই বলের জন্য একান্ত ভক্তি-সহকারে প্রার্থনা করেন। প্রাচীনকালে এইজন্য নানা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ছিল। পুত্রেষ্টিযাগ আর কিছুই নহে,—যে পুত্র বিনা ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না, সেই ধর্ম্মকর্ম্মের নিদানস্বরূপ সন্তান-কামনায় যজ্ঞ গৃহীত হইত। গৃহীত হইত কখন? যখন সমস্ত পুরুষকার বিফল হইয়াছে। পুরুষকার বিফল বলিয়া দৈববলের প্রার্থনা। ঈশ্বরেরই কার্য্যের জন্য দৈববলের প্রার্থনা। ঈশ্বর-প্রাণগত হিন্দুর যাগযজ্ঞাদি সকাম হইয়াও অনেকাংশে নিষ্কাম বলিতে হইবে। সকামকে নিষ্কামোন্মুখী বলিতে হইবে। হিন্দু উপাসক, দেবপূজা শুধু অন্তরে করেন না, বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারাও তাহা সম্পন্ন করেন। বাহ্যানুষ্ঠান-সম্পন্ন

করাতে পূজা সামাজিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে স্থলে সমুদায়ই বাহ্যানুষ্ঠান ও সাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপ, সে স্থলে কি ঈশ্বর শূন্যময় থাকিবেন? ঈশ্বর তো অন্তরেই সমস্ত শক্তিরূপে বিরাজিত। সেই শক্তিরূপে তাহার তো মহিমার কিছুমাত্র হানি হয় না। তাই হিন্দু, তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া সমুদায় বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে, সমুদায় ভক্তিময় শোভাসম্পন্ন আয়োজন ও উপহারের মধ্যে স্থাপিত করেন। স্থাপিত করিয়া সমস্ত ভক্তির অনুষ্ঠানই তাহাতে সমর্পণ করেন। এতদপেক্ষা ভক্তির বিরাট বিকাশ আর কি আছে?

এই জন্য পূজার সামাজিক ফল, প্রভূত হইয়াছে। হিন্দুসমাজ, এই পূজায় মত্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তির পূজা, শুধু সেই যে ভক্তিপূর্ণ এমত নহে; তৎসংস্পৃষ্ট সমস্ত লোককেই ভক্তিরসার্দ্র, পরিবারমণ্ডলী পূজায় মত্ত। শুধু পরিবারমণ্ডলী নহে। যে-জনপদে যে গ্রামে পূজা, সেই গ্রাম শুদ্ধ সবাই পূজায় আকৃষ্ট ও ভক্তিতে উল্লাসিত। যত দিন পূজা থাকিবে, তত দিন তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস, সেই পূজা লইয়া। এরূপ সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক ব্যাপার কি সামান্য ব্যাপার? এ ব্যাপার যে সমগ্র সমাজকে ভক্তির টানে আকর্ষণ করে। এই দেবপূজা ও বারব্রতে হিন্দুনারী কেমন ব্যতিবস্ত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই দেবপূজা ও প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া হিন্দুর দেবমন্দির ও তীর্থস্থান সকল কেমন সামাজিক সাত্ত্বিক ভাবের উদ্বোধন করিয়া থাকে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুর প্রতিমা-পূজার ফল, শুদ্ধ ব্যক্তিগত নহে। তাহা সর্ব্বসমাজে শুভপ্রদ হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠিত-দেবমন্দির সমস্ত সর্ব্বসমাজকে চিরদিন ভক্তি-পথে আনিতেছে। জনসমাজের মধ্যে যাহাদের ভক্তিভাব স্বভাবতঃই প্রবলা, তাহারা সেই ভক্তির অনুবর্ত্তন করিয়া ক্রমে মুক্তিপথের পথিক হইতে থাকে। সমাজের যথায় তথায় দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকাতে লোকের মনে সর্ব্বদা দেবভয় জাগরূক থাকে এবং তজ্জন্য পাপপথ হইতে লোকে বিরত হইয়া থাকে। সামজিক পাপের শাসন ও ভক্তির উদ্রেকের জন্য হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্ম-ভক্তির উদ্রেক, শুধু যে গৃহে হয়, শুধু যে পরিবারমণ্ডলে হয়, এমত নহে। সামাজিক প্রতিমা-পূজানুষ্ঠানেও সেই শিক্ষা ও ভক্তির উন্নতিসাধন হয়। হিন্দু-সমাজ সপ্ত শত বৎসর ধরিয়া যাবনিক শাসনে

রহিয়াছে। যাবনিক ও ম্লেচ্ছ শিক্ষার এবং সংস্কারের অধীন হইয়াছে, তথায় তাহার হিন্দুত্ব যায় নাই। সে হিন্দুত্ব কিসে রক্ষিত? ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুরা আজি কোন্ শক্তি-প্রভাবে হিন্দু? এই পারিবারিক ও সামাজিক হিন্দু পূজার ভক্তিমূলীয় অনুষ্ঠান্ কি তাহার অন্যতর কারণ বহে? যে শক্তিপ্রভাবে আমরা চিরকাল রক্ষিত হইয়াছি, আজিও সেই সামাজিক ও পারিবারিক সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান দ্বারা আমরা নিশ্চয় হিন্দুধর্ম্মে রক্ষিত ও অধিষ্ঠিত হইয়া আছি। আমাদের অণুমাত্র ধর্ম্মশিক্ষা নাই, তথাপি এই ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল আমাদিগকে হিন্দু করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মে অগ্রসর হই এবং বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ধর্ম্মতত্ত্বের পারমার্থিক রসে নিমগ্ন হই।

বাঙ্গালী-হিন্দুর প্রতিমা-পূজা কি শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ? শুধু ভক্তিতে মানব, দেবোপম হয় না। হিন্দুর দেবতা প্রেমময়, হিন্দুর দেবতা দয়াময়। সৃষ্টি লীলাময় প্রেম-ব্যাপার; স্থিতি পালনময় রক্ষাকার্য্য; লয় শিবময় মঙ্গলের জন্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একত্র জগতে বিদ্যমান বলিয়া এই সংসার স্রোত চলিতেছে। পুরুষ-প্রকৃতি পরস্পর আসক্ত হইয়া সংসারে বিদ্যমান। সেই আসক্তিই পূর্ণ-প্রেম, তাহাই শিবময়ী প্রকৃতি-শক্তি। সেই শিবময়ী প্রকৃতি মহামায়া। সেই শিবময়ী শক্তির পূজা কি শুদ্ধ ভক্তিতে সমাপ্ত হইতে পারে? হৃদয়ের সমস্ত দেবভাবের বিকাশ না করিলে, প্রেম ও দয়াময়ীর পূজা হইতে পারে না। শুদ্ধ ভক্তি-পুষ্পে তাঁহার পূজা নিঃশেষিত হইতে পারে না। ভক্তির স্ফূর্ত্তি যেমন আবশ্যক, দয়া ও প্রেমেরও স্ফূর্ত্তি তেমনই আবশ্যক। এজন্য বাঙ্গালী-সমুদয় হৃদয় দিয়া দেবতাকে পূজা করিতে চাহেন। বাঙ্গালী প্রেমপূরিত হৃদয়ে, শত্রু, মিত্র, সুহৃদ, ভদ্র, ইতর, আত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী সকলকে আহ্বান করিয়া পূজা করেন। হৃদয় বিস্তৃত করিয়া একদা প্রেমময়ের পূজায় প্রমত্ত হন। সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রেমময়ের পূজায় মাতিয়া যান্। মিলিয়া মিশিয়া একত্র পান আহার করিয়া প্রেমামোদে মত্ত হন। প্রেমপ্রতিমা দর্শনের জন্য পূজায় সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। সকলকে একদা প্রেমময়ীর ক্রোড়ে স্থাপন জন্য নিমন্ত্রণ করেন। প্রেমময় মাতৃক্রোড়ে আসিবার জন্য যাহার যাহা সাধ্য, তিনি তাহা মাতাকে উপহার দেন। সেই উপহারে হৃদয়ের ধন, বিশ্বজননীকে অর্পণ করেন। হিন্দু রিক্ত হস্তে

দেব দর্শন করেন না। তৎপরে প্রেমময়ীর উৎসব ব্যাপারে মত্ত হইতে যান। এ ব্যবস্থা বড় সুন্দর ব্যবস্থা। বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা সমাজের প্রীতি-স্ফূর্ত্তির ব্যাপার। তাহাতে শক্রমিত্র মিলিত হয়; প্রেমে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন আসয়া মিলিত হয়। একত্র পান ভোজন ও আনন্দ-উৎসব করিয়া প্রতিমা-পূজার প্রেম প্রসারিত হয়।

শুদ্ধ এই প্রেমের ব্যাপারেই পূজার নিঃশেষ নহে। যিনি দয়াময় দীন-দয়াল, যিনি করুণাময়ী প্রতুলকর্ত্রী, তাঁহার পূজা কি শুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমে সম্পন্ন হইতে পারে? সে পূজায় দয়ার ও স্ফূর্ত্তি চাই। দয়ার বিকাশে, দয়ার উপহারে দয়াময়ীর পূজা। অই বাঙ্গালীর পূজা-বাড়ীতে দীন-দরিদ্রের অন্ন-সত্র। পূজা-বাড়ীর চারিপার্শ্বস্থ সমস্ত গ্রামের আর্ত্ত ও দীনহীনেরা পূজায় ঢাকঢোলের রোলে আহূত হন। ঢাকঢোলের বাদ্য, পূজাতে সকলকে আহ্বানের জন্য। পূজা পাঁচ জনকে লইয়া, পূজা সেই রবাহূত দীন-দরিদ্র জনগণকে লইয়া। দয়াময়ী যেন দীন-দরিদ্রদিগকে দেখিয়া হাসিতে থাকেন। চণ্ডী-মণ্ডপ আলো করেন। তাঁহার চারি দিকে ভক্তির পূজা নৈবেদ্য। প্রেমপূজায় সমগ্র ভদ্রাভদ্র, শত্রু, মিত্র, জনগণের সমাগম; সম্মুখে দীনদরিদ্রগণ তাঁহারই মুখপানে চাহিয়া প্রফুল্ল। অন্ন, পান ও দান-লাভের জন্য সবাই উল্লাসে উল্লাসিত। কেবল ভোজন; পান, দান, ধ্যান ও উৎসব। দীন-দরিদ্রের ভোজন, পান ও দানে, বাঙ্গালীর পূজা সম্পন্ন হয়। সকলেরই পরিতৃপ্তি নহিলে, দেবপূজা সম্পূর্ণ নহে। সর্ব্বজীব আনন্দিত না হইলে, আনন্দময়ীর পূজা কি? ভক্তি, প্রীতি ও দয়া এই ত্রিধারায় হৃদয়স্রোতে প্রবাহিত না হইলে, দেব-সাগর পরিপূর্ণ হয় না। সমস্ত জগৎ ও জনসমাজের ভক্তি, প্রেম ও দয়ার বিস্তার না হইলে, দেবপূজা সম্পন্ন হইতে পারে না। বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজায় এই ত্রিধারা মিলিত হইয়া একদা দেবাধিষ্ঠিত স্থানকে তীর্থস্থান করিয়া দেয়। সেই তীর্থধামের পবিত্রময় ত্রিধারা-মিলিত স্রোতে বঙ্গসমাজ নিমগ্ন হইয়া একদা জীবনকে পূত ও চরিতার্থ করে। বঙ্গদেশ, নানাবিধ দেব-প্রতিমার পূজা-পার্ব্বণ-ব্রতাদিতে সর্ব্বদা পরিপূত হইয়া সুন্দর পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ-ধাম হইয়া রহিয়াছে। চারি দিকে প্রকৃতি-সুন্দরীর আনন্দ, দেবতার আনন্দ, মানব-সমাজের আনন্দ, পশুপক্ষীর আনন্দ, সর্ব্বভূতের আনন্দ, একত্র হইয়া

বঙ্গদেশকে মহা আনন্দধামে পরিণত করিয়াছে। বঙ্গদেশ কাবত্বময়,—কাবর লীলাময় ক্ষেত্র। কবি, সেই রমণীয় দেশে কবিত্বপূর্ণ প্রতিমা-পূজার প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসমাজের হৃদয়-কাব্যকে সহস্রভাবে বিকসিত করিয়াছেন। অথবা কেবল বঙ্গদেশীয় কবিত্বপূর্ণ জনসমাজই প্রতিমা-পূজার সম্যক্ পারমার্থিক রসাস্বাদনের সম্ভোগী হইয়াছে। বঙ্গবাসিগণ, কবির হৃদয়ে ধন-ধান্যপূর্ণ স্বদেশের শ্যামল সুদৃশ্য শোভাবলির মাঝে পরম রমণীয় দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া হৃদয়স্থ বৃন্দাবনের রাসলীলা-প্রতিবিম্বিত বিমল রমণানন্দে বিভোর হইয়া আছেন।*

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

বৈদিক প্রহেলিকা।

বেদের কতকগুলি মন্ত্র, প্রথমত শুনিলেই প্রহেলিকা (হেঁয়ালি) বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ একটি প্রহেলিকা-মন্ত্র অদ্য প্রকাশিত হইতেছে। মন্ত্রটী এই,—

"স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উ মে পুংস আহুঃ
পশ্যদক্ষণ্বান্ ন বি চেতদন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈ মা চিকেত
যস্তা বিজানাৎ স পিতুঃ পিতাসৎ॥"

ঋক্ সং ২য় অষ্টকের ৩য় অধ্যায়ের ১৭শ বর্গের ১ম ঋক্।

বিশেষ উপদেশাভাবে মোটামুটী এ যে মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাতে ইহা হেঁয়ালি বলিয়াই বোধ হয়। যথা—

(১) হেঁয়ালী।—যাহারা চিরকাল নারী, তাহাদিগকেই আমার পুরুষগণ কহে। যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখে; অন্ধ জানে না। যে পুত্র কবি, সেই ইহা ভাল বুঝে। যে ইহা বুঝে, সে পিতার পিতা হয়।

নিরুক্ত নামেই প্রসিদ্ধ নিরুক্ত-পরিশিষ্ট-গ্রন্থে এ মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা আছে; তদনুসারে ইহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ—

(২) নিরুক্ত-পরিশিষ্ট।—স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই বিষয়সমূহ যে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা আহৃত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত প্রকৃতিরই রূপান্তরমাত্র, সুতরাং

* এই প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে আমাদের মতৈক্য নাই।—পুং-সং।

নারী; (অজ্ঞেরা) এই ইন্দ্রিয়সমষ্টিকেই প্রাণরূপ আত্মপুরুষ বলে। যাহার প্রজ্ঞাচক্ষু নাই, তাদৃশ ব্যক্তি, বাহ্য চক্ষুর্দ্বয় থাকিতেও অন্ধ; সুতরাং বাহিরে দেখিয়াও তথ্যদর্শনে সমর্থ হয় না। যে পুত্র ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ প্রজ্ঞাচক্ষুর্বিশিষ্ট, সে ইহা জানে। যে, সে সমস্তকে নারী অর্থাৎ প্রকৃতি বলিয়া জানে, সে পিতার পিতা হয়।

সর্ব্ব বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য যে সময়ে এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন নিরুক্ত-পরিশিষ্টে লিখিত এই অর্থ স্মরণ করিয়াছিলেন বোধ হয় না। কেন না, তিনি যে অর্থদ্বয় করিয়াছেন, তাহা ইহা হইতে সর্ব্বথা বিভিন্ন। যথা—

(৩) সায়ণাচার্য্যের প্রথম অর্থ।—সূর্য্যের রশ্মিসমূহ মেঘরূপ গর্ভধারণ করিয়া থাকে (গর্ভধারণ স্ত্রীজাতিরই কার্য্য); অতএব ইহারা স্ত্রী। লোকে ইহাদিগকে বৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া (নিষেক পুরুষেরই কার্য্য) পুরুষ বলিয়া থাকে। যাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষু আছে, তিনিই এ গূঢ় ভাব (অর্থাৎ রশ্মির স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব; উভয়ই) দেখিতে পান। যাহার তাহা নাই, সুতরাং অন্ধ; সে দেখিতে পায় না। আরও, স্ত্রী,পুং—এতদুভয়রূপ রশ্মিপুঞ্জের পুত্রস্বরূপ যে বৃষ্টিজলের সমষ্টি, সেই ক্রান্তদর্শীই ইহা সম্যক্ অবগত আছেন (যেহেতু পিতামাতার প্রকৃত ভাব, পুত্র ভিন্ন কে জানিতে পারে)। যে কেহ এই তত্ত্ব অবগত হয়েন, তিনি জগৎ-পিতৃস্বরূপ রশ্মিপুঞ্জের পিতা সূর্য্য, তদাকারে পরিণত হয়েন; অথবা পিতার পিতা (পিতামহ) হয়েন, অর্থাৎ পুত্র পৌত্র লইয়া সুখে কাল যাপন করেন।

(৪) সায়ণাচার্য্যের দ্বিতীয় অর্থ।—যাহাদিগকে স্ত্রী দেখিতেছ, তত্ত্বজ্ঞগণ তাহাদিগকেও পুরুষ কহেন (অর্থাৎ জীবাত্মাকে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বলা যাইতে পারে; বস্তুত নিত্য নিরঞ্জন নির্ব্বিকার নিরবয়ব আত্মার স্ত্রীত্ব বা পুংস্ত্ব কিছুই সম্ভবে না; দেহ-গ্রহণানুসারেই স্ত্রী পুং ব্যবহার হইয়া থাকে)। যাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষু আছে, তিনিই এ গূঢ় তত্ত্ব (অর্থাৎ বাস্তবিক জীব, স্ত্রীও নহে, পুরুষও নহে, অথচ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় বিষয়ই হইয়া থাকে) দেখিতে পান; যাহার প্রজ্ঞাচক্ষু নাই, সুতরাং অন্ধ; সে দেখিতে পায় না। যে পুত্র ক্রান্তদর্শী হইয়া এ তত্ত্ব বিদিত হয়েন, তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও স্বপিতার পিতৃতুল্য জ্ঞানজ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকেন।

এই মন্ত্রের গুরুপরম্পরাগত আর একটি অর্থও অধ্যাপকগণ উপদেশ করিয়া থাকেন। তাহা এই—

(৫) গুরূপদেশ।—মন্ত্রে, স্ত্রীশব্দে প্রকৃতি এবং পুরুষ শব্দে পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা বুঝিতে হইবে। 'সতীঃ' সত্যঃ, চিরবিদ্যমানা [মহদাদি সৃষ্টি বস্তুতঃ] 'স্ত্রিয়ঃ' স্ত্রীগণ অর্থাৎ প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র। [সাধারণে] 'তান্ উ,' সেই পদার্থ সকলকেই 'মে' আমার,—'পুংসঃ' পুরুষের [কার্য্যপ্রভৃতি] 'আহুঃ' বলিয়া থাকে। 'অক্ষণ্বান্' প্রশস্ত-চক্ষুর্বিশিষ্ট (অর্থাৎ প্রজ্ঞাচক্ষুঃ) ব্যক্তি 'পশ্যৎ' পশ্যতি তত্ত্বতঃ দেখিয়া থাকেন (অর্থাৎ এ সমস্ত কিছুই পুরুষের কার্য্য নহে,—হস্তপদাদিও পুরুষের অবয়বাদি নহে; প্রত্যুত এক প্রকৃতিরই বিবিধ আকার সুতরাং প্রকৃতিই। পুরুষের সহিত এ সমস্তের বাস্তবিক সম্বন্ধ কিছুই নাই; কেননা প্রকৃতি জড়া ও সতত পরিণামশীলা এবং পুরুষ চেতন ও চির-দিনই অপরিণামী; এরূপ বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী পদার্থদ্বয়ের কখন কোনরূপ যথার্থ সম্বন্ধ সম্ভবপরই নহে)। 'অন্ধঃ' প্রজ্ঞাচক্ষুর্হীন ব্যক্তি 'ন বিচেতৎ' ন বিচেততি, এতাদৃশ বিশেষ দেখে না। [বংশের মধ্যে] 'যঃ পুত্রঃ' যে সন্তান 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী (অর্থাৎ স্বপ্রজ্ঞাবলে সাধারণ-দৃষ্টি-লভ্য জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া তথ্য দর্শনে সক্ষম), 'সঃ' তিনি 'ঈম্' ইহা 'আ চিকেত' আ কেততি, ভাল বুঝেন। 'যঃ' যিনি 'তাঃ' তাহাদিগকে (প্রকৃতি-পরিণামরূপ মহদাদি পদার্থ-নিচয়কে) 'বি জানাৎ' বি জানাতি, বিশেষ জানেন, 'সঃ' তিনি [বালক হইলেও] 'পিতুঃ পিতা' পিতার পিতা (অর্থাৎ পিতামহের ন্যায় মান্য) 'অসৎ' অস্তি, হয়েন।

উল্লিখিত অর্থানুসারে আরও একটী অর্থ হইতে পারে। যথা—

(৬) নূতন।—চিরবিদ্যমান মহদাদি সৃষ্টি সমস্তই যেহেতু নিত্য-প্রসবধর্ম্মিণী প্রকৃতিরই পরিণামে আবির্ভূত, অতএব প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং বাস্তবিক স্ত্রী। [সাধারণে] তাহাদিগকেই 'আমার',—'পুরুষের' বলিয়া থাকে (অর্থাৎ এ হস্তপদাদি আমার অবয়ব, এ চক্ষুরাদি আমার ইন্দ্রিয়, এ ঘটপটাদি আমার কার্য্য ইত্যাদি 'আমার' বলিলেই পুরুষের বলা হয়)। বস্তুতঃ 'অক্ষণ্বান্' জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন বা জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ সাংখ্যের চেতন পুরুষ বা বেদান্তের প্রাণ 'পশ্যৎ' দেখেন মাত্র (অর্থাৎ দ্রষ্টা, কর্ত্তা নহেন)। 'অন্ধঃ' অজ্ঞান অর্থাৎ সাংখ্যের জড়া প্রকৃতি ও বেদান্তের রয়ি * 'ন বি চেতৎ' দেখে না, বা জানে না, বুঝে না

* রয়ি শব্দে অন্ন; "অন্ধঃ" ইহাও অন্নের নামান্তর। জড় পদার্থমাত্রকেই অন্ন কহে অর্থাৎ পুরুষের ভোগ্য। আত্মা ও পুরুষ একই কথা। পুরুষ ভিন্ন সমস্তই রয়ি অর্থাৎ প্রকৃতি। প্রকৃতি জড়, সুতরাং জ্ঞানহীন; সেই জন্যই তাহাকে অন্ধ কহে।

(অর্থাৎ প্রকৃতির কর্তৃত্ব থাকিলেও দ্রষ্টৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব নাই—"পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সৃষ্টিঃ"—সাংখ্য-কারিকা)। [বংশের মধ্যে] 'যঃ' যে 'পুত্রঃ' সন্তান 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী (অর্থাৎ স্বীয় প্রজ্ঞাবলে সাধারণ-দৃষ্টি-লভ্য জ্ঞান অতিক্রম করিয়া তথ্য-দর্শনে সক্ষম) 'সঃ' তিনি 'ঈম্' এই (প্রকৃতি ও পুরুষের বাস্তব বিভিন্নতা) 'আচিকেত' সম্যক্ জানেন। 'যঃ' যিনি 'তাঃ' সেই প্রকৃতি-পরিণতি সমুদায়কে 'বিজানাৎ' বিশেষ জানেন (অর্থাৎ কার্য্য কারণ, এ সমস্তই প্রকৃতি। পুরুষ, এ সমস্তের দ্রষ্টা ভোক্তা স্বতন্ত্র; এই ভেদ বুঝিতেছেন), 'সঃ' তিনি (অর্থাৎ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি-জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষ) 'পিতুঃ পিতা' পিতা—জীবাত্মা, তৎপিতা পরমাত্মা (সেশ্বর সাংখ্য মতে তৎসদৃশ, বেদান্তমতে তৎস্বরূপ) 'অসৎ' হয়েন (অর্থাৎ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করেন)। প্রকৃতি ও পুরুষের বা রয়ি ও প্রাণের বাস্তবিক পরিজ্ঞানের অভাবেই লোকে 'আমার আমার' করে; এই আমার-রূপ মমতাই সর্ব্ববিধ বাসনার মূল এবং বাসনাই জীবের প্রকৃত বন্ধন; এই বন্ধনে আবদ্ধ জীবই পুনঃ পুনঃ জন্ম, জরা, মৃত্যু, ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে; এ হস্তপদ, এ চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি, এ ঘটপটাদি, বলিতে কি, এ সমস্ত জগৎই প্রকৃতি, আমি পুরুষ; প্রকৃতির সহিত আমার বাস্তব সম্বন্ধ কিছুই নহে, এই টুকুই জানার মতন জানিলে 'আমার আমার' থাকে না, কার্য্যেই বাসনারূপ বিষম রজ্জু-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, বাসনার অভাব ঘটিলেই কৈবল্য স্বতঃসিদ্ধ হয়।

(৭) এই মন্ত্রের আরও একপ্রকার অর্থ আছে, তাহা মৌখিক উপদেশেই সুগম হয়, লিপির সাহায্যে প্রকাশ বা গ্রহণ, উভয়ই কিছু কষ্টকর।

শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী।

কোম্পানীর জমিদারী।

পাঠক! ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মরিয়াছেন, কিন্তু লোকে "কোম্পানীর পথঘাট" "কোম্পানীর মুল্লুক" ইত্যাদি কথা আজও প্রয়োগ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সে কালের "জন্ কোম্পানী" কিরূপে দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা গুণে আজকালের এই বিশাল ইংরাজাধিকৃত রাজ্যের মূল স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে বিস্ময়াবহ। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কি কি

কঠোর দুঃসাধ্য উপায়াবলম্বনে—কোন কোন কষ্টসাধ্য অনল-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—এই বিশাল লোকবহুল রত্নগর্ভা ফলশস্যময়ী ভারতভূমির স্বত্ববান্ হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে অনেকগুলি আবশ্যকীয় কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সুবিখ্যাত জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা স্থাপনের আট বর্ষ পরের ঘটনা ও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের দশ-শালার বন্দোবস্ত, এই দুই বিশাল সীমার মধ্যে কিরূপে কোম্পানী এদেশের ভূস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাহার পরিপুষ্টি করিয়া প্রকৃত পক্ষে কি অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা আজকাল কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা।

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদের বঙ্গদেশে কোম্পানীর নিজের বলিবার কোন একটা বেশী ভূসম্পত্তি ছিল না। ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি অন্যান্য ইয়ুরোপীয় বণিক্-সম্প্রদায়ের যেমন এখানে সেখানে দুই চারিটা কারখানা বা কুঠী ছিল, ইংরাজেরও তদ্রূপ। তাঁহারাও যেরূপ রাজসরকারে খাজনা দিতেন, ইংরাজও সেইরূপ করিতেন। ইহা ছাড়া জমীর উপর তাঁহাদের অন্য কোন প্রকার স্বত্ব ছিল, এরূপ বোধ হয় না। *

সাহা জাহানের রাজত্বকালে, ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলায় কুঠী খুলিবার অনুমতি পান। গেব্রিয়েল্ বা বাউটন্ নামক একজন ডাক্তার তাঁহাদের বাণিজ্য জাহাজের কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই সময়ে বাদসাহের প্রিয়তমা কোন অন্তঃপুরিকার কঠিন পীড়া উপস্থিত হওয়াতে, বাউটন্ সেই স্থলে পাশ্চাত্য চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার রোগের প্রতিবিধান করেন। এই সময়ে সুলতান সাহসুজা, বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন †, রাজমহলে সুজার অন্তঃপুরেও চিকিৎসা কার্য্যে নিপুণতা দেখাইয়া বাউটন সাহেব, সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা দেশে কারখানা ও কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি-পত্র প্রাপ্ত হন।

চিকিৎসকের চিকিৎসাস্ত্র-মুখে ইংরাজ বণিক্, যে স্বত্বটুকু লাভ করিলেন, দুর্দ্দৈব তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া অন্য পথে পরিচালিত না করিলে,

* Clive's letter to the Select Committee, 16th January, 1767.

† Bruce's Annals—PP. 406 and 463. মিল, ষ্টুয়ার্ট, মার্শমান ও হুইলার প্রভৃতি ইতিহাসকারেরা এই ঘটনার সময়টী লইয়া একটু গোলমাল করিয়াছেন, কিন্তু বাউটনের কার্য্য-সম্বন্ধে কেহই সন্দিগ্ধ-চিত্ত হন নাই।

হয় তো তাঁহারা এতজ্জনিত সমস্ত সুখই উপভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু ঘটনা-বশে কোম্পানীর মন তখন অন্য এক উচ্চতর আশায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইংরাজ কোম্পানীর অনেক দিন হইতেই ইচ্ছা ছিল যে, বাহুবলে বাঙ্গলায় অধিকার স্থাপন করিতে হইবে। এই সময়ে দ্বিতীয় জেম্‌স্ ইংলণ্ডে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। মোগল বাদসাহের সহিত যুদ্ধ-কল্পনা, তাঁহার সেই রাজমস্তিষ্ককে সেই সময়ে যথোচিত উত্তেজিত করিয়া তুলিল। কোম্পানীর বিলাতের ডাইরেক্‌টারেরা রাজার সহিত এক পরামর্শে, ভারতে সৈন্য প্রেরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। কোম্পানীর দল ভাবিয়াছিলেন, এই প্রকার বিগ্রহে তাঁহারা এদেশীয় জমীদার আরাকানের রাজার সাহায্য পাইবেন মনে করিয়া সর্ব্বপ্রথমে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই এই কল্পনা, তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। উদ্যোগ করিতে করিতে আরও দুই বৎসর কাটিল। ইংলণ্ডেশ্বর জেম্‌স্, অগণ্য নৌ-সেনা সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গলায় পাঠাইলেন। ইহার পরিণাম—দুরাশার পরিণাম যাহা হয়, তাহাই হইয়াছিল। যুদ্ধের ফল-স্বরূপ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানী বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বাউটনের তীক্ষ্ণ চিকিৎসাস্ত্র-মুখে যাহা অর্জ্জিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রগল্‌ভতায় তাহা বিনষ্ট হইল।

বাঙ্গলা হইতে ইংরাজের বাস উঠিল, কিন্তু এতজ্জন্য নবাবের ধনাগারে কিঞ্চিৎ অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইল। অন্যান্য ইয়ুরোপীয় বণিক্ অপেক্ষা ইংরেজ কোম্পানী, ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ ছিলেন। তাঁহাদের লাভের অংশ নবাবের খাজনাখানার বিশেষ সহায়তা করিত। এ প্রকার অবস্থায় দৈবদুর্ব্বিপাকে কোম্পানীর ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ হইলেও, নবাব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে পুনরায় বাঙ্গলায় আহ্বান করিলেন।

এই আহ্বানে অতি শুভক্ষণে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে সুপ্রসিদ্ধ জব্ চার্ণক্ সাহেব, হুগলী হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা সমাধা হইল। *

* Bolt's Considerations of Indian affairs, p. 60.

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ, সমগ্র বঙ্গভূমির পক্ষে মহা স্মরণীয় সময়। বর্দ্ধমানাধিপের অধিনায়কত্বে বাঙ্গলার প্রধান প্রধান জমীদারবর্গ, আপনাদিগকে এই সময়ে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিলেন।

বিদ্রোহী জমীদারদিগকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গলায় তদানীন্তন নবাব সাহেবকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল *। বঙ্গাধিপ, যখন বিদ্রোহ-দমনে ব্যস্ত, তখন কৌশলী, প্রত্যক্ষদর্শী, সুচতুর ইংরাজ কোম্পানী, আত্ম-রক্ষার ছলনায় সুতানুটীর অধিকারগুলি দুর্গাকারে প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া, সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার অধিকার, ধরিতে গেলে, এমন একটা কিছু বিশেষ বিস্তৃত সম্পত্তি নহে। যে অংশে তাঁহাদের কুঠী ও বাণিজ্যাগার ছিল, সেই অংশেই তাঁহাদের অধিকার সাব্যস্থ হইত। ইংরাজ কোম্পানী, সময় ও অবসর বুঝিয়া কলিকাতা, তৎপার্শ্বস্থ সুতানুটী ও গোবিন্দপুর নামক গ্রাম তিন খানি, কিনিবার জন্য ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ-পৌত্র, বাঙ্গলার তদানীন্তন সুবাদার আজিম উসানের সমীপে, ওয়ালশ্ নামক এক ধীর, প্রশান্তবুদ্ধি, চতুর ও কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন।

আজিম উসান, বিদ্রোহ-দমন জন্য দিল্লী-সরকার হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তখনও বিদ্রোহ-বহ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। কুমার, বর্দ্ধমানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজ-দূত, সেই খানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে সাক্ষাৎ হইল। ষোড়শ সহস্র মুদ্রা উপহার দিয়া, তাঁহারা বাদসাহ-পৌত্রের নিকট হইতে এই তিন খানি গ্রাম ক্রয় করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

খরিদ করিবার অনুমতি-পত্র যখন সুতানুটীতে পৌঁছিল, তখন কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী, সেই খানি ঐ তিন খানি গ্রামের জমিদারদিগকে দেখাইলেন। ঐ আজ্ঞাপত্রে বাদসাহের দেওয়ানের স্বাক্ষর ছিল না। সেই সহি আনাইতে আবার দিন কতক দেরি পড়িয়া গেল। এইরূপ নানাবিধ বিঘ্ন ও বিপত্তি সত্ত্বেও বৎসরের শেষ ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, গ্রাম তিন খানি স্বাধিকারভুক্ত করিলেন।

---

* Bolt's Considerations of Indian Affairs, p. 60.

এই সময়ে আবার এক নূতন-বিধ বিপত্তিপাতের সূত্রপাত হইল। যে কোম্পানী, এই তিন খানি গ্রামের সনন্দ চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে এই দেশে বাণিজ্যার্থে আইসেন। তাঁহারা "লণ্ডন্ কোম্পানী" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে আর এক দল ইংরাজ সওদাগর, পার্লিয়ামেণ্ট্ ও ইংলণ্ডাধিপের সনন্দ লইয়া, "ইংলিশ্ কোম্পানী" নাম ধারণ করিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। দিন কতক ধরিয়া উভয় দলের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে এদেশে ইংরাজ-শাসন প্রচলিত হইবে বুঝিয়াই, যেন এই দুই প্রতিযোগী দলের মিলন হইয়াছিল। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডাধিপের ও পার্লিয়ামেণ্ট্ মহাসভার সম্মতি অনুসারে দুই দল একত্র হইয়া 'পূর্ব্ব দেশের বাণিজ্যার্থী সম্মিলিত দল' * এই আখ্যা ধারণ করিলেন। এই ঘটনা না হইলে হয়তো ভারতে ইংরাজ-শাসন দেখিতে পাইতাম না। †

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর নূতন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ-সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ে অধিকার-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সিতে পরিণত করা হইয়াছিল। এক্ষণে বাঙ্গালার ইংরাজাধিকার আরও বৃদ্ধি করিয়া কলিকাতাকে একটী প্রেসিডেন্সিতে পরিণত করিবার ইচ্ছা, কোম্পানীর মনে বলবতী হইয়া উঠিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করণার্থ তাঁহারা সম্রাট্ ফোরেকশিয়ারের সভায় এক দৌত্যাভিযান প্রেরণ করিবার মনন করিলেন। অসংখ্য উপঢৌকন দ্রব্যাদিও সেই সঙ্গে প্রেরিত হইল।

এই দৌত্যকার্য্যের মূলে অধিকার-বিস্তৃতির আবেদন-সংকল্প ছাড়া ইংরাজ কোম্পানীর আরও একটী উদ্দেশ্য গভীর-ভাবে নিহত ছিল। যে সাহস-উদ্যম, এই বিশাল বিশ্ব-মধ্যে ইংরাজের প্রতিষ্ঠা-স্থাপনের প্রধান সহায়-স্বরূপ, তাহারই সহায়তায়, তাঁহারা হৃদয়-নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য-সাধন-সংকল্পে অগ্রসর হইলেন। মুরশীদ কুলীখাঁ তখন বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তাঁহার দুর্দ্দান্ত প্রতাপ, প্রচুর ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা, ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই জানেন। মুরশীদ কুলীখাঁ স্থির হইয়া ইংরাজের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আসিতেছিলেন।

* United Company of Merchants trading in the East.

† Stewart's Bengal. pp. 214-15. Marshman. 219.

তাঁহার রাজকোষে ইংরাজ কোম্পানীর টাকা উঠিত বলিয়া তিনি প্রথম প্রথম বড় একটা পীড়াপীড়ি করিতেন না। কিন্তু দেশ-মধ্যে ইংরাজ বণিক্, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত-প্রতাপ হইয়া উঠাতে তিনি, নানাবিধ অযথা শুল্ক গ্রহণ ও কঠোরনীতি-অবলম্বনে প্রকারান্তরে বাঙ্গলায় ইংরাজের প্রতিযোগীতা আরম্ভ করিলেন।

মুরশীদ কুলীখাঁর কঠোর শাসনের মধ্যে যদি তাঁহারা বাদসাহ-সরকার হইতে অনুরোধ দ্বারা কোন সুবিধাজনক স্বত্বলাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যও এই দৌত্যাভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রথম বারে চিকিৎসকের অস্ত্রে ভারতে ইংরাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এবারও তাহার পুনরাভিনয় হইল। ডাক্তার হামিল্‌টন, ইংরাজ দূতের সঙ্গে চিকিৎসকরূপে গিয়াছিলেন। সম্রাট ফেরোকশিয়ারের কোন বিশেষ পীড়ার উপশম করাতে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কোন অভিলষিত দ্রব্য প্রার্থনা করিতে বলেন। স্বজাতি-প্রেমোদ্বেলিত-হৃদয় হামিল্‌টন, নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কোম্পানীর জন্য অন্যান্য স্বত্বলাভের সহিত ৩৮ খানি নূতন গ্রাম খরিদের অনুমতি লাভ করিলেন। এই গ্রামগুলি, কলিকাতার পার্শ্বস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার মিলের মতে * কোম্পানীর অধিকার, কলিকাতার চারি দিক্ ব্যাপিয়া প্রায় পাঁচ ক্রোশের উপর বিস্তৃত হইল।

অনুমতি লাভ করিয়া, দিল্লী হইতে শত শত ক্রোশ দূরে বাঙ্গালায় তাহার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করা, কোম্পানীর ভাগ্যে সহসা ঘটিয়া উঠিল না। প্রবল-প্রতাপান্বিত মুরশীদ কুলীখাঁ, প্রকাশ্যে ইংরাজের এই প্রকার প্রগল্‌ভতার জন্য কোন অনুযোগ বা বিরক্তি প্রদর্শন করিলেন না। একে দিল্লীর দরবারের হুকুম, তাহাতে আবার ফেরোকশিয়ার নিতান্ত ক্রীড়াপুত্তলী নহেন। কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁহার বক্রদৃষ্টি দেখিয়া বাঙ্গালার জমিদারবৃন্দ, যাঁহারা এই কয় খানি গ্রামের স্বত্বাধিকারী ছিলেন, কেহই এই গ্রামগুলি বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই প্রকারে বহু আয়াস-সাধ্য দৌত্য-কার্য্যের সম্পূর্ণ সমাধি হইল। †

* Mill's British India. pp 20-21.

† অন্য একস্থলে আমরা দেখিতে পাই, আজিম উশানের প্রদত্ত সনন্দ-ক্ষমতা, ইংরাজের বরাবরই ছিল। সম্রাট ফেরোকশিয়ারও সনন্দ-প্রদান-সময়ে এই কথার প্রথম উল্লেখ

কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের জমীগুলি কাহাদের প্রথম দখলে ছিল, এবং কোম্পানী, কিরূপ সর্ত্তে ও কি প্রকার দলিলে তাহার অধিকারী হন, ইহার অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই এবং হইবার সুবিধা নাই। যদি এই তথ্যানুসন্ধানের কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে ভারতে ইংরাজ-অধিকৃত ইতিহাসের একটী আবশ্যকীয় পরিচ্ছেদের এক অত্যাবশ্যকীয় অংশ বাহির হইয়া পড়িত। যাঁহারা এই সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন, নবাবী আমলের নিয়মানুসারে তাঁহাদের স্বত্ব কিরূপ প্রকারের ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিলেও তৎকালীন জমীর স্বত্বাধিকার ও তাহার হস্তান্তর-করণ-সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় তথ্য বাহির হইয়া পড়িত। *

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

করিয়াছেন। এই সময়ে কোম্পানী কি প্রকার ভূস্বামিত্ব বা ভূম্যধিকারিত্ব পাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ফারমানের অংশ হইতে সম্যক্‌রূপে প্রতীয়মান হয়।

"আমিরাবাদ পরগণার অন্তর্ভুক্ত কলিকাতা, সুতানুটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি তিনখানি গ্রাম কোম্পানীকে, পূর্ব্বের সনন্দে প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রাম তিনখানি কোম্পানী, উহাদিগের অধিকারীদের নিকট হইতে কিনিয়া লইয়াছেন। এবং এতজ্জন্য ইহার বাৎসরিক ১১৯৫।৶০ খাজনা সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে ইহাদিগকে আরও ৩৮ খানি গ্রামের স্বত্বাধিকার দেওয়া হইল। ইহার খাজনা-স্বরূপ, ইংরাজ কোম্পানী বাৎসরিক ৮১২৮ ॥৶ আনা দিবেন। এই গ্রামগুলি উক্ত তিন খানি প্রথমোক্ত গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী। * * হুকুম হইল যে, প্রথমকার খরিদা গ্রামগুলি তাঁহাদের দখলে রহিল। উল্লিখিত হারে তাঁহারা উক্ত সম্পত্তির খাজনা, সরকারে যোগাইবেন। * * হুকুম হইল—দেওয়ান ও সুবাদারের অনুমতি-ক্রমে তাঁহারা পূর্ব্ব খরিদা গ্রাম তিন খানি দখলে রাখিবেন এবং বাকি ৩৮ খানি তাহাদের অধিকারীদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইবেন।"—Aitchison's Treaties p. 2.

এই দলিল খানি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম দলিল। ইহারই এক শুভ পরিণামে, আজ ইংরাজ, ভারতের অধীশ্বর।

* হেষ্টিংসের সাময়িক সুপ্রসিদ্ধ আইন-তত্ত্ববিৎ হারিংটন সাহেব, ইহাকে কেবল তালুকদারী-স্বত্ব-বিক্রয় বা হস্তান্তর (Transfer of Talookdari Rights) বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু তৎকালীন প্রাচীন "মেয়ার্স" কোর্টের জনৈক প্রবীণ বিচারক বোল্‌ট্‌ সাহেব ইহাকে জমিদারী স্বত্ব-বিক্রয় ও হস্তান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকার সামান্য বিভিন্নতা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় নহে। কোম্পানী যখন, বাদসাহ-সরকারে প্রত্যক্ষভাবে ১১৯৫।৶০ এই সমস্ত খরিদা জমির জন্য জমা সরবরাহ করিতেন, তখন ইহাকে প্রকৃত পক্ষে জমিদারী স্বত্বই বলে। যাঁহারা ইহা বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন তথ্য আবিষ্কৃত হইলে, এই মত-বিভিন্নতার মীমাংসা হইতে পারে।—Harrington's Analysis p 2. and Bolt's Considerations of Indian Affairs p 60.

মোহমুদ্গার।

(পদ্যানুবাদ)

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং,
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং,
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং ॥১॥

মূঢ়! ছাড়হ ধনাগম-তৃষ্ণা।
অন্তঃকরণে ধরহ বিতৃষ্ণা॥
বিত্ত যা' লভ আপন কাজে।
চিত্ত-বিনোদন তাহে সাজে॥ * ১॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং,
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥২॥

অর্থ অনর্থই ভাবহ নিত্য।
নাহিক তাহে সুখটুকু সত্য॥
পুত্র হ'তেও ধনধর-ভীতি।
সর্ব্বস্থানে এমনই নীতি ॥২॥

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।

---

* পরমহংস শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত এই সুপ্রসিদ্ধ "মোহ-মুদ্গার" নীতি-পুস্তিকাখানির সমস্ত শ্লোকই পজ্ঝটিকা ছন্দে গ্রথিত। আমিও ইহার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ ঐ পজ্ঝটিকা ছন্দেই করিলাম। সংস্কৃত-ছন্দঃ-শাস্ত্রের মতে পজ্ঝটিকা ছন্দঃ মাত্রাবৃত্তির অন্তর্গত। অক্ষরের লঘু গুরু মাত্রানুসারে এই ছন্দঃ পড়িতে হয়।

কস্ত্বং বা কুত আয়াত-
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥৩॥

কে তব কান্তা? সুত বা কে তব?
নিশ্চয় অতিশয় অদ্ভুত এ ভব॥
কোথা এলে, তুমি বা কার?
চিন্তহ ভ্রাতা তা' অনিবার ॥৩॥

মা কুরু ধনধনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥৪॥

না কর ধনজনযৌবন-গর্ব্ব।
কাল, নিমিষে হরয়ে সর্ব্ব॥
ভুলি' মায়াময় ইহ সংসারে।
ব্রহ্মপদে পশ আশু বিচারে ॥৪॥

নলিনীদলগতজলমতিতরলং,
তদ্বদ্‌জীবনমতিশয়চপলং।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং,
লোকং শোকহতং সমস্তং ॥৫॥

জল অতি ঢল ঢল নলিনী-পাতে।
তেমতি টল মল জীবন গাতে॥
শোকে বিনিহত রোগগ্রস্ত।
নিশ্চয় জানহ লোক সমস্ত ॥৫॥

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,
পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।

---

৮ গাতে—গাত্রে, শরীরে বা দেহমধ্যে

ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥৬॥

তত্ত্ব নিরন্তর চিন্তহ চিতে।
পরিহর চিন্তা নশ্বর বিত্তে ॥
সাধুসমাগম ইহ সংসারে।
নৌকা-সম লয় ভব-জল-পারে ॥৬॥

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রা,
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥৭॥

অষ্টকুলাচল, সপ্ত সমুদ্র।
ব্রহ্মা ইন্দ্র দিনকর রুদ্র ॥
আমি কিবা তুমি বা তিন লোক।
না রহিবে কিছু, না কর শোক ॥৭॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত-
স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে,
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥৮॥

যত দিন তুমি ধন-অর্জ্জন-শক্ত।
তত দিন তব পরিজন অনুরক্ত ॥
শেষে যব * তব জর্জ্জর-অঙ্গ।
কে বা করিবে ভাষ-প্রসঙ্গ ॥৮॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং,
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহং।

* যব—হিন্দী শব্দ। অর্থ—যবে।

আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া-
স্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥৯॥

জ্ঞানী ষড়রিপু দূরে রেখে। †
"কোহম্" ‡ ভাবি নিজকে দেখে ॥
আত্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত মূঢ়।
পচয়ে হইয়ে নরকারূঢ় ॥ ৯ ॥

সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥১০॥

সুরমন্দির তরুমূলনিবাস।
শয্যা ভূতল অজিনই বাস ॥
সকল পরিগ্রহভোগত্যাগ।
এ সব সুখ দেয় বিরাগ ॥ ১০ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত-
স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥১১॥

বালক-কালে কেবল খেলা।
যৌবনকালে যুবতী-লীলা ॥
বৃদ্ধাবস্থে চিন্তামগ্ন।
না হয় কেহই ব্রহ্মে লগ্ন ॥১১॥

† ষড়রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।
‡ কোহম্—কে আমি।

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ,
মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং,
বাঞ্ছস্যচিরাৎ যদি বিষ্ণুত্বং ॥ ১২ ॥

বাদে ভাবে বান্ধব-পুত্রে।
না কর ইচ্ছা মিত্রামিত্রে ॥
রহ সমচেতা সর্ব্বস্থানে।
হরিপদ যদি তব আশা প্রাণে ॥১২॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং,
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥১৩॥

জনম যখন হল, মরণ ত' হইবে।
পুনরপি জননীজঠরে শুইবে ॥
ইহ সংসারে এ সব দোষ।
তবু তুমি মানব খুঁজ সন্তোষ? ॥১৩॥

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ।
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥১৪॥

নিতি নিতি দিন নিশি সায়ং প্রাতঃ।
ঋতু হিম-মাধব-যাতায়াত ॥
কাল ত' খেলত ভাগত আয়ু।
তবু না ছোড়ত আশা-বায়ু ॥১৪॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং,
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং ॥১৫॥

তনু হ'ল থল থল, চুল হ'ল পাকা।
দন্ত পতিত হ'ল' কটি হ'ল বাঁকা ॥
থর থর কম্পে কর-ধৃত দণ্ড।
তবু না ছাড়ে আশাভাণ্ড ॥১৫॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু-
র্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং,
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং ॥১৬॥

ত্বৎ-মৎ সব প্রতি একই বিষ্ণু।
মৎপ্রতি কোপিছ তুমি অসহিষ্ণু ॥
শুভ যদি চাহ সব সম জান।
পরিহর রে নরভেদ-জ্ঞান ॥১৬॥

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ,
শিষ্যাণাং কথিতোহভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং,
তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকং ॥১৭॥

ষোড়শ পজ্ঝটিকা কম ছন্দে।
শিষ্য-কথিত উপদেশ-প্রবন্ধে ॥
এতে নহিবে যার বিবেক।
তৎপক্ষে নহি কিছু অতিরেক ॥১৭॥

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।
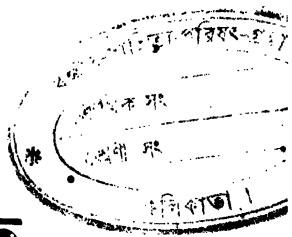
পুরোহিত

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ } ১৩০০ সাল, পৌষ। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

প্রাতঃপ্রণাম।
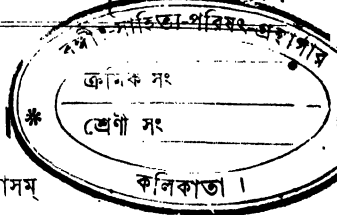
প্রাতর্নমামি তরুণারুণকোটিভাসম্
অজ্ঞানসন্তমসরাশিবিনাশিনীং তাং।
যা হন্তি সর্ব্বজগতামখিলং ব্যলীকং
মাতা যথা সুতমুখাশ্রু করেণ মার্ষ্টি॥ ১॥

জিনিয়া অরুণ-কোটি যাহার প্রকাশ,
অজ্ঞান-তিমির ঘোর যে করে বিনাশ;
জননী পুত্রের অশ্রু মুছায় যেমন,
তেমনি সবার দুঃখ যে করে মোচন;
সেই বিশ্বজননীর পদে বার বার—
প্রভাতে উঠিয়া আমি করি নমস্কার। ১।

প্রাচী সমর্চ্চয়তি যাং নবরাগরক্তা
বালার্কলোহিতজবাকুসুমেন নিত্যং।
যাং সেবতে সুরভিমন্দবিভাতবায়ুঃ
তাং বিশ্বমাতরমহং প্রণতোঽস্মি দেবীং॥ ২॥

প্রভাতের সুবাসিত শীতল পবন
যার অঙ্গে মন্দ মন্দ করিছে বীজন ;
পূর্ব্বদিক্ নব রাগে রঞ্জিত হইয়া
তরুণ-অরুণরূপ রক্ত জবা দিয়া
গগন-মন্দিরে নিত্য পূজা করে যার,
সেই বিশ্বজননীরে করি নমস্কার। ২।

গায়ন্তি যদ্‌গুণগণান্ মধুরং বিহঙ্গাঃ
পশ্যন্তি যামপি সরাংসি সরোজনেত্রৈঃ।
যৎপ্রেমতস্তরুলতাঃ শিশিরাশ্রুসিক্তাঃ
প্রাতর্নমামি শুভদাং পরমেশ্বরীং তাং ॥ ৩ ॥

পাখীরা মধুর স্বরে যার গুণ গায়,
সরোবর পদ্ম-নেত্রে যার পানে চায় ;
তরু লতা যার প্রেমে হ'য়ে নিমগন
অজস্র তুষার-অশ্রু করে বরষণ ;
পরমা ঈশ্বরী সেই সর্ব্বমঙ্গলার—
চরণে প্রভাতে আমি করি নমস্কার। ৩।

অস্পৃশ্যপাতকিশতান্যপি যা বহন্তী
ভাগীরথীব মলমূত্রশবানশেষান্।
নৈবাশুচির্ভবতি বর্দ্ধতএব কীর্ত্তিঃ
বন্দেঽসকৃৎ পতিততারণকারিণীং তাং ॥ ৪ ॥

মল মূত্র শবদেহ করিয়া বহন,
গঙ্গা তাহে অপবিত্র হয় না যেমন ;
তেমনি অস্পৃশ্য পাপী ল'য়ে শত শত
অশুচি না হয় যেই, নাম বাড়ে তত ;
পতিতপাবনী সেই ইষ্টদেবতার—
চরণে প্রণাম আমি করি শতবার। ৪।

যোগীশ্বরো রিভুবরো বিভুশঙ্করোঽপি
বক্ষঃ প্রসার্য্য ধৃতবান্ হৃদয়ে স্বয়ং যৎ।
ধ্যানৈকতানহৃদয়ৈর্মৃগিতং মুনীন্দ্রৈঃ
প্রাতর্নমামি তদহং পদমম্বিকায়াঃ ॥ ৫ ॥

যোগীশ্বর সুরবর সে বিভু শঙ্কর
বুক পাতি' যে পদ রাখিলা হৃদি-পর ;
মহাযোগে মুনিগণ হ'য়ে নিমগন
হৃদয়ে সদাই ধ্যান করে যে চরণ ;
সেই ব্রহ্মময়ী মার চরণকমলে—
প্রভাতে প্রণাম আমি করি কুতূহলে। ৫।

যথা সমুদ্রঃ সরিতঃ সমস্তাঃ
গৃহ্লাতি যৈকা সমমেব সর্ব্বান্।
ন যত্র লিঙ্গং ন বয়ো ন জাতিঃ
নিজঃ পরো বাপি নমোঽস্তু তস্যৈ ॥ ৬ ॥

সমভাবে নিজ গর্ভে সমুদ্র যেমন
শত শত নদ নদী করয়ে ধারণ,
তেমনি যে ছোট বড় সবারে সমান
আপন অমৃতময় কোলে দেয় স্থান ;
জাতি লিঙ্গ বয়সের না করে বিচার,
নাহিকো আপন পর প্রভেদ যাহার ;
সেই বিশ্বদেবতার পদে বার বার—
প্রভাতে উঠিয়া আমি করি নমস্কার। ৬।

জীর্ণেঽপি দেহে নহি জাতু জীর্য্যেৎ
নষ্টেঽপি নশ্যেৎ নহি জীবনেঽপি।
সম্বন্ধ একঃ প্রলয়েঽপি তিষ্ঠেৎ
সার্দ্ধং যয়া তাং প্রণমামি দেবীং ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ যাহার সনে সমভাবে রয়,
দেহ জীর্ণ হইলেও জীর্ণ নাহি হয় ;
হ'লেও জীবন ক্ষয় নাহি পায় ক্ষয়,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েও নাহি পায় লয় ;
প্রভাতে উঠিয়া সেই ইষ্টদেবতার—
চরণে প্রণাম আমি করি শতবার। ৭।

সুপ্তং নিশায়াং গতচেতনং মাম্
অতর্কিতানাং বিপদাং শতেভ্যঃ।
যা দেবতা পাতি কৃপাঙ্কমধ্যে
নমামি তাং সঙ্কটতারিণীং মাং ॥ ৮ ॥

রাত্রিতে ঘুমায়ে আমি হ'লে অচেতন,
অজ্ঞাত বিপদ কত আসে অগণন ;
সে সময়ে কৃপা কোলে যে মোরে লুকায়,
সঙ্কটতারিণী সেই নমি মার পায়। ৮।

যদৈব মৃত্যোর্ভয়মেতি চেতঃ
যা মে কৃতান্তাদভয়ং দদাতি।
ভবে গতির্যা কিল দেবতৈকা
তাং মাতরং প্রাতরহং নমামি ॥ ৯ ॥

যম-ভয়ে অবসন্ন হইলে হৃদয়,
মাভৈ মাভৈ রবে যে দেয় অভয় ;
যে জননী একমাত্র গতি সবাকার,
প্রভাতে তাহার পদে করি নমস্কার। ৯।

নাম্নৈব যস্যা গলদশ্রু নেত্রম্
আনন্দসন্দোহ উদেতি কোঽপি।
তাপাঃ প্রশাম্যন্তি ফলন্তি কামাঃ
তাং দেবতাং প্রাতরহং নমামি ॥ ১০ ॥

যার নামে নয়নে প্রেমাশ্রু-ধারা বয়,
কি এক আনন্দরাশি উছলিত হয়!
শান্ত হয় সর্ব্ব তাপ, পূর্ণ হয় কাম,
প্রাতে সেই দেবতার চরণে প্রণাম। ১০।

প্রোদ্ভাসয়ন্তীং জগদাত্মভাসা
সংপ্লাবয়ন্তীং দয়য়া চ বিশ্বং।
অমেয়মাহাত্ম্যবিভূতিস্ফূতিং
তাং কোটিকৃত্বঃ প্রণমামি দেবীং॥ ১১॥

রূপের ছটায় যার বিশ্ব আলোকিত,
আকাশ পাতাল যার দয়ায় প্লাবিত;
অনন্ত ঐশ্বর্য্য যার মহিমা অপার,
কোটি কোটি নমস্কার চরণে তাহার। ১১।

কীর্ত্তিং সদা ঘোষয়তে যদীয়াং
স্থূলং চ সূক্ষ্মং চ জলং স্থলং খং।
গুণা মনোবাগ্‌বিষয়া ন যস্যাঃ
সসম্ভ্রমং তাং প্রণমামি শশ্বৎ॥ ১২॥

স্থূল, সূক্ষ্ম, জল, স্থল, শূন্য, চরাচর,
যার কীর্ত্তি ঘোষণা করিছে নিরন্তর;
বাক্য মন হারি মানে গুণগানে যার,
সসম্ভ্রমে তার পদে নমি বার বার। ১২।

যৎ কিঞ্চিদেবাস্ত্যপমানজাতং
যস্যাস্তুলায়াং তৃণবল্লঘু স্যাৎ।
আত্মোপমানং স্বয়মেব যৈকা
কৃতাঞ্জলিস্তাং জননীং নমামি॥ ১৩॥

তুলনা দিবার বস্তু যে আছে যথায়,
তৃণতুল্য হয় সব যার তুলনায়;
যে দেবতা আপনার তুলনা আপনি,
করজোড়ে নমি সেই বিশ্বের জননী। ১৩।

তারে ব্রহ্মময়ি! প্রাতর্নমস্কারং গৃহাণ মে।
নান্যত্র মতিরাস্তাং মে ত্বৎপাদকমলং বিনা॥১৪॥

ও মা তারা ব্রহ্মময়ি! লহ নমস্কার,
তব পদে এইমাত্র মিনতি আমার,—
ও পদ-কমলে বাঁধা থাকে যেন মন,
অন্য কিছুতেই যেন না করে গমন। ১৪।

প্রণত
শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

হিন্দু-পুরোহিতের আত্মোৎসর্গ।

বীরকুল-কেশরী মহারাণা প্রতাপসিংহ, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এক দিন মহোৎসব উপলক্ষে স্বীয় সহোদর শক্তসিংহকে লইয়া মৃগয়া-ব্যাপারে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে পাত্রমিত্র পারিষদ প্রভৃতি অন্যান্য অশ্বারোহিগণ এবং রাজপুরোহিত আসিয়াছিলেন; মৃগ বধ করিতে করিতে সকলেই গভীর হইতে গভীরতর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বীরগণের সিংহনাদে, অশ্বকুলের হ্রেষাধ্বনিতে, রণবাদ্যের গম্ভীর নির্ঘোষে এবং পলায়মান পশুগণের আর্ত্তনাদে বনভূমি বিকম্পিত হইতে লাগিল।

সহসা বীরগণের জয়োল্লাস-ধ্বনি নিরস্ত হইয়া গেল। তাঁহাদের প্রীতি-প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে দারুণ অশান্তির ছায়া লক্ষিত হইল; অশ্বের বিদ্যুৎগতি নিরুদ্ধ হইল। সকলেই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন, উভয় ভ্রাতার

মধ্যে লক্ষ্য-সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে সে তর্ক-বিতর্ক ভয়ানক কলহে পরিণত হইল—যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ প্রচণ্ড শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। উভয় রাজকুমারের মুখমণ্ডল প্রভাত তপনের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল, চক্ষু হুতাশনসম জ্বলিয়া উঠিল। উভয়ে তখন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন প্রতাপ, শক্তসিংহের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হস্তস্থ শেলদণ্ড উদ্যত করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"আইস, দেখা যাউক, কাহার লক্ষ্য অব্যর্থ"। শক্তসিংহও পশ্চাৎপদ হই-লেন না; তাঁহার হৃদয়ে সামান্যমাত্র ভীতি সঞ্চারিত হইল না; তিনি অব-লীলাক্রমে উত্তর করিলেন—"ভাল, দেখাই যাউক, আসুন।" মুহূর্ত্তমধ্যে উভয় ভ্রাতার ভীষণ লৌহ-শেলদণ্ড উত্থিত হইল। তখন অগ্রজের সম্মানার্থ কনিষ্ঠ শক্তসিংহ, প্রতাপের পদধূলি মস্তকে লইলেন। প্রতাপ তাঁহাকে আশী-র্ব্বাদ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা স্ব স্ব শেল উদ্যত করিয়া পর-স্পরকে আক্রমণ করিলেন। সম্মুখে সমস্ত বীরপুরুষ বিস্মিত স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এই অপূর্ব্ব রণাভিনয় দেখিতে লাগিলেন। এ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে শিশোদীয়কুলের সর্ব্বনাশ হইবে জানিয়াও তাঁহারা সাহস করিয়া কাহাকেও নিবারণ করিতে বা বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। ভ্রাতৃযুগলের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এ অপূর্ব্ব রণাভিনয়, সহসা শিশোদীয়কুলের পরম হিতৈষী পুরোহিতের দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, উভয় ভ্রাতায় পরস্পরের বক্ষে শেল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "এইবার তো সর্ব্বনাশ ঘটিল; এই বার তো বাপ্পা রাওর পবিত্র গৌরবান্বিত বংশ একেবারে লোপ পাইতে চলিল।" তিন অমনই আকুলহৃদয়ে দূর হই-তেই—"মহারাজ করেন কি? করেন কি? নিরস্ত হউন, নিরস্ত হউন" এই কথা বলিতে বলিতে, বিবদমান দুই ভ্রাতার মধ্যস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বহুবিধ অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু ভীষণ তরঙ্গসংক্ষুব্ধ মহার্ণব কি সামান্য বাধা মানিয়া থাকে? বিশ্বদগ্ধকারী অনলশিখা কি বারিবিন্দুপাতে নির্ব্বাপিত হয়? তাঁহার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। ভ্রাতৃযুগল তাঁহার সানুনয় বাক্য শুনিলেন না, পূজ্য কুল-

পুরোহিতের মঙ্গল-জনক কথায় শ্রদ্ধা করিলেন না, তাঁহারা কুলক্ষয়কারী দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন না—রাজপুরোহিত দেখিলেন, তাঁহার চক্ষুর উপর দারুণ অনর্থ ঘটিয়া যায়, শিশোদীয় নাম, একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তিনি এই চিন্তায় একান্ত মর্ম্ম-পীড়িত হইলেন ; অবশেষে স্বীয় রক্তে রাজবংশ রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সবিশেষ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে আপনার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন—শাণিত ছুরিকা, বক্ষে গভীর বিদ্ধ হইল; অমনই রক্তের ফোয়ারা ছুটিল—দেখিতে দেখিতে সেখানে শোণিতের স্রোত প্রবাহিত হইল—মুহূর্ত্তমধ্যে পুরোহিত সে স্থানে নিপতিত হইয়া গতাসু হইলেন। সকলের সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা ঘটিয়া গেল। সকলেই একান্ত দুঃখিত চিত্তে "হায় হায়" করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মহত্যার মহাপাতকের জন্য দারুণ আশঙ্কিত হইলেন; আজ তাঁহাদেরই নিশ্চেষ্টতার ফলে তাঁহাদের সম্মুখে ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিলেন। পুরোহিতের পবিত্র শোণিত-পাতে রাজকুমার-দ্বয়ের বিমল চরিত্রে গভীর কলঙ্ক কালিমা অঙ্কিত হইল! ব্রহ্মহত্যার মহাপাতক তাঁহাদের মস্তকে অর্পিত হইল! তখন ভ্রাতৃ-যুগল আপনাদের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া সেই ভয়াবহ কুলক্ষয়-কর কার্য্য হইতে নিরস্ত হইলেন।

যজমানের মঙ্গল-কামনায়, রাজবংশকে চিরধ্বংশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরোহিত এইরূপে আত্মশোণিত অকাতরে দান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার যে পবিত্র শোণিত-বিনিময়ে রাজকুলকে রক্ষা করিয়াছেন, আজও তাঁহার সেই পবিত্র শোণিতে তাঁহার পবিত্র নাম জ্বলদক্ষরে ইতিহাসের বক্ষে অঙ্কিত রহি-য়াছে। ইতিহাস তাঁহার পবিত্র নাম ধরিয়া পবিত্র হইয়াছে—সমগ্র হিন্দুজাতি তাঁহার জন্য পবিত্র হইয়াছে! বহু বহু বৎসর পূর্ব্বে এ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সভ্যতাভিমান-পূর্ণ এই উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গ কয়টী দেখিতে পাওয়া যায় ?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

বঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে। বৈদিক কালে যখন চারি আশ্রমের নিয়ম প্রতিপালিত হইত, তখনকার কালে তদ্‌সঙ্গে সঙ্গে অতি পরিপাটীরূপে দ্বিজগণ স্ব স্ব ধর্ম্মে শিক্ষিত হইতেন। শুদ্ধ গ্রন্থাবদ্ধ জ্ঞানে শিক্ষিত নহে; আচারে ব্যবহারে, কাজে কর্ত্তব্যে, জ্ঞানে অনুষ্ঠানে, হাতে কলমে, সর্ব্ব বিধায়ে তরিবদ প্রাপ্ত হইতেন। পূর্ব্বকালে, পুঁথীর জ্ঞান ও গুরুর উপদেশ মাত্র শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত না। যাহাকে তরিবদ বলে, যাহাকে discipline বলে, যাহাকে কাজে দক্ষতা বলে, তাহার নাম শিক্ষা। শুধু বই পড়িলে শিক্ষা হয় না, শুধু শাস্ত্রজ্ঞানে পণ্ডিত হইলে শিক্ষা হয় না। যে অর্থে ঘোটক শিক্ষিত হয়, যে অর্থে অবলাগণ শিক্ষিত হন, সেই অর্থে তখন লোকে শিক্ষিত হইত; আশ্রম-নিয়ম প্রতিপালনের জন্য শিক্ষিত হইত; কার্য্য ও অনুষ্ঠান সমুদয় সুচারুরূপে সমাধা হইবে বলিয়া শিক্ষিত হইত। শুদ্ধ বিদ্যালয়ে এ শিক্ষালাভ করা যায় না। ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত পালনে যে শিক্ষা হয়, গৃহস্থাশ্রমের সমস্ত কর্ত্তব্য সাধনে যে শিক্ষা হয়, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের সমুদয় নিয়মানুষ্ঠানে যে শিক্ষা হয়, সেই ধর্ম্ম-শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষানামের যোগ্য। সেইরূপ ধর্ম্মশিক্ষায় দ্বিজগণকে সুশিক্ষিত করা প্রাচীন হিন্দুসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য অনুসারে সমাজের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাপিত ছিল এবং সেই ব্যবস্থানুযায়ী সমাজও চলিত।

এখন ভারতে চারি আশ্রমের নিয়ম আর বিদ্যমান নাই। কিন্তু তাহার ছায়ামাত্র পড়িয়া আছে। সে রোম গিয়াছে, রোমের ভগ্নাবশেষ আছে। এই ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আমরা রোমের উদাত্ত কল্পনায় উত্থিত হই। হৃদয়ে সেই রোমের শত ঐশ্বর্য্য চিত্রিত করি। ভাবি—সেই ঐশ্বর্য্যপুরীর ভগ্ন-মন্দির, বঙ্গের চতুষ্পাটী। অরণ্যের পবিত্র আশ্রমে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যেখানে মুনি-ঋষি বসিয়াছিলেন, যে আশ্রমে শত শত ছাত্র ঋষিচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া শিক্ষা-মৃত পান করিত, যাঁহার আশ্রমের সমীপবর্ত্তী হইলে রাজরাজেন্দ্রকেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যাইতে হইত, আজি বঙ্গের চতুষ্পাটীর কুটীরে তদ্রূপ

গুরুর আলয়ে ছাত্রবেষ্টিত অধ্যাপক মহাশয় সমাজের আলোকস্বরূপ হইয়া বসিয়া আছেন। তর্কালঙ্কারের গাত্রে শাস্ত্রীয় বিদ্যা-জ্যোতিঃ ফুটিয়াছে। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মহাশয় অতি সুচারুরূপে শাস্ত্রীয় মীমাংসা করিয়া নানা দিগ্‌দেশে বিধান দিতেছেন। তাঁহার ব্যবস্থায় সংসার চলিতেছে। তাঁহার শাসনে ধর্ম্মের গতিবিধান হইতেছে। তাঁহার যশ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়াছে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ধনরাশি আসিয়া তাঁহার পুণ্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছে। এ চিত্র যদি আজিও দেখিতে চাও, সেই প্রাচীনকালের আশ্রম-ছায়া যদি আজিও প্রতীতি করিতে চাও, তবে যাও, একবার ভট্টপল্লীর পবিত্র চতুস্পাটী সমুদয় অবলোকন করিয়া আইস। আসিয়া বল, হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা-মন্দির সমুদয় কেমন পবিত্র স্থান! তাহা ইংরাজী বড় বড় সুখ-হর্ম্ম্য-অভ্যন্তরস্থ বিদ্যালয় অপেক্ষা কি সুন্দরতর নহে? সেই পবিত্র কুটীর কি পুণ্য-জ্যোতিতে আলোকিত নহে? তাহাতে যে বিদ্যার ছটা বিকীর্ণ হইতেছে, তাহাতে কি এক দেবভাব অনুভূত হয় না? যদি না হয়, তবে তুমি হিন্দু নও। মলিনতা তোমার চারি পার্শ্বে, দৃষ্টিতে তোমার পাপছবি, আর হৃদয়ে তোমার কলঙ্ক!

আবার এই পুণ্যধামের বাহিরে সংসার-আশ্রমে কিসের ছায়াপাত? বৈদিক কালে যে সূর্য্য সংসার-আশ্রম আলোকিত করিয়াছিলেন, আজি কি সে সূর্য্য একেবারে অস্তমিত? আমি তো দেখি না। সে সূর্য্য নিষ্প্রভ নহে, তাহার হেমপ্রভা আজিও বঙ্গীয় সংসারধামকে অনুরঞ্জিত করিতেছে। প্রাচীন কালে ধর্ম্মের যে লীলাময় কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, আজিও সংসারাশ্রম তদ্রূপ ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ হইয়া আছে। ধর্ম্ম তাহার সুদৃঢ় বন্ধন, স্বয়ং ঈশ্বর সেই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ত্তা। মানবকুল সংসারক্ষেত্রে ঈশ্বরের অদৃষ্ট-রজ্জুতে আবদ্ধ। সেই রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া পুত্তলীর ন্যায় লীলা করিয়া যাইতেছে। ভগবানের হাতে সংসারের ঘোর সুদর্শন-চক্র। যে চক্রের গতি কাহারও চক্ষে দৃশ্য নহে, ভগবানের নিকট তাহা সুদর্শন। যাহা ভগবানের সুদর্শন, জীবের তাহা অদৃষ্ট। যে সুদর্শন-চক্রে সংসারের সমস্ত বল—রাজবল, লোকবল, বীরত্ববল, দর্পবল, ঐশ্বর্য্যবল, বিদ্যাবল, কৌশলবল, কর্ম্মবল, শারীরবল, বিক্রমবল, সমস্ত বলই পরাভূত—সেই সমস্ত জীববলের বিধ্বংসকারী দৈববলের চক্র

সংসারপতি ত্রৈলোক্যনাথের হাতে। চিরদিন তাঁহার হাতে সেই চক্র রহিয়াছে। অযুত বলে তাহা চিরদিন ভ্রাম্যমাণ। ভ্রাম্যমাণ তাঁহার লীলাময় কর্ম্মক্ষেত্র ব্রহ্মাণ্ডে—ত্রিসংসারে—পৃথ্বীতে—ভারতে—বঙ্গে। তবে কেন বল, এ সংসার প্রাচীন কালের দেবজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ নহে? আজিও বঙ্গসমাজের কর্ত্তা সেই বিধাতা, আজিও সংসারের ধর্ম্মনেতা সেই পরম পবিত্র—সত্যং, শিবং, সুন্দরং। সমাজের শিক্ষাদাতা সেই পরাৎপর পরম গুরু মহাজ্ঞানী—মহেশ্বর।

দেখিতে চাও, এ বঙ্গের সংসারধাম ধর্ম্মের পরম শিক্ষাস্থান কি নয়? সংসার কোন্ স্রোতে নীয়মান? বঙ্গীয় সমাজ, কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে সমাজ, ধর্ম্মশিক্ষাদাতা। এ বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশিক্ষা নয়, এ বিস্তারিত কার্য্যক্ষেত্রের ধর্ম্মশিক্ষা। যে কার্য্যক্ষেত্রে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই নামিয়া সারি সারি, পার্শ্বাপার্শ্বি, হস্তপদে, অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, বঙ্গীয় জনসমাজ সেই কার্য্যক্ষেত্রের মহান্ শিক্ষামন্দির। এই মন্দির গড়িয়া গিয়াছেন—ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণ।

হিন্দুর মোক্ষপদে যাইবার তিনটি সহজ সোপান—ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এমন লোক সকল জন্মিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা এই ত্রিপথ মাত্র অবলম্বন করিয়া মুক্তির মুখ দেখিয়াছিলেন। সেই শুকদেব, সনক, সনাতন, নারদাদি মহাজনগণকে আশ্চর্য্য হইয়া আজিও আমরা কল্পনা-চক্ষে দেখি। আমরা সংসারের ধূলিতে ধূসরিত হইতেছি, তাঁহারা এ ধূলিতে পদার্পণও করেন নাই। সমুদয় প্রবৃত্তিবল—আসুরী পাশববল—প্রচণ্ড পরাক্রমশালী দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়াসক্তির ভীমবল—তাঁহারা মহা সংযমবলে অনায়াসে পরাভূত করিয়া গৃহস্থাশ্রমের মায়াময় দুঃখ ও অশান্তিপূর্ণ সংসারধাম অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। গিয়া এই সংসার মধ্যেই যে এক শান্তিময় সুখধাম আছে, সেই ধামে পরমানন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের চরিত্রশিক্ষা আমাদের চক্ষে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ততদূর বল বুঝি আমাদের নাই। তাঁহারা এক একজন বহুকাল ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মচর্য্যেই সমস্ত দেববল আহৃত করিয়াছিলেন। সেরূপ কঠিন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত এক্ষণে কোথায়? প্রতিধ্বনি বলিতেছে—কোথায়? সেই

ব্রহ্মচর্য্য—যাহাতে সমগ্র বেদ—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, দর্শন প্রভৃতি সমুদয় জ্ঞানময় শাস্ত্র পর্য্যালোচিত হইত; সেই ব্রহ্মচর্য্য—যাহাতে গুরুচরিত্রে শিষ্য-গণ সংযমীর সমস্ত সংযমফল অবাক্ হইয়া অবলোকন করিতেন, আর ভাবিতেন, এইরূপ সংযম না অভ্যাস করিতে পারিলে বুঝি কিছুতেই শান্তি নাই; সেই ব্রহ্মচর্য্য—যে ব্রহ্মচর্য্যে শিষ্যেরা যৌবনের ভয়ঙ্কর কাল সংযমপথে বিচরণ করিয়া তবে সংসারে অবতরণ করিতেন—সংসারে অবতরণ করিতেন কেবল সংযম শিক্ষা দিবার জন্য—আজি সেই ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করা বড়ই কঠিন। কঠিন আজি কেন, তখনকার দিনেও কঠিন ছিল। কয়জন শুকদেব, সনৎ-কুমার ও নারদ তখন জন্মিয়াছিলেন? সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া দার-পরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া প্রায় সকলকেই যাইতে হইয়া-ছিল। তথাপি চিরকুমারগণের চরিত্রে সংযম ও নিবৃত্তি শিক্ষা আমরা আজিও লাভ করিতেছি। তাঁহারা আমাদের চক্ষে, মানবের কতদূর ধর্ম্মবল সম্ভব, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই ধর্ম্মবলের আদর্শস্বরূপ তাঁহারা আমাদের কল্পনায় আজিও জীবিত রহিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিনটিই মোক্ষসাধক প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই ঐ ধর্ম্মত্রয়ে অধিকার ছিল। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, সমুদয় বর্ণের পক্ষে বিহিত। গার্হস্থ্য ধর্ম্মই প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র—ব্রাহ্মণের কর্ম্মক্ষেত্র, ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মক্ষেত্র, বৈশ্যের কর্ম্মক্ষেত্র, শূদ্র এবং সমুদয় শঙ্কর জাতিরও কর্ম্মক্ষেত্র। এ কর্ম্মক্ষেত্র ব্রহ্মচর্য্যের ঋষির আশ্রম নহে, বান-প্রস্থাবলম্বীর আরণ্যাশ্রম নহে, সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যাশ্রম নহে। এ কর্ম্মক্ষেত্র মায়াময় সংসার। প্রধান মায়া—তোমার কলত্র; দ্বিতীয় মায়া—তোমার সন্তান সন্ততিগণ। ব্রহ্মচারী সংসারে আসিয়া ঘোর মায়ায় আবদ্ধ। একদিকে স্নেহ তাহাকে পুত্র-কলত্রদিকে টানিতেছে, অন্য দিকে ভক্তি তাহাকে পিতা মাতার প্রতি টানিতেছে। একদিকে যৌবনোদৃপ্ত সমস্ত ভোগ-লালসা তাহাকে পাপপথে লইয়া যাইতে চাহে—অন্যদিকে সদ্বুদ্ধি ও শান্তিলালসা তাহাকে পুণ্যপথে আনিতে চাহে। সংসারের এই মহাসন্ধিস্থলে সবাই অবস্থিত। এই কর্ম্মক্ষেত্রের ঘোর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সবাই লিপ্ত। এই ঘোর যুদ্ধে কে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে? ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের

জন্য ব্যাস বেদ, দর্শন, উপনিষৎ, সকলই রাখিলেন; কিন্তু সংসারীর জন্য কোন্ বিদ্যা আবশ্যক, তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়া ব্যাস এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। সে শাস্ত্র ভক্তি-বিদ্যা। সেই ভক্তি-বিদ্যায় কুরুক্ষেত্রের জয় ঘোষিত হইল—দশ-ইন্দ্রিয়-প্রমুখ পাপ রাবণের উপর মহাভক্তগণের জয় সংগীত হইল। তাহার সমুদয় তত্ত্বজ্ঞান ভগবদ্গীতায় নিহিত হইল।

যৌবনের লালসা ও আসক্তি সকল এমনই প্রবল যে, তাহারা প্রমত্ত বারণ বা অসুরের ন্যায় দুর্দ্দান্ত। তাহাদের বলবীর্য্য পাশব বলেরও সমধিক। তাহাদের বৃদ্ধি রক্তবীজের ন্যায় অনিবার্য্য। সে বৃদ্ধি ও সে বল কিসে প্রশমিত হয়? হৃদয়ের সমস্ত পারমার্থিক শক্তি ভক্তিমতী হইলে যে দেববলের উপচয় সম্ভবে, সেই দেববল নাহিলে প্রকৃষ্ট সংযম সাধ্য নহে। সেই দেববলের শক্তি—যে দেববল রিপুকুলের উপর জয় লাভ করিবে—সেই দেববলের শক্তি সমস্ত পুরাণে অসংখ্য দেব দেবীর সৃষ্টিকাণ্ডে প্রদর্শিত হইল। বিষ্ণু নিজেই কর্ম্মী হইয়া সমুদয় রিপুকুলের ধ্বংস সাধন করিলেন। পুরাণে যে কালভয়ঙ্করী শক্তি, তমোবিনাশিনী কালী—দ্বারকায় ও মথুরায় সেই তমোবিনাশন নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। যে বৈষ্ণবী শক্তি শ্যামা, সেই শক্তিই শ্যাম*। রিপুকুলের সহিত যুদ্ধ ও জয় লাভ করিবার জন্য এ সংসারে পারমার্থ-শক্তি যে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহারই অনুরূপ চিত্র—কালরূপ। সেই কালরূপে দেবশক্তি চতুর্হস্ত-শালিনী, অসি ও নৃমুণ্ডধারিণী, অভয় ও বরদায়িনী কালী—সেই ঘোর ভয়ঙ্কর-রূপে তিনি শত্রুনিসূদন মধুসূদন শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ।

কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণের আবার মনোহর বনমালাধারী শ্যামরূপও আছে। সেরূপে তিনি শ্যামসুন্দর সাজিয়া ভক্তগণকে শান্তির বংশীধ্বনিতে অতি মধুর রবে আহ্বান করিতেছেন। আহ্বান করিতেছেন কোথায়? বৃন্দাবনধামে। যখন তোমার মন বৈরাগ্যে উপনীত হইবে, যখন সংসার হইতে তোমার চিত্ত পরিব্রাজিত হইয়া ব্রজভাবে ব্রজপুরে আসিবে, যখন তুমি শুদ্ধ দেবভক্তিতে জীবন উৎসর্গ করিবে, যখন সকল কার্য্য ও সকল অনুষ্ঠান দেবতায় উৎসর্গ

* শাক্ত ও বৈষ্ণবী শক্তির উপাসকে সামান্য প্রভেদ। প্রভেদ না থাকাই উচিত। গোপাঙ্গনাগণ কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

করিবে, যখন তোমার মন ভক্তিরসে কেবল দেবসম্ভোগে সুখী হইবে, তখন তুমি সেই বৃন্দাবনধামের শান্তিরব মধুর বেণুনিক্কণের স্বরে শুনিতে পাইবে। তখন দেখিতে পাইবে—এই সংসাররূপ কদম্বতলে যমভগিনী যমুনারূপা মহাকালের স্রোতস্বিনী-তীরে কেবল শ্যামসুন্দর বিরাজিত। তখন দেখিতে পাইবে—প্রকৃতি-শক্তি, শান্তি ও প্রেমরূপা উমা—পবিত্র শ্বেতগাত্র, পরম যোগীর শিবনেত্রসম্পন্ন সংসারের বিষময় সর্পজয়ী পরম ভোলানাথ মহেশ্বরের অঙ্কে পরিস্থাপিত—অথবা উদাসীন পুরুষ, প্রকৃতিদেবী অন্নদার নিকট অন্ন লইয়া জগৎ পরিতুষ্ট করিতে-ছেন। অনন্তনাগ-বেষ্টিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের শয্যায় সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু শায়িত—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যসম্পন্না প্রকৃতিস্বরূপা লক্ষ্মী তাঁহার পদ সেবায় নিরতা। ভগবতী শিবশঙ্করকে মস্তকে করিয়া লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, কার্ত্তিকেয় ও গণেশের সঙ্গে দেখাইতেছেন—তিনি পাপ মহিষাসুর বধ করিয়া বিজয়িনী। সুরথ রাজের ধ্যানজ দেববলের প্রতিমা—শঙ্খ-চক্র-তীর-ধনু-ধারিণী জগদ্ধাত্রী—সিংহবল পশুপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা। রাসে মানস বৃন্দাবন কুসুমিত, সমুদয় হৃদ্‌বৃত্তিরূপা গোপিকাগণ কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধা। দোলে দেবানুরাগে সমস্তই আরক্ত। শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত কুরুক্ষেত্রজয়ী যুধিষ্ঠির হিমালয়ে জীবন্মুক্ত, রাবণবিজয়ী রামচন্দ্র সরযূতীরে সশরীরে লীন। সীতাদেবী শুদ্ধ জগৎস্বামীর পানে এক নেত্রে তাকাইয়া ভক্তিরূপিণী সশরীরে অদৃশ্য ও মুক্ত।

এই সমস্ত দেবাদর্শের পথ সৃষ্টি করিয়া ব্যাস পুরাণাদিতে তাহাদের প্রখ্যাপন করিয়াছেন। সেই দেবতাদের ধ্যান, ধারণা, ভাবনা ও সাধনার পথ পূজাদিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই পথই ব্যাসের অনুমত ভক্তিপথ। নারদ বলিতেছেন,—

পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ।

বেদব্যাসের মতে ভগবৎ পূজাদিতে অনুরাগই ভক্তিপথ। এই সাধন-পথ অবলম্বন করিলে লোকসমাজ দেবাদর্শের ভাবনায় ক্রমে দেবোপম হইতে পারিবে। কিন্তু এই সাধনার পথ অত্যন্ত প্রশস্ত—এ সাধনা বহু অঙ্গ-সম্পন্ন। এই সাধনার বিস্তৃত পথে শুদ্ধ প্রতি হিন্দুর নয়—সমগ্র সমাজের ধর্ম্মশিক্ষা হয়—শিক্ষা অনুষ্ঠানে, কার্য্যে এবং প্রবৃত্তিতে। সমস্ত সমাজ ব্যাপিয়া সেই পূজাপদ্ধতি এইজন্য বিস্তৃত রহিয়াছে। এক এক তিথিতে, এক এক

মাসে, এক এক বারে, এক এক যোগে—পূজা, পার্ব্বণ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, বার ও ব্রত। রোগে, শোকে, ঐশ্বর্য্যে, শ্রমে, আলস্যে, দুঃখে, সুখে, প্রতি কার্য্যের প্রারম্ভে, মধ্যে ও অন্তে, সর্ব্ব সময়ে হিন্দু ও হিন্দুসমাজের সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মের শিক্ষা। ইচ্ছা না করিলেও হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা করিতেছে—আশৈশব হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা করিতেছে। হিন্দুকে ধর্ম্মশিক্ষা দেয় তাহার সমাজ এবং তাহার গৃহধাম। হিন্দুর গৃহধাম দেবাধিকারে পরিপূর্ণ। তাহার চারিদিকে দেবতা। সেই দেবমণ্ডলী-মাঝে হিন্দু আশৈশব পরিবর্দ্ধিত। হিন্দুর পরিবারমণ্ডলে কেবলই দেবার্চ্চনার অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানাদিতে হিন্দু আশৈশব অভ্যস্ত। ব্যাস, হিন্দু-পরিবারমণ্ডলকে এইরূপে গড়িয়া দিয়াছেন। শুধু পরিবারমণ্ডল নয়, হিন্দুসমাজও সেই পূজার ব্যাপারে পরিপূর্ণ। বারব্রত এক গৃহে নহে, সমাজের অনেক গৃহে। পূজা এক বাড়ীতে হইলে, গ্রামশুদ্ধ লোক সেই পূজায় মত্ত। যোগে এক ব্যক্তি পুণ্যপরায়ণ নয়, সমস্ত সমাজ পুণ্যপরায়ণ ও পুণ্যানুষ্ঠানে ব্রতী। শ্রাদ্ধে, তর্পণে, যাগে, যজ্ঞে, সমস্ত সমাজ অনুলিপ্ত। হিন্দু যে স্থানে থাকে, তাহার চারি পার্শ্ব হইতে পূজা এবং আনুষ্ঠানিক ভক্তিক্রিয়াকলাপের বায়ু অনবরত বহিতেছে। সেই বায়ু হিন্দুর নিশ্বাস প্রশ্বাস— হিন্দুর প্রাণ। সুতরাং হিন্দুর গৃহে, হিন্দুর সমাজে, হিন্দুকে হিন্দু হইয়া যাইতেই হইবে। হিন্দু-বঙ্গসমাজের এইরূপ কৌশল, ব্যাস-প্রতিষ্ঠিত ভক্তিরাজ্য। বঙ্গীয় সমাজ ব্যাসের সৃষ্টি-কৌশলের পরিচায়ক। সংসারধামে পূজাদির প্রচার করিয়া ব্যাস এক অমোঘ ধর্ম্মশিক্ষার পথ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুসমাজই ধর্ম্মশিক্ষার প্রশস্ত মন্দির।

সংসারে ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সংসার ব্রহ্মচর্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ব্রহ্মচর্য্যব্রতে তাঁহার কেবল ভক্তিরই স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল,—ভক্তি পিতামাতার প্রতি—ভক্তি গুরুর প্রতি—ভক্তি ঈশ্বরে। সংসারে যখন যৌবনের বিষমকালে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার আন্তরিক সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত লালসা এবং সমস্ত রিপু অতি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছে। মায়াময়ী জায়া, মায়াময় স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যাগণ তাঁহার হৃদয়াধিকার করিয়াছে। এখন ব্রাহ্মণ আর ব্রহ্মচর্য্যের ব্রাহ্মণ নাই। সংসার বড় বিষম স্থল। যে ঈশ্বর-ভক্তির বীজ ব্রহ্মচর্য্যে উপ্ত হইয়াছিল, সেই অঙ্কুরোৎপন্ন বৃক্ষকে ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ না করিতে

পারিলে, এখানে নিস্তার নাই। সাধনা-বারিতে তাহা পরিপুষ্ট করিতে হইবে। সে সাধনার পথ ব্যাস দেখাইয়া দিয়াছেন। সংসারের প্রতিমা-পূজাপদ্ধতি, সেই সাধনার প্রথম সোপান। মায়াময় সংসারে থাকিয়া, জায়া পুত্রকে স্নেহ করিয়া, জনক জননী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তিকে প্রবল রাখিতে পারিলে, তবে ভক্তি দেবত্বে আসিবে। দেবভক্তিকে শিরে ধরিয়া—যেমন নর্ত্তক শিরে কলস্ রাখিয়া নর্ত্তনের সমস্ত কৌশল দেখায়—তেমনই করিয়া সংসারের সমুদয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে, অথচ দেবভক্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইবে। দেবভক্তি আপনি হৃদয়ে ধারণ করিলে হইবে না; পুত্রপরিবারগণকে তাহার শিক্ষা দিতে হইবে। শুদ্ধ পুত্র পরিবার-গণকে নয়, সমস্ত সংসারকে—শিষ্যকে, যজমানকে, প্রতিবাসীকে, কুটুম্বকে, আত্মীয় স্বজনকে, গ্রামবাসীকে তাহা শিখাইতে হইবে। সকলকে ভাল না করিতে পারিলে, আপনার কুশল নাই। সেই সর্ব্বজন-সাধনোপায় ভক্তিপথ, কেবল পূজাপদ্ধতির বিরাট ব্যাপার। তদ্দ্বারা স্ত্রীপুত্রগণ, আবালবৃদ্ধবনিতা, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, ঘোর বিষয়ী, কৃষক, ভদ্রাভদ্র, যুবকযুবতী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বীর, ব্যবসায়ী, দাস, দাসী, সকলকে এক নিগড়ে বদ্ধ করিতে হইবে। এক নিগড়ে বাঁধিয়া তাহাদিগকে শান্তিপথে আনিতে হইবে। নহিলে সংসারের মঙ্গল নাই। সমস্ত সমাজ লইয়া আপনি। আপনি সমাজের অংশ মাত্র। সমাজেই বিশ্ব জগৎ। জগতেই ঈশ্বর বিদ্যমান। সমাজ ঈশ্বর-নিয়মিত। সেই সমাজকে নিয়মিত করাই ঈশ্বরের কার্য্য। সেই সমাজকে সৎপথে পরিচালন করা ব্রাহ্মণের কার্য্য। কারণ ব্রাহ্মণ বেদের অধিকারী, জ্ঞানের অধিকারী। সূক্ষ্ম জ্ঞান, মনুষ্যসমাজে স্থূলরূপেই কেবল গ্রহণীয়। স্থূলরূপে তাহা ভক্তির সাধক হওয়া চাই। ভক্তিপথ প্রসারিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণের কার্য্য নানাবিধ হইল।

ভক্তির সাধনপথে ব্রাহ্মণের কার্য্য প্রধানতঃ যজন, যাজন ও অধ্যাপনায় বিভক্ত। ব্রাহ্মণ শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর কার্য্য বড় গুরুতর। শিষ্যগণের অধিকার বুঝিয়া তাহাদিগকে দীক্ষা দিতে হইবে। সেই অধিকার অনুসারে সমাজকে চালাইতে হইবে। জ্ঞানীগণ এজন্য দীক্ষাকার্য্য গ্রহণ করিলেন। শিক্ষাগুরুর কার্য্য কিছু বিস্তারিত। তাঁহাকে অনেক রকমে

শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিতে হইবে। শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া তাঁহার প্রধান কার্য্য। সেই জ্ঞান, শাস্ত্রাধ্যাপনে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রচারিত করা চাই। জ্ঞানীগণ শাস্ত্র অধ্যাপনায় রত রহিলেন। আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কেবল আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য্য পৌরহিত্য। তাঁহারা সমাজ ও গৃহ-পুররক্ষক। পুরোহিত, সংসারে যে জাল বিস্তার করিবেন, গুরুর হাতে তাহার রজ্জু। গুরু যে মন্ত্রে দীক্ষা দিবেন, পুরোহিত সেই মন্ত্রের সমস্ত সাধনপথ প্রদর্শন করিয়া যাইবেন। শুদ্ধ প্রদর্শন করিবেন না, সেই সাধনপথে যজমানগণকে পরিচালন করিয়া তাহাদিগের পারমার্থিক মঙ্গলবিধান করিবেন। গুরু পুরোহিত একত্রে সকল পারমার্থিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন—থাকিয়া দেখিবেন, শিষ্য-যজমানের কতদূর উন্নতিসাধন হইতেছে। সেই উন্নতি অনুসারে গুরু দীক্ষা নিয়মিত করিবেন। পুরোহিত সেই দীক্ষানুসারে যজমানকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবেন। ঘোর বিষয়ীকে ক্রমে ক্রমে ভক্তিপথে উন্নত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাগণেরও ভক্তিপথ ঈষৎ খুলিয়া দেওয়া চাই। গুরু পুরোহিত কৌলিক না হইলে এ কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া বড় কঠিন। এজন্য হিন্দুসমাজে কুলগুরুর আবশ্যক। শুদ্ধ গুরুর আবশ্যকতা নহে, সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতকেও চাই। পুরোহিত সমস্ত অনুষ্ঠানের নেতা ও বিধাতা। পুরোহিতকে সর্ব্বদা আবশ্যক। তাঁহার কার্য্য প্রতি দিন, প্রতি মাসে, প্রতি পুণ্য তিথিতে, প্রতি ঋতুতে, প্রতি বৎসরে—সদা ও সর্ব্বক্ষণ। পুরোহিত নহিলে সংসার চলে না। বনে যাইবার সময়ও পাণ্ডবগণের পুরোহিত আবশ্যক হইয়াছিল।

সংসার আশ্রমে ধর্ম্মপথের প্রধান শিক্ষক পুরোহিত ঠাকুর। গৃহীর প্রবৃত্তি অনুসারে তিনি তাহাকে গড়িয়া আনেন—ক্রমে ক্রমে গড়িয়া আনেন। যে ঘোর বিষয়ী, আমোদ প্রমোদের সহিত সামিষ নৈবেদ্যাদি ও বলিদান দ্বারা রাজসী পূজা চায়, তাহাকে সেই পূজায় নিরত রাখিয়া, ক্রমে ক্রমে তাহার প্রবৃত্তিপথ পরিমার্জ্জিত করিয়া আনাই তাঁহার কার্য্য। সেই রাজসী পূজায়ও বিষয়ী, সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানে নিরত হইয়া সকলই দেবতাকে উৎসর্গ করিতে শেখেন। শেখেন—দেবতাকে নির্ম্মম হইয়া উৎসর্গ করিতে হইবে। যাহা যাহা উৎসর্গ করিবে, তাহা দেবাধিকার, তাহা দেবতার দ্রব্য। দেবতাকে দান করিলে

তাহা আর গ্রহণ করিবার যো নাই। দেবতাকে দিয়া, তাহা গ্রহণ করিলে ঘোর পাপ। লোভী হইয়া, আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া কোন দ্রব্য দেবতাকে দিতে নাই। পুনঃ গ্রহণের জন্য দেবোৎসর্গ নিষিদ্ধ। এ বড় শক্ত কথা। এই উৎসর্গ ব্যাপারে যজমান বলির দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে শেখেন। তিনি প্রথমে প্রথমে হয় তো বলি ও উৎসর্গ দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা রাখিতেন এবং দেবপ্রসাদী বলিয়া তাহা গ্রহণও করিতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে আকাঙ্ক্ষাও পরিবর্জ্জন করিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হন*। এই উৎসর্গানুষ্ঠানে তাঁহার প্রথম শিক্ষা—তাঁহার প্রধান শিক্ষা। যে পুরোহিত এ শিক্ষা দিতে না জানেন, তিনি পুরোহিতের কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি দেবতাকে দিব, দেবতা তাহা গ্রহণ করিবেন, এ বড় পরিতোষের বিষয়। বিষয়ী সেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আরও পূজানুষ্ঠানে অগ্রসর হন। যাঁহার দ্রব্য লইয়া সমস্ত সম্ভোগ করিতেছি, তাঁহার উদ্দেশে কিছু উৎসর্গ না করিলে ভক্তিবৃত্তি পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়ীর ভক্তি সতত তাহাকে সেই পথে আনিতে চায়। বিষয়ী সেইজন্য পুরোহিতকে সর্ব্বদা নিকটে চান। তাঁহার ভক্তি পুরোহিতকে সর্ব্বদা ডাকিয়া আনে। স্ত্রীজাতির ভক্তি কিছু অধিকতর প্রবলা। সেইজন্য হিন্দুসংসারে বারব্রতের অনুষ্ঠান নিয়তই চলিতেছে। পুরোহিত ঠাকুর, সংসারকে ক্রমে দেবসংসার করিয়া তুলিতে চান। কোন্ কোন্ তিথি নক্ষত্রের ফল পুণ্যপ্রদ, তাহা পরিবারমণ্ডলে উপদেশ দেন। সেই পুণ্য তিথি নক্ষত্রে ভক্তির পূজার আয়োজন হইবে। পূজার আয়োজন হইলে তাহাতে গৃহের সকলেই মত্ত হইবে—গৃহিণী, গৃহস্বামী, বালকবালিকারা, দাসদাসীগণ পর্য্যন্ত মাতিয়া যাইবে। যিনি উৎসর্গ ও দান করিবেন, তাঁহার তো ফল আছেই; তৎসঙ্গে সমুদয় পরিবারমণ্ডলের ফল। সমুদয় পরিবার কেন, প্রতিবাসিগণেরও ফল আছে—তাঁহারা সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আইসেন—ক্ষণিক সংসার ভুলিয়া গিয়া পূজাতে মাতিতে আইসেন।

পুরোহিত ঠাকুর, বিষয়ীর প্রবৃত্তি অনুসারে তাহাকে গড়িয়া আনেন।

* এই পূজাপদ্ধতিই রাজসী পূজা। মন্ত্রাদি ব্যতিরেকে কিরাতাদি কর্ত্তৃক যে পূজা, তাহাই তামসী পূজা। এই তামসী পূজার ফলে বাল্মীকি ক্রমে পরম ভক্ত হইয়াছিলেন।

যে বিষয়ী ঘোর পাপপথে প্রবৃত্ত—যে ধর্ম্মের কোন বন্ধন মানিতে চায় না—চার্ব্বাক বলিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, তাহাকে তুমি কোন মতেই বাঁধিতে পারিবে না। যেমন আবদ্ধ ঘোটক সহসা বন্ধনমুক্ত হইলে, তাহার সমস্ত তেজে দৌড়িয়া বেড়ায়—শেষে পরিশ্রান্ত হইয়া আপনি থামিয়া যায়, তদ্রূপ ঘোর নারকী, পাপপথে যৌবনের উন্মত্ততায় যখনই নরকের দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে, তখন কাহার সাধ্য তাহাকে ধরিয়া রাখে? সে নিজে দেখিবে, পাপপথের কণ্টকে তাহার গাত্র ছড়িয়া গিয়াছে, গাত্রময় রক্তারক্তি, আসিয়া পড়িয়াছে ঘোর পঙ্কিল হ্রদে। সেই হ্রদ হইতে উঠিবার জন্য সে আপনিই চেষ্টা করিবে। চেষ্টা করিবে কাহার সাহায্যে? তখন পুরোহিত ঠাকুর আস্তে আস্তে অগ্রসর হন। যে বারব্রতে গৃহিণীকে নিরতা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বারব্রতের কথায় গৃহস্বামীকেও ক্রমে নিরত করেন—বারব্রত জাঁকিয়া উঠে। দান ও উৎসর্গ দ্রব্য বাড়িতে থাকে। পূজার অনুষ্ঠান বাড়িতে থাকে। ক্রমে যজমান পথে আইসে। তখন পুরোহিত আরও জোর করিতে থাকেন। পূজার আয়োজন বিস্তারিত করিয়া লন। সাধককে গড়িয়া আনিতে অগ্রসর হন। ক্রমে ক্রমে দেবপূজার অনুষ্ঠানাদি চলিতে থাকে। হিন্দু-সাধক, শৈশব হইতে যে পথে অগ্রসর হইয়া কিছুদিন থামিয়াছিলেন মাত্র, তাহাতে আসিয়া আবার যোগ দিয়া আরও অগ্রসর হইতে থাকেন।

হিন্দু-যজমান যখন পাপপথে প্রবৃত্ত, তখনও তাহার পূজাপদ্ধতি একেবারে বন্ধ হয় নাই। তাহার শ্রাদ্ধ-তর্পণ—কৌলিক পূজাপদ্ধতি চলিতেছে। পুরোহিতের হিতব্রত কখন থামে না। পুরোহিত কেবল অবসর দেখিতেছেন, কখন যজমান সম্যক্‌রূপে ভক্তিপথে ঘুরিয়া আসিবে। পুরোহিত নিত্য আসিয়া পূজা করিয়া যান, সময়ে সময়ে বারব্রতের আয়োজন করেন, পূজার সময় বাড়ীতে ও পরিবারমণ্ডলে পৈতৃক পূজার বিরাট বিকাশ করেন। যজমানকে কিয়ৎ পরিমাণে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে কাজে কাজে যোগ দিতে হয়। কিছুকালের জন্য ভক্তিপথে আসিয়া তিনি হৃদয়ের আনন্দ লাভ করেন। প্রবৃত্তি ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া যায়।

হিন্দু-সংসারে ধর্ম্মের এইরূপ শিক্ষাপথ বিস্তারিত আছে। গৃহীলোকেরা আশৈশব এই পথের পথিক। সংসারে প্রবৃত্তিপথে ভক্তি আরব্ধ হইয়া ক্রমে

নিবৃত্তিপথে আইসে। তামসিক পূজায় যে ভক্তি নিষ্ঠাকার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে সাত্ত্বিক পথে উঠিতে থাকে। ভদ্রসমাজের রাজসিক ভক্তি ক্রমে সাত্ত্বিক হইয়া পরাভক্তিতে উপনীত হয়। হিন্দু আশৈশব যেরূপ ভক্তিপথে শিক্ষিত, তাহাতে তাহার সাধনাপথ অনেকাংশে অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই স্থলে হিন্দুজাতির সহিত অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতির ভিন্নতা লক্ষিত হয়।

হিন্দু প্রবৃত্তিপথে প্রথমে সকাম উপাসক বটে; কিন্তু হিন্দু সকাম-উপাসক, আর অপর ধর্ম্মীয় সকাম-উপাসকে অনেক প্রভেদ। ইউরোপীয় জনসমাজের পার্থিবকতার সহিত হিন্দু-জনসমাজের পার্থিবকতার তুলনাই হয় না। খৃষ্টীয় জনসমাজ ঘোর স্বার্থপর ও পৃথ্বীধূলায় ধূসরিত। পার্থিব ইষ্ট তাহার সর্ব্বস্ব। পার্থিব মঙ্গল-বিধানার্থ ইউরোপীয়গণ যত ব্যস্ত, অন্য জাতি বুঝি তত নহে। তাহারা তজ্জন্য পৃথিবী তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। হা অর্থ যো অর্থ, হা সুখ যো সুখ করিয়া পৃথিবীর চারিদিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। ইউরোপীয় সমাজ এইরূপ পার্থিবসুখে নিমজ্জিত। হিন্দুসমাজ বোধ হয় ততদূর পার্থিবসুখে নিরত নয়। সে সমাজের পারমার্থিকতা কিছু অধিক। তাহা মূলেই যে পারমার্থিক স্তরে দণ্ডায়মান, সে স্তরে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী জনসমাজকে উঠিতে অনেক সাধনার প্রয়োজন। হিন্দুসমাজ আমূলে অনেক উন্নত পারমার্থিক ভাবে গঠিত। হিন্দুজাতি শৈশব হইতে দেবদেবতায় আসক্ত। তাহারা যতদূর দেব-প্রাণগত, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী জাতি ততদূর নহে। দৈববলে হিন্দুজাতির সমস্ত নির্ভর। হিন্দুজাতি সেই পারমার্থিক স্তরে দাঁড়াইয়া সকাম। খৃষ্টীয় জাতি যে ভাবে সকাম, হিন্দুজাতি তদপেক্ষা অনেক উন্নত সকাম। তাহার সকামপূজা দেবোৎসর্গে ক্রমে উন্নত হইয়া আইসে। বেদে যে কিয়দংশে সকামের দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, সে সকামে আমরা হিন্দু-ভক্তির নিষ্ঠা, দেবতায় ঐকান্তিকতা ও আত্ম-সমর্পণ স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাই। তদ্রূপ সকামের ছায়া হিন্দু-প্রবৃত্তিপথের উপাসকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে সকাম নিষ্কামোন্মুখী; নিষ্কাম হইতে তাহার সামান্য প্রভেদ। খৃষ্টীয় উপাসকের সকাম ভাবের তুল্য হিন্দুর সকামভাব নিন্দনীয় নহে। তবে যাঁহারা তত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা বোধ হয় ইউরোপীয় সকামকে সম্মুখে রাখিয়া হিন্দু-সকামকে একেবারে অবস্তলে দেন।

হিন্দুর সকাম কতদূর উন্নত, ধ্রুবচরিত্রে তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। ধ্রুবের জননী নিতান্ত অন্তর্ব্বেদনায় ধ্রুবকে রাজপদ অপেক্ষাও যে উচ্চপদ পাইবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছিলেন, সেই পদলাভ করিবার জন্য—যে পদে উঠিলে রাজমুকুটও অবনত হয়—যে পদের গৌরবে রাজসিংহাসনও নিষ্প্রভ—সেই দেবপদ লাভের জন্য ধ্রুব, উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই সেই তপস্যা সকাম বটে, কিন্তু সে সকাম তপস্যা নিষ্কামকেও বোধ হয় পরাজিত করিয়াছিল। সকল নিষ্কামের মূলে এই সকাম বর্ত্তমান। এই সকাম ধ্রুব-জননীর প্রবৃত্তি—প্রকৃত ভক্তিদেবীর প্রবৃত্তি। নিষ্কাম হইতে যাইব যে জন্য, সেই জন্য এই সকাম। এই সকাম দেবত্বে উপনীত, শুদ্ধ দেবত্ব নয়, দেবত্বের ধ্রুবত্বে উপনীত। প্রবৃত্তি-পথিকের জন্য এই উচ্চ আদর্শ। ঘোর বিষয়ীর জন্য এই আদর্শ। এই আদর্শ কেবল হিন্দু রাজরাণীর সমক্ষে বিদ্যমান। এই আদর্শের মোহে মানুষ রাজসিংহাসনও পদদলিত করিয়া দেবত্বে উঠিয়া যায়। প্রহ্লাদও রাজসিংহাসন পদদলিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে এবং নিষ্কাম ধর্ম্মে যে পদে উপনীত হইয়াছিলেন—যে ঐকান্তিকতায়, যে সমদর্শিতায়, যে তন্ময়তায় আসিয়াছিলেন, ধ্রুবও সেই দেবত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রভেদ এই,—প্রহ্লাদের আদর্শে ভক্তির পরাকাষ্ঠা, হৃদয়ের উচ্চতা, রসের প্রগাঢ়তা; ধ্রুবের আদর্শে সংযম, কাঠিন্য ও তপের উগ্রতা। একজন ভক্তিরসে সুন্দর, অন্যজন তপঃপ্রভাবে সুন্দর। ধ্রুব দেবতা, প্রহ্লাদ মুক্ত। প্রহ্লাদে সকাম ভাবের নিদর্শন নাই, ধ্রুবের সকাম দেবত্বে উঠিয়া নিষ্কামে পরিণত হইলে প্রহ্লাদের নির্ব্বাণ-মুক্তিতে উপনীত করে। ধ্রুবকে ধরিয়া সংসারী সংসারের কঠিন পথ দিয়া যাইতে শেখেন; প্রহ্লাদকে ধরিয়া সংসারী, ভক্তিরসে সকলকে গলাইয়া গিয়া বিঘ্ন-বিপত্তির মাঝে কেবল অচ্যুতকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সে সমস্ত বিঘ্ন বিনাশপূর্ব্বক সংসারপথেই বিষয় ভোগের শেষে জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারেন। গৃহীর কাছে দুইজনেই শিক্ষক। কিন্তু ধ্রুব শুদ্ধ শিক্ষক নহে, প্রবৃত্তি-পথিকের নিকটস্থ আত্মীয়স্বজনও বটে। যাঁহার ভক্তি অত্যন্ত প্রবলা, তিনি প্রহ্লাদকে লইবেন; আর যাহার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা, তিনি ধ্রুবকে লইবেন। উভয়ই পৌরাণিক সৃষ্টি—পুরাণের আদর্শ-তত্ত্ব।

পুরাণ সমস্ত এইরূপ আদর্শচরিতে পরিপূর্ণ। তাহাতে যেমন দেবদেবীর

সৃষ্টি আছে; তেমনই অনেক আদর্শ ভক্ত-চরিত্রের বর্ণনা আছে। পুরাণের একদিকে দেবদেবীর সৃষ্টি, অন্যদিকে দেব-সাধকগণের সৃষ্টি। সেবকগণের সাধন-পথ ঘটনা-পরম্পরায় পরিপূর্ণ। এই ঘটনা-পরম্পরায় ভক্তির বিকাশ প্রদর্শন করিবার জন্য নানা অদ্ভুত কল্পনা পুরাণে সন্নিবেশিত। এই সমস্ত আদর্শ-চরিত হিন্দুর কল্পনায় সতত বিরাজিত। কাহারও অলৌকিক দয়া, কাহারও প্রেম, কাহারও ভক্তি, কাহারও নিষ্ঠা, কাহারও শ্রদ্ধা, কাহারও পিতৃভক্তি, কাহারও মাতৃভক্তি—মানবের যত দেবভাব, যত উচ্চভাব—সেই উচ্চভাবে তাহারা ধর্ম্মবীর। এই ধর্ম্মবীরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য যত ঘটনার সৃষ্টি। এই সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপারে এক এক ধর্ম্মবীরের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই সমস্ত চিত্র হিন্দুগৃহীকে সততই পুণ্যপথে উত্তেজন করিতেছে—কল্পনায় জাগরূক থাকিয়া হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। হিন্দুগৃহে শুদ্ধ দেবদেবীর পূজা নহে, এই সমস্ত চরিতেরও পূজা হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে, যাত্রায়, ভজনে, কথকের কথকতায়, ছবিতে, পুরাণপাঠে এবং পিতামহীর রূপকথায় তাহাদের গুণব্যাখ্যা সততই চলিতেছে। হিন্দুগৃহীগণ অন্নপানের মত এই সমস্ত কথা প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছেন—সাংসারিক আমোদপ্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের স্মরণপথে তাহারা অহরহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সে সমস্ত চরিত ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া হিন্দুগৃহীকে গড়িয়া আনিতেছে।

পুরাণের আদর্শচরিত সমস্ত মানবকে দেবত্বে আনিবার জন্য অহরহ তাহার কল্পনাকে অধিকার করিয়া আছে। বাল্মীকির রামায়ণ সমস্ত হিন্দুগৃহে অধীত হইতেছে; অধীত হইয়া ভক্তির কি জাজ্বল্যমান চিত্র সকল মানসচক্ষে অঙ্কিত করিতেছে। সে চিত্র সমুদয় কোন হিন্দু কখন ভুলিতে পারেন না। সে সমুদয় চিত্র সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সমভাবে নবীন ও সতেজ রহিয়াছে। হিন্দুগৃহীকে ভক্তি শিক্ষা দিতেছে। হিন্দুর গৃহে সীতাদেবীকে গড়িতেছে, লক্ষ্মণের সমান সহোদরকে গড়িতেছে, হনুমান ও বিভীষণের সমান ভক্তকে গড়িতেছে। বেদব্যাস, শুকদেব, নারদ, শাণ্ডিল্য, গর্গাচার্য্য, উদ্ধব, বলি প্রভৃতি সমস্ত ভক্তির আচার্য্যগণ হিন্দুর সংসারক্ষেত্রে যেন জীবিত চরিত্ররূপে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া ভক্তিশিক্ষা দিতেছেন। ভক্তিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযম শিক্ষা দিয়া সংসারীকে পুণ্যপথে আনিতেছেন।

হিন্দুসমাজ নিয়ত ভক্তি-গীতে প্রতিশব্দিত হইতেছে। কোথাও দেবলীলা সংগীত হইতেছে, কোথাও পৌরাণিক আদর্শ-চরিত সংকীর্ত্তিত হইতেছে। বঙ্গসমাজে ব্যাস ও বাল্মীকি, পুরাণ হস্তে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কীর্ত্তনে শুক ও জয়দেব গাইতেছেন, যাত্রায় পৌরাণিক বীরগণ বঙ্গসমাজের সমক্ষে ভক্তির অভিনয় করিয়া দেবসঙ্গীতে দেশকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। বাঙ্গালার কথকতায় দেশশুদ্ধ লোক মোহিত হইয়া আছে।

বঙ্গসমাজে একদিকে পূজার ধূমধাম, অন্যদিকে পৌরাণিক আদর্শচরিতের গুণকীর্ত্তন। এইরূপে সমস্ত পুরাণ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্ত জনপদকে শিক্ষা দিতেছে। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত এই শিক্ষাধীন, আবালবৃদ্ধবনিতা এই শিক্ষাধীন। ভক্তির পথে সবাই সমান অধিকারী। এই ভক্তির পথ জ্ঞানীর জন্য যেমন, অজ্ঞানী মূর্খ ও নারীর জন্যও তেমন। সমাজের সর্ব্বসাধারণের জন্য এই ভক্তিপথ। পুরোহিত পূজায় আসীন হইয়া চারিদিকে ভক্তির উপহারস্বরূপ নৈবেদ্যমাঝে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিতে সমস্ত দর্শকগণের মন মোহিত করিতেছেন। আবার যখন ভক্তিদীপ জ্বালিয়া দেবীকে আরতি করিতেছেন, তখন কি সমস্ত সমাগত লোক করপুটে তাঁহার চারিপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চিত্তার্পিত নয়নে সব সন্দর্শন করিতেছে না? তখন বোধ হয়, দর্শকমণ্ডলী ভক্তিরসে গলিয়া অবাক হইয়া দেবাবির্ভাব* উপলব্ধি করিতেছে। পুরোহিত ঠাকুর পূজায় দর্শকমণ্ডলীকে যেমন ভক্তি-শিক্ষা দিতেছেন, কথক ঠাকুর তাঁহার বাক্‌পটুতায়, অঙ্গাভিনয়ে এবং সঙ্গীতে তেমনই ভক্তিরসের উদ্দীপন করিতেছেন। উপস্থিত জনগণ মোহিত হইয়া সবই শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন এমত নহে, ভক্তিরসের উদ্দীপনায় কখন কাঁদিতেছেন, হাসিতেছেন, উৎফুল্ল হইতেছেন, কখন উৎসাহে পরিপূর্ণ হইতেছেন। বঙ্গসমাজের কথকতা এক মহাশক্তি; রসোদ্দীপনের মহা উপায়। এই কথকতা কোন দেশে নাই, কোন ধর্ম্মে নাই। পুরাণ এই কথকতার সৃষ্টি করিয়াছে।

* অর্চ্চনাকারীর তপোযোগ অনুসারে দেবাবির্ভাব ঘটে। যাহার যেমন তপস্যা, তাহার ফল তদ্রূপ।

আর সংকীর্ত্তন—কীর্ত্তনাঙ্গ—যাহার মাধুর্য্যে মন গলিয়া যায়—যাহার সমান মধুর ও মনোমুগ্ধকর আর বুঝি কিছুই নাই—যাহার সঙ্গীতে সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত হয়—সেই কীর্ত্তনাঙ্গ কোন্ দেশে আছে? গম্ভীর খোল করতালের তালে তালে যখন কীর্ত্তন সংগীত হইতে থাকে, তখন কি মন সেই তালে নাচিতে থাকে না? সেই কীর্ত্তন শুধু বঙ্গদেশের সম্পত্তি—বঙ্গসমাজের ভক্তি-রসোদ্দীপক মহাশক্তি। ভাগবত ও অপরাপর পুরাণাদি এই শক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছে, সৃষ্টি করিয়া বুঝি নারদের বীণাবাদিত ধর্ম্মগীতের মধুরতা বঙ্গদেশে দিয়া লোকসমাজকে উন্মত্তপ্রায় নাচাইয়া অমৃতবর্ষণ করিয়াছে।

এই সমস্ত শক্তি বঙ্গদেশের ধর্ম্মশিক্ষাদাত্রী, এই সমস্ত শক্তিপ্রভাবে বঙ্গ-দেশে ভক্তির প্রস্রবণ অহরহ প্রবাহিত হইতেছে। এই সমস্ত শিক্ষাশক্তি বঙ্গবাসী জনগণ নানাবিধ ভক্তিরসে আসক্ত করিতেছে। কেহ রূপাসক্তিতে মোহিত হইয়া ভগবানের রূপ বিশেষের ধ্যান ও ধারণায় উন্মত্ত। গোপিনীগণ যেমন শ্যামরূপে আসক্তা ছিলেন, তাঁহারা তদ্রূপ ভগবানের রূপবিশেষের পক্ষপাতী হইয়া সেইরূপেরই ভজনা ও সাধনা করিতেছেন। হনুমান যেমন রামরূপে আসক্ত, নারদ যেমন কৃষ্ণরূপে তন্ময়তালাভ করিয়াছিলেন, তেমনই রূপাসক্তি বঙ্গসমাজের ভক্তিপ্রবাহে বহিতেছে। রামপ্রসাদ কালীরূপের ভক্ত। কাহার বা পূজাশক্তি প্রবলা। পৃথুরাজ যেমন পূজাসক্ত ভক্ত ছিলেন, কেহ বা সেই পূজার উৎসবে পরিপূর্ণ। কেহ বা দাস্যভাবে ভগবানের সেবায় নিরত—যে দাস্যভাব হনুমানে এবং বিদুরে প্রকটিত। কেহ রামপ্রসাদের 'ভক্তিভাব সঞ্চারের জন্য অনুদিন সাধনা করিতেছেন। তেমনই ধর্ম্মতেজ, তেমনই বাৎসল্য-রস, তেমনই দাস্যভাব, তেমনই পিতৃ ও মাতৃভক্তিসম দেবভক্তি, তেমনই ভগবানকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করা, তেমনই বৈরাগ্য, তেমনই শান্তিসুখের সঞ্চার লাভের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন। যে ভাব যখন প্রবল হইতেছে, সেই ভাবে রামপ্রসাদী গানে ভক্তিরসের সঞ্চার করিতেছেন। তাই বঙ্গ-সমাজ সময়ে সময়ে রামপ্রসাদী গানে প্রতিধ্বনিত। সেই প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিরসের উদ্রেক। সেই ভক্তিউদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজ রামপ্রসাদের ধর্ম্মতেজ উপলব্ধি করিতেছে। সেই সঙ্গীতে মিশিয়া গিয়া মা বলিয়া দেবতার কাছে সন্তানের আবদার জানাইতেছে—পিতা বলিয়া ভক্তির আরাধনা করিতেছে।

আবার কখন বা সেই প্রতিধ্বনিতে সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিতেছে। রামপ্রসাদ এই সমস্ত রসের আধার ছিলেন। তাঁহার ভক্তি-প্রবাহে বঙ্গসমাজ আর্দ্র।

বঙ্গসমাজ ব্যাস ও বাল্মীকির পৌরাণিক ভক্তির ধর্ম্মরাজ্য। যে রাজ্যে ব্যাস ও বাল্মীকির অধিকার, সে রাজ্যে কি আর কোন গুরু স্থান পান? ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যাস এবং বাল্মীকির সমান কে? ভক্তির মাহাত্ম্য শাণ্ডিল্য ও নারদ অতি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভক্তির ক্রমোন্নতি, সাধনা, পরিপাক ও পরিণতি তাঁহাদের ভক্তিসূত্রে অতি পরিপাটীরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ভক্তিতত্ত্ব ভারত ভিন্ন আর কোন দেশে এবং হিন্দু ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের এবং হিন্দুধর্ম্মের এই বিশেষ সম্পত্তি। এই সম্পত্তির ঐশ্বর্য্যে হিন্দুধর্ম্ম পরিপূর্ণ—হিন্দুধর্ম্মের বিকাশ। সেই ঐশ্বর্য্যরাশি বঙ্গসমাজের প্রভূত ধনসম্পত্তি। বঙ্গসমাজের এত পূজা পার্ব্বণ, ব্রত অনুষ্ঠান এবং এত ধূমধাম কেবল সেই ভক্তিতত্ত্বের বিকাশ। অন্য দেশে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই ভক্তিতত্ত্ব জানেন না ও বুঝেন না বলিয়া, এই পূজাপদ্ধতি ও পৌরাণিক বিকাশের নিগূঢ় তত্ত্বের মর্ম্মাগত হইতে পারেন না। এই ভক্তিতত্ত্বে সমস্ত হিন্দুজাতি নিমগ্ন। মহাজ্ঞানীগণও এই পথের পথিক। দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি, গর্গাদি ঋষি প্রভৃতি, মহর্ষি ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি এই ভক্তিপথের পথিক। এমন পরিষ্কার অথচ সহজ সাত্ত্বিক পথ আর নাই। তজ্জন্যই এই পথ সর্ব্বসাধারণের জন্য উপযোগী হইয়াছে। সামান্যা, নিরক্ষরা গোপিকাগণ পর্য্যন্ত এ পথের অনুবর্ত্তিনী হইয়া তরিয়া গিয়াছেন। এ পথের পথিক হইতে গেলে, জ্ঞান, মান এবং ধনের আবশ্যকতা নাই; বল, বীর্য্য ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল হৃদয়ের। সেই হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণ এ রাজ্যের মহা মহা ধর্ম্মবীর হইয়া গিয়াছেন। পুরাণে সেই বীরগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অধুনাতন কালেও অনেক ভক্ত-মহাবীর জন্মিয়া এই রাজ্য আলোকিত করিয়াছেন*।

এই ভক্তির বিরাট বিকাশ, বঙ্গ সমাজের বৃহৎ ধর্ম্মশিক্ষার মন্দির। ধর্ম্ম

* চৈতন্য দেবের ভক্তিলীলা বঙ্গদেশের এক বিশেষ সম্পত্তি। বঙ্গসমাজে এই লীলার বিশেষ বিস্তার। চৈতন্য দেবের প্রেমলীলা বঙ্গসমাজকে এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে মাতাইয়া রাখিয়াছে। এ বিষয় আমরা পরে দেখাইব।

শিখিবার জন্য বঙ্গ-সমাজকে আর কিছুর এবং আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তুমি যদি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব করিতে চাও, যদি ইউরোপীয় দর্শনতত্ত্বে মহাপণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিতে চাও, তবে যাও যেখানে হিন্দুধর্ম্মের মহাজ্ঞানবীরগণ বসিয়া আছেন, সেই খানে একবার তাঁহাদের সহিত আলাপ কর—চার্ব্বাক, বৃহস্পতি, কপিল, কণাদ, অক্ষপাদ, ব্যাস ও শঙ্করের সহিত আলাপ কর—আলাপ কর বশিষ্ট, ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত। আলাপে তোমার পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, এই ভক্তিপথের আশ্রয় গ্রহণ কর। এ পথে যোগের মহাকষ্টসাধ্য ব্যাপার নাই, অথচ সহজে দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। দেবর্ষি নারদ তোমাকে এই শান্তিপথে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

পুংসবন।

শব্দটী প্রাচীন—বহু প্রাচীন। যে সময়ে এ দেশে বেদভাষা ব্যবহৃত হইত, সেই সময়ে উপরোক্ত "পুংসবন" শব্দের অভিধেয় এদেশে বিশেষ বিশেষরূপে বিজ্ঞাত ছিল। পুংসবন শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয়, পুংসবন এক প্রকার কর্ম্মের নামধেয় অর্থাৎ বৈদিক অনুষ্ঠান-বিশেষের নাম। সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্রে পুংসবনের বিধান দৃষ্ট হয়; পরন্তু ইহার অনুষ্ঠান আজকাল তিরোহিত হইয়াছে। পুংসবন কর্ম্মের তিরোধান শুভাবহ কি অশুভাবহ, তাহা পশ্চাৎ বিবেচিত হইবে।

হিন্দুমাত্রেই বিদিত আছেন যে, পুংসবন দশবিধ স্মার্ত্ত সংস্কারের অন্তর্গত দ্বিতীয় স্থানের সংস্কার। প্রথমে গর্ভাধান, তৎপরে পুংসবন। ধর্ম্মশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র উভয় শাস্ত্রে পুংসবনের বিধান আছে সত্য; পরন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের বিধান উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের বিধান অনুসারে চলিতে পারিলে "পুংসবন" নামের সার্থক্য সাধিত

হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, স্ত্রী ঋতুমতী হইবার পূর্ব্ব হইতেই পুমপত্যকামী পুরুষ পুত্রোৎপাদক ব্যবস্থার অনুগামী হইবেন এবং ঋতুদর্শন হইলে পুমপত্যপ্রদ সময়ে বীজ আহিত করিবেন। বীজাধানের সপ্তাহ পরেই আমাদের আলোচ্য পুংসবনের অনুষ্ঠান। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লিখিত আছে, ঋতুদর্শন হইলে যুগ্ম দিবসীয় সঙ্গমই পুংগর্ভের উৎপাদক হয়। যথা—

ঋতুস্তু দ্বাদশনিশাঃ পূর্ব্বাস্তিস্রশ্চ নিন্দিতাঃ।
একাদশীচ যুগ্মাসু স্যাৎ পুত্রোঽন্যাসু কন্যকা॥

রজোদর্শনাবধি দ্বাদশ রাত্র ঋতুনিশা অর্থাৎ গর্ভধারণের প্রশস্ত কাল। তন্মধ্যে প্রথম তিন রাত্র, একাদশ রাত্র ও ত্রয়োদশ রাত্র নিন্দনীয়। অবশিষ্ট রাত্রের মধ্যে, যুগ্মরাত্রে অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ রাত্রে বীজাধান করিলে পুংগর্ভের এবং অযুগ্ম রাত্রে অর্থাৎ পঞ্চম, সপ্তম ও নবম রাত্রে বীজাধান করিলে কন্যাগর্ভের উৎপত্তি হওয়া সুসম্ভব। "অচিন্ত্যত্যাৎ হেতুভাবস্য"। কারণের ভাব ও প্রভাব অচিন্ত্য। সুতরাং "কেন হয়?" এ প্রশ্ন অনবসর। আনুষঙ্গিক যুক্তি এই যে, ঐ ঐ দিবসে আর্ত্তব রক্তের অল্পতা ও বীজের বলাধিক্য ও মাত্রাধিক্য হইয়া থাকে। বীজের বল ও মাত্রা অধিক হইলেই পুংগর্ভ জন্মে।*

"স্ত্রিয়ঃ শুক্রেঽধিকে স্ত্রীস্যাৎ।
পুমান্ পুংসোঽধিকে ভবেৎ॥" ইত্যাদি।

যেমন, যুগ্মঋতু-নিশায় স্ত্রীসঙ্গম পুমপত্য লাভের কারণ, তেমনই বীজাধানের পর পুংসবনদানও পুমপত্য লাভের অন্যতম কারণ। প্রত্যক্ষফল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লিখিত আছে—"গর্ভাধানাৎ পরং সপ্তাহাদর্ব্বাক্ গর্ভগোলকঃ

* মানবদেহ সর্ব্বদাই হ্রাসবৃদ্ধির অধীন। ইহার অন্য এক নাম—পুদ্গল। "পূর্য্যন্তে গলন্তি চ।" কখন পুরিতেছে, কখন গলিতেছে। শরীর যে মাসের মধ্যে ১৫ দিন বৃদ্ধি পায় এবং ১৫ দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তুলাযন্ত্রে তুলিত করিলেই দেহের হ্রাসবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ হইতে পারে। পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব সকল দিন সমান থাকে না, বৃদ্ধিহ্রাস প্রাপ্ত হয়—প্রভাবের তারতম্য হয়। কাম ও কামোদ্দীপক শুক্রার্ত্তব তিথিবিশেষে ও দিনবিশেষে ন্যূনাধিক ভাব ধারণ করে এবং তদুভয়ের সামর্থ্যেরও তরতম ঘটনা হয়। এ সকল কথা কামশাস্ত্রে বিশেষ বিবৃত আছে।

শ্লেষ্মপিণ্ডীভূতো ভবেৎ। সপ্তাহাচ্চানন্তরং যাবৎ মাসঃ তাবদব্যাস্থিতিঃ কললী ভবেৎ। যাবদত্র কললীভূতে স্ত্রীপুরুষাত্মুৎপত্তিলক্ষণা ব্যক্তি র্ন ভবতি তাবৎ ব্যক্তেঃ প্রাক্ প্রথমে মাসি পুংসবনাদি প্রয়োজয়েৎ।" আর্ত্তব রক্তে গর্ভ-বীজ পুংশুক্র-সংস্পৃষ্ট হইলে তাহা সপ্তাহ পর্য্যন্ত শ্লেষ্মপিণ্ডপ্রায় (পোঁটার মত) থাকে। সপ্তাহের পর কলল অবস্থা আইসে (কিঞ্চিৎ কঠিন ও অঙ্গপ্রত্য-ঙ্গের অনুরূপ বিভাগ রেখা)। সে অবস্থায় কোনরূপ আকৃতি প্রব্যক্ত হয় না অর্থাৎ পুত্রের অথবা পুত্রীর আকার সংস্থিত হয় না। যাবৎ না কোনরূপ আকৃতি প্রব্যক্ত হয়, তাবৎ পুংসবনদান বিধেয়। পুংসবনদান কললীভূত গর্ভকে পুত্রাকার করিতে সমর্থ। বস্তুশক্তি অচিন্ত্য; বস্তুবলে না হয় এমন কার্য্যই নাই; সুতরাং পুংসবনদান যে, পুংগর্ভ উৎপাদনের সহায়, তাহা বলা বাহুল্য।

সম্প্রতি জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত "পুত্রকন্যা উৎপাদন নিজের আয়ত্তাধীন" এই ভাবের এক পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে, পুত্রোৎপাদনের বিধান ও কন্যোৎপাদনের বিধান স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি বলেন; নরনারী ইচ্ছা করিলে পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে কন্যা জন্মাইতে পারেন। মদুক্ত বিধানের অনুগামী হইলে অবশ্যই পুত্র হইবে এবং মদুক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে নিশ্চিত কন্যাপত্য হইবে। ইংরাজ লেখকের কথা আমরা অমান্য করি না এবং তাঁহার সেই পুস্তক আমাদের এই প্রবন্ধের প্রতিকূল নহে। আমরাও আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-দৃষ্টে বলিতে পারি, পুত্র-কন্যার উৎপাদন স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগের নিয়মবিশেষের অধীন। আমরা দৈষ্টিক অর্থাৎ অদৃষ্টবাদী সত্য; আমরা দৈবের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য মান্য করি সত্য; পরন্তু আমরা তাঁহাকে (দৈবকে) পুরুষকারাতিরিক্ত মনে করি না এবং পুরুষকারের প্রাবল্যে তাহার অভিভব হওয়াও মান্য করি। যে স্থলে দৈব প্রবল, সে স্থলে পুরুষকার বিফল এবং যে স্থলে পুরুষকার প্রবল, সে স্থলে দৈব বিফল, ইহাই আমাদের অর্থাৎ সমুদয় হিন্দুশাস্ত্রের মত। যথা—

"দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যুপহন্যতে।
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম প্রকৃষ্টেনোপহন্যতে॥"

দৈব কি? দৈবও একপ্রকার পুরুষকার। প্রাগ্‌ভবীয় পুরুষকার (পুরু-

যের যত্ন বা চেষ্টা) আত্মাশ্রয়ে সংস্কারীভূত হইয়া থাকে, তাহাই এতদ্দেহে দৈব, অদৃষ্ট ও পুণ্যপাপ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। যদি এতদ্দেহে উপযুক্ত পৌরুষ আহরণ করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সংস্কারীভূত অপ্রত্যক্ষ সুতরাং দুর্ব্বল দৈব কেননা প্রতিহত হইবে ? পুরুষকার দুর্ব্বল—এ কথার অর্থ এই যে, কার্য্যোপযোগী যোগ্য যত্ন না হওয়া ; অথবা ঠিক উপায় বুঝিতে না পারা। যে প্রকার যত্নে, চেষ্টায় বা উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হয়, ঠিক্ সে প্রকার যত্ন, চেষ্টা বা উপায় বিজ্ঞাত হইয়া প্রয়োগ করিতে না পারিলে তাহা বিফল হয়। কাযেই দৈবের প্রাবল্য অগ্রসর হইয়া মানুষকে বিমোহিত করে। প্রত্যক্ষ-ফল আয়ুর্ব্বেদ প্রস্তাবিত বিষয়ে বলিয়াছেন,—

"বলী পুরুষকারোহি দৈবমপ্যতিবর্ত্ততে।"

যোগ্য পুরুষকার অর্থাৎ ঐহিক প্রযত্ন দৈবকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ। "অত্র পুংসবনাদি সম্যক্ প্রয়োজিতং সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যনুমীয়মানং দৈবাপর নাম্নঃ প্রাক্‌কৃতস্য কর্ম্মণো হীনবলত্বং প্রবলত্বং বা অবগময়তি।" পুরুষকারের প্রাবল্যে দুর্ব্বল দৈব অভিভূত হইয়া পুরুষকারের অনুরূপ ফল উৎপন্ন হইবার উৎকট সম্ভাবনা থাকায় পুমপত্য উৎপাদনার্থ পুংসবন দান করিবে। তাহা সম্যক্‌রূপে প্রদত্ত হইলে অবশ্যই পুংসবন-ফল পুংগর্ভ উৎপন্ন হইবে। যে স্থলে সম্যক্‌রূপে পুংসবনাদি প্রয়োগ করিলেও কন্যাপত্য জন্মে, সেই স্থলেই অনুমান করিবে, প্রবল দৈব তাহার দুর্বল পুরুষকার বিফল করিয়া কন্যাপত্য জন্মাইয়াছে। পুংসবন প্রয়োগ এইরূপ—

১। সুবর্ণের অথবা শুদ্ধ লৌহের পুরুষাকৃতি পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্নিদগ্ধ করিবে। পরে সেই প্রতপ্ত অগ্ন্যাকার পুত্তলিকা দুগ্ধ মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিবে। পরে গর্ভিণী ৪ পল পরিমাণ সেই দুগ্ধ পান করিবেন।

২। গৌরদণ্ড, অপামার্গ, জীবক, ঋষভক, এই ৪ দ্রব্যের এক, দুই, তিন, অথবা চার দ্রব্য বাটিয়া জলে ছাকিয়া সেই জল পান করিবেন।

৩। শুক্লপুষ্প-কণ্টকারিকা দুগ্ধে বাটিয়া তাহা ছাঁকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা পূরণ করিবেন।

৪। লক্ষ্মণামূল দুগ্ধে বাটিয়া পান করিবেন।

৫। জীবনীর ওষধি বাটিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন ও তদ্‌যুক্ত জলে স্নান করিবেন।

৬। ৮টী বটের কুঁড়ি দুগ্ধে বাটিয়া পান করিবেন।

এইরূপ এইরূপ অনুষ্ঠানের নাম পুংসবন। এ পুংসবন বৈদ্যকোক্ত। এতদ্ভিন্ন স্মৃত্যুক্ত পুংসবন আছে; পরন্তু তাহা অন্যবিধ। বৈদ্যকোক্ত পুংসবনের ফল—পুংগর্ভ উৎপাদন এবং স্মৃত্যুক্ত পুংসবনের উদ্দেশ্য—উৎপন্ন পুংগর্ভের সংস্কার। বৈদ্যকোক্ত পুংসবন প্রয়োগে গর্ভস্থ কলল পুংশরীরে বিভক্ত হইতে থাকে এবং স্মৃত্যুক্ত পুংসবন প্রয়োগে তাহার উত্তমতা জন্মিতে থাকে।

পুত্র হইলেই যে কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা নহে। সৎপুত্র হওয়া আবশ্যক। "দুরপত্যং কুলাঙ্গারো গোত্রে জাতং মহত্যপি"—সদ্বংশে দুরপত্য (কুপুত্র ও কুকন্যা) জন্মিলে সে অপত্য সে কুল কলঙ্কিত করে। সেজন্য প্রত্যেক দম্পতীর সৎপুত্র উৎপাদনে যত্ন থাকা আবশ্যক। আমাদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বলেন, সৎপুত্র উৎপাদনও দম্পতীর আয়ত্তাধীন। দম্পতী শাস্ত্রোক্ত বিধানে মৈথুনানুষ্ঠান করিলে সৎপুত্র সৃষ্টি করিতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সকল সৎপুত্রীয় বিধান লিখিত আছে, সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলি শ্রেষ্ঠ;—

১। অন্যূন সপ্তদশ বর্ষীয়া নারী এবং অন্যূন একবিংশ বর্ষীয় নর মৈথুন্য ধর্ম্মের অবলম্বন করিবেন।

২। নারী রজোদর্শন হইলে প্রথম তিন দিন ব্রহ্মচারিণী ও নর অনন্যকামী থাকিবেন।

৩। বীজাধানকালে দম্পতীর মধ্যে কাহার কোন রূপ ব্যাধি ও দৌর্ব্বল্য না থাকে।

৪। শুক্র, শোণিত, গর্ভাশয় নির্দ্দোষ থাকা আবশ্যক।

৫। আহার, বিহার ও আচার সংশুদ্ধ থাকা আবশ্যক।

৬। হৃষ্টচিত্তে তন্মনা হইয়া বীজাধান ও উত্তানশায়িনী হইয়া বীজগ্রহণ বিশেষ উপকারী।

৭। সঙ্গম দিবসে নর নারী উভয়েরই সৌমনস্য, আস্তিকতা, সৎপ্রবৃত্তি, শৌচ, শুদ্ধি ও অভিলষিত পুত্র কন্যা উৎপাদনের অনুরূপ ধ্যান অর্থাৎ চিন্তাপ্রবাহ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

সৃষ্টি-কৌশল নিতান্ত অদ্ভুত ও অচিন্ত্য। পূর্ণশক্তি জগদীশ্বরের শক্তিনিয়মন, কার্য্যের প্রতি কারণ ভাবের প্রভাব ও জীবের ধ্যানশক্তির মহিমা বোধগম্য

করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। উপরে যে চিন্তাপ্রবাহ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, উহার মহিমা বর্ণন অস্মদাদির পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য। শত শত পরীক্ষা-দর্শনের পর শাস্ত্রকারগণ স্থির করিয়া গিয়াছেন যে "ঋতুস্নাতা যাদৃশাং পশ্যতি চিন্তয়তি বা তাদৃশমেব পুত্রং প্রসূতে।"

ঋতুস্নাতা নারী তদ্দিবসে (সঙ্গম দিবসে) যাহাকে অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করে এবং যাহাকে ধ্যান বা চিন্তা করে, সে তাহারই অনুরূপ পুত্র প্রসব করে। স্নান দিবসে পাছে পরপুরুষের দর্শন ও চিন্তা হয়, সেই ভয়ে শাস্ত্রকারগণ উচ্চৈঃরবে বলিয়াছেন—

"ইচ্ছন্তী ভর্ত্তৃসদৃশং পুত্রং পশ্যেৎ পুরঃপতিম্।"

ঋতুস্নাতা নারী ভর্ত্তার সদৃশ পুত্র কামনায় সর্ব্বাগ্রে পতি সন্দর্শন করিবেন। (সেদিন কদাচ অন্যের মুখাবলোকন করিবেন না।)

দ্রঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ, দীর্ঘায়ুঃ, সুশীল, সচ্চরিত্র, সুরূপ পুত্রকন্যা লাভ করিতে ইচ্ছা থাকিলে, চিত্ত-সংযমসহকারে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই সঙ্গম দিবসে সঙ্গম-নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই প্রকারের চিন্তা প্রবাহিত রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অভিলাষ-সিদ্ধি হইবার সুসম্ভাবনা। এ কথা পরীক্ষিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে স্পষ্ট-রূপে লিখিত আছে। যথা—

"ইচ্ছেতাং যাদৃশং পুত্রং তদ্রূপাচরিতাংশ্চ তৌ।
চিন্তয়েতাং জনপদান্ তদাচার পরিচ্ছদৌ ॥"

জীব মিথুনের বীজনিক্ষেপ ও বীজগ্রহণকালে যাদৃশ রূপদর্শন ও যাদৃশ ধ্যান বিদ্যমান থাকে, বীজোৎপন্ন অপত্যে তাদৃশ রূপের ও গুণের আবেশ হয়।* *ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন পশু বিশেষের সঙ্গমকরণ অর্থাৎ ঘোড়ার ব্রীড্।* ঘোড়া ব্যবসায়ীরা যে রঙের ঘোড়া জন্মাইবার ইচ্ছা করে, সঙ্গম করাইবার পূর্ব্বে ঘুড়ীকে সেই রঙের উজ্জ্বল বস্তু বা সেই রঙের ঘোড়া দেখায়। অনন্তর তাহার চোক্ বাঁধিয়া দিয়া সঙ্গম করায়। এই প্রণালীতে তাহারা ইচ্ছানুরূপ রঙের ঘোড়া উৎপাদন করে। ঘুড়ী সঙ্গমকালে যে রঙ্ মনে রাখে, যে আকারের ঘোড়া ভাবিয়া সঙ্গতা হয়, সেই রঙের ও প্রায় সেই আকারের

* মহাভারতে লিখিত আছে, জননী সঙ্গমরাত্রে ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তদ্গর্ভে পাণ্ডু এবং নেত্র নিমীলন করতঃ রূপদর্শন-বর্জ্জিত হওয়ায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল।

শাবক প্রসব করিয়া থাকে। সঙ্গমকালের ধ্যান বা মনোভাব ছাঁচের ন্যায় কার্য্যকারী। যেমন ছাঁচ, তেমনই ঢালাই মূর্ত্তি, তাহার অন্যথা হয় না। এ নিয়ম পশু, পক্ষী, মানব, সর্ব্বত্রই বিরাজিত। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন, সৎপুত্র উৎপাদন দম্পতীরই আয়ত্তাধীন।

দেখা যায়, আজ কাল লোকে কিসে ভাল ঘোড়া হয়, কিসে ভাল গো ও বৃষ জন্মে, ও কিসে উত্তম কুক্কুর উৎপাদন করা যায়, সেই চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু কিসে ভাল পুত্র জন্মে ও কিসে মনুষ্যজাতির উৎকর্ষ হয়, সে ভাব বা সে চিন্তা কাহার মনে আদৌ নাই। এ কালের লোকে পূর্ব্বকালের "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ভুলিয়া গিয়াছে। সকলেই কামস্পৃহা চরিতার্থের জন্য ব্যস্ত ও যদৃচ্ছাচারী। দম্পতীর স্বেচ্ছাচারই মনুষ্যসমাজের অমঙ্গলের অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। কানা, খোঁড়া, কুঁজো, ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ব্বল, হীনাঙ্গ, অল্পায়ু চোর, ছ্যাঁচোড়, দুঃশীল সন্তানের উৎপত্তি দম্পতীর অপরাধেই হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আরও বক্তব্য আছে, পরন্তু তাহা প্রবন্ধান্তরে বক্তব্য।

শ্রীকালীবর শর্ম্মা।

আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার আবশ্যক।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের সনাতনধর্ম্ম বহুশাখা বা উপধর্ম্মে বিভক্ত। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে হিন্দুগণ বিভক্ত হইয়াছেন। আবার এক সম্প্রদায়ের মধ্যে কত উপসম্প্রদায় আছে। এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজী, রামানন্দী, কবিরপন্থী, রায়দাসী, বল্লভাচারী, রাধাবল্লভী, চরণদাসী, সাধনপন্থী প্রভৃতি অনেক দল দেখা যায়। যত সম্প্রদায়েই কেন হিন্দুগণ বিভক্ত হউন না, তাঁহাদের সাধনপ্রণালীর যত পার্থক্যই কেন লক্ষিত হউক না, এই স্বতন্ত্রতার মধ্যেও একতা লক্ষিত হয়। বেদই হিন্দুর মূল ধর্ম্ম-শাস্ত্র। বেদবিরুদ্ধ কোন ধর্ম্মই হিন্দু স্বীকার করেন না। যে সমুদয় গ্রন্থে বেদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সমুদয় গ্রন্থই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র এবং যে সমুদয় সাম্প্র-

দায়িক সাধনপ্রণালীতে বেদ-রহস্য সূচিত হইয়াছে, তাহাই সে সমুদয়ের অবলম্বনীয়। এই বেদার্থ ভারতে অব্যাহত থাকে, এই নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং হিন্দুগণ লোপোন্মুখ সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। শাক্য, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব, ইহাঁরা কেহই কোনও নূতন ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, লোকের অজ্ঞতাহেতু সনাতন-আর্য্য-ধর্ম্মরূপ মহাসাগরের পঙ্কিলতা নিবন্ধন তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া কেবল পঙ্কোদ্ধারই করিয়াছেন। "মা হিংসাৎসর্ব্বভূতানি" প্রভৃতি শ্রুতি অনাদৃত হইয়া যখন বৈদিক অনুষ্ঠান পশুহিংসায় পর্য্যবসিত হইতেছিল, তখন বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তির অনুষ্ঠান ও প্রচার দ্বারা সেই অখিল নিত্য বেদেরই উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। কবি জয়দেব বলিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।"

যখন বৌদ্ধদিগের অজ্ঞতা-নিবন্ধন লোকসমাজে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল, চারিদিকে ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন শঙ্করাচার্য্য সমুদ্ভূত হইয়া সেই বৈদিকধর্ম্মই প্রচার করিয়া যান।

তন্ত্র এতদ্দেশে বহুকাল হইতে প্রচারিত আছে। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ইহাঁরা সকলেই তান্ত্রিক। শাক্ত-তন্ত্রোক্ত পঞ্চতত্ত্বসাধনে অসমর্থতাবশতঃ হিন্দুরা ক্রমশঃ নানা কুক্রিয়াশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহারা সাধন-ব্যপদেশে নিজ নিজ পাশববৃত্তিগুলিরই সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত মহাদেবের

"কলিজা মানবা লুব্ধা শিশ্নোদর পরায়ণাঃ।
লোভাতত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্॥"

এই মহাবাক্যেরই সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিল, তখন শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া প্রধানতঃ বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার দ্বারা সেই বেদেরই মাহাত্ম্য স্থাপন করেন। মহাপ্রভু তন্ত্রবিদ্বেষী বা শাক্তবিদ্বেষী ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি নিজেই পরম শাক্ত ছিলেন। তিনি নিজেও যেমন শক্তির উপাসনা করিতেন, সাধারণ্যেও তেমনই শক্তিপূজা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শক্তি সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে॥"

প্রকৃতপক্ষে নামভেদ ভিন্ন, শাক্ত ও বৈষ্ণব-সাধনে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। প্রভেদ না থাকুক, কোন ধর্ম্মই অধিককাল একভাবে চলে না। ধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মধ্বজী লোকের সমাবেশ হয়। এই ধর্ম্মধ্বজীরা ধর্ম্মানুষ্ঠানের দোহাই দিয়া কতকগুলি ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত ও আচার আপনাদের সুখ সচ্ছন্দতা ও কাম-চরিতার্থতার জন্য ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া লয় এবং কূটতর্ক ও অর্থান্তর দ্বারা মহাত্মাদিগের জীবনে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে সেই সকলের পরিপোষক কার্য্য বা শ্লোক প্রদর্শন দ্বারা অজ্ঞলোক-দিগকে বিমোহিত করে। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত, তাঁহারা কোন ক্রমেই ঐ সকল মতের সমর্থন করেন না, বরং সেগুলি বেদ-বিরুদ্ধ ও সনাতন-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্যই করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের যে সকল শিষ্য বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন, তন্মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর নাম বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এরূপ একটি প্রবাদ শুনা যায় যে, নিত্যানন্দ বলিতেন,—

"ভর-যুবতীর কোল, মাগুর মাছের ঝোল, মুখে হরি বোল।"

যে সকল বৈষ্ণব উপরি-উদ্ধৃত বাক্য নিত্যানন্দ প্রভুর কথিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহার যে কতদূর ঘৃণিত হইতে পারে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। বাউল সম্প্রদায়ের সাড়ে চব্বিশ সাধনের মধ্যে এক সাধনের নিয়ম এই যে, তাহারা রজস্বলা স্ত্রীর রজঃ পান করাকে ধর্ম্মোচিত কার্য্য মনে করে। এই কার্য্যের বৈধতা প্রমাণের জন্য ইহারা বলে যে,—

"এক দিন ব্রজগোপী সহজ হইল।
তিন দিন অধরামৃত পড়িয়া রহিল॥
পাইল তখন তাহা রামানন্দ রায়।
না পেয়ে গৌরাঙ্গদেব করে হায় হায়॥"

বাউলেরা "অধরামৃত" শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়া থাকে। তাহারা বলে, অধঃ নিস্থত যে অমৃত, তাহাই অধরামৃত অর্থাৎ রজঃ।

এইরূপ অর্থবিপর্য্যয় যে বৈষ্ণবধর্ম্মে আজি কালি হইতেছে তাহা নহে, অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইহার প্রারম্ভ বলিতে হইবে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, কবিবর কাশীরাম দাস বৈষ্ণবধর্ম্মের এতাদৃশ ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ভজ হরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি নিতাই দাস,
শাস্ত্র অগোচর নাই কিছু।
ইহাঁরা কিবা বিদ্যান্ত, কিবা করেন সিদ্ধান্ত,
বদরী ব্যাখ্যা করেন কচু॥"

আমরা একথা বলিতেছি না যে, বৈষ্ণবমাত্রেই এরূপ ঘৃণিত মত সকলের পোষকতা করেন। মূর্খ ও ইতর লোকদিগের মধ্যে চৈতন্যদেবের প্রাচারিত ধর্ম্মের যেরূপে অর্থান্তর হইয়া নীচ সমাজে ব্যভিচারের বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। মূর্খ লোকেরা যাহাই বুঝুক না কেন, তাহাতে বড় আসে যায় না। কিন্তু যে সকল গোঁসাই ঠাকুরেরা ইহাদের মন্ত্রদাতা, তাঁহারাও অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞতা লুকাইবার জন্য ঐরূপ সব ব্যাখ্যায় সায় দেন, কাজেই ইষ্টদেবতার সম্মতি তাহাদের পক্ষে বেদবাক্য তুল্য হয়।

শুধু বৈষ্ণবদিগের মধ্যে নয়, শাক্তদিগের মধ্যেও তাহাই। মদ্য মংসাদি পঞ্চতত্ত্বের সাধনে শাক্ত-সম্প্রদায়ীরা ইন্দ্রিয়াশক্তির প্রাবল্য বশতঃ যখন মদ্যাদি যথাসুখে ব্যবহার করিতেছিল, তখন চৈতন্যদেব মর্ম্মাহত হইয়া তাহার প্রতি-কূলে দণ্ডায়মান হন। এই মদ্যপেরা প্রভু ও তাঁহার শিষ্যগণকে কম উত্যক্ত করে নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

"একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডীপ্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল॥
ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া॥
কলার পাত উপরে থুইলা ওড়ফুল।
হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেল।

প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহাতো দেখিল ॥
বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন দুরাচার ॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥”

চৈতন্যদেব এই সকল পাষণ্ডদিগকে দলন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম স্থাপন করিতেই অবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দ্বারা কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেন, শাক্ত সম্প্রদায়েরও উপকার হইয়াছিল। তৎকালের প্রচলিত শাক্ত-ব্যবহার কতদূর শাস্ত্রসম্মত, ইহা দেখিতে যাইয়া বিজ্ঞ শাক্তগণ নিজেদের দোষ অনেকটা সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কালসহকারে কতকগুলি ভ্রমসংস্কার পুনরায় ইহাঁদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

তন্ত্রোক্ত পঞ্চতত্ত্বের সাধনই শাক্তদিগের ধর্ম্মোন্নতির বা ধর্ম্মাবনতির প্রধান কারণ। যে সকল শাক্তের বাহ্য পূজাতেই জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়, নিমীলিত নেত্রে কোনও মূর্ত্তিবিশেষের আকার মনে মনে হৃদয়দেশে অঙ্কিত করার চেষ্টাই যাহাদের মানসিক পূজার চরম সীমা, তাহারা পঞ্চতত্ত্বের (পঞ্চ মকারের) গূঢ় অর্থ বুঝিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ইহারা মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্ব সাধারণ অর্থেই প্রায়শঃ গ্রহণ করে, সুতরাং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়াশক্তির প্রাচুর্য্যই তাহাদের চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। কুলার্ণব তন্ত্রের ২য় উল্লাসে লিখিত আছে,—

“মদ্যং পানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভতে বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজোভবন্তি হি ॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।

সর্ব্বেঽপি জন্তবোলোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ ॥”

ইহার তাৎপর্য্য এই,—মদ্যপান দ্বারা যদি মনুষ্যের সিদ্ধিলাভ হইত, তবে মদ্যপানরত সকল পামরই সিদ্ধ হইত; মাংসভক্ষণ করিলে যদি পুণ্যবান্ হওয়া যাইত, তবে মাংসাশীরা সকলেই পুণ্যভাজন হইত; হে পার্ব্বতি! যদি স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা মোক্ষলাভ হইত, তবে সকল জন্তুই স্ত্রীনিসেবন দ্বারা মুক্তি পাইত।

পঞ্চতত্ত্বের গূঢ় অর্থ কি, তাহাই এখন বলা যাইতেছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা, শরীর মধ্যে পরিকল্পিত এই ষট্চক্রে উপহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব এই ছয় শিবের সহিত যথাক্রমে কুণ্ডলিনী শক্তিকে সঙ্গত করাইয়া, মস্তিষ্কে অবস্থিত সহস্রার-পদ্মে অধিষ্ঠিত বিশ্বরূপ পরশিবের সহিত উক্ত কুলকুণ্ডলিনীর সংযোগানন্তর সহস্রারে অবস্থিত চন্দ্র হইতে যে সুধা ক্ষরিত হয়, তদ্দ্বারা যথাক্রমে ঐ ষট্চক্র ও ষট্শিবকে অভিষিক্ত করিয়া মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীকে পুনঃস্থাপনই আমাদের ত্রৈকালিক তান্ত্রিক সন্ধ্যা†। যে মহাপুরুষ ইত্যাকার সন্ধ্যাবন্দনে সমর্থ, তিনি নিত্যই ত্রিবার চন্দ্রক্ষরিত সুধাপান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। এই সুধা বা অমৃতের অপর নাম সুরা। এই সুধাই বৈদিক সোমরস এবং তান্ত্রিক সুরা। এতাদৃশ সুরাপায়ী মনুষ্যরাই সুর অর্থাৎ দেবতা এবং এই সুরাপানের অসমর্থতা বশতই মনুষ্য অসুর-পদবাচ্য হয়। যোগিনী তন্ত্রের ষষ্ঠ পটলে লিখিত অছে,—

“কুণ্ডল্যা-মিলনাদিন্দোঃ শ্রবতে যঃ পরামৃতং।
পিবেদ্যোগী মহেশানি সত্যং **** কুলযোগং মহাপানমিদং স্মৃতং॥‡
পাপপুণ্যং পশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন শাম্ভবি।
পরমাত্মনি নয়েচ্চিত্তং পলানীতি নিগদ্যতে॥
মনসা সেন্দ্রিয়ং সর্ব্বং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মৎস্যাশী স ভবেদ্যোগী মুক্তবন্ধস্তব প্রিয়ে॥

† অদীক্ষিতেরা এই ষট্চক্রভেদ সহসা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

‡ মুদ্রিত পুস্তকে যেরূপ আছে অবিকল সেইরূপই উদ্ধৃত হইল। তন্ত্রগ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য। প্রকাশককে হয়তো কখনও কেবল একখানা হস্তলিখিত পুস্তক দেখিয়াই মুদ্রিত করিতে হইয়াছে। সুতরাং যে স্থান কীটদংষ্ট্র বা ছিন্ন হওয়াতে পড়িতে পারেন নাই, সেই স্থানে প্রকাশক **** এইরূপ চারিটি চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছেন।

অশেষব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং পরং ব্রহ্মণি সংনয়েৎ।
পরশক্ত্যাত্ম সংযোগো ন বীর্য্যে মৈথুনং মতং॥”

ইহার তাৎপর্য্য এই;—কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সহস্রারস্থ চন্দ্রের মিলন দ্বারা যে অমৃত ক্ষরিত হয়, হে মহেশানি! আমি (মহেশ) যথার্থই বলিতেছি, যোগীরা সেই অমৃত পান করে এবং ইহাই কৌলিকদিগের মহাপান। হে শাম্ভবি! জ্ঞান-রূপ খড়্গদ্বারা পাপ-পুণ্যরূপ পশুদ্বয়কে ছেদন করিয়া পরমাত্মাতে চিত্ত-স্থাপনই মাংসতত্ত্ব। মনের সহিত সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া আত্মাতে যোজনা করাই মৎস্যাহার; এইরূপ মৎস্যাশীই যোগী ও মুক্তবন্ধ। অশেষ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড পরব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করাই মুদ্রাতত্ত্ব। পরশক্তির (মহাকুণ্ডলিনীশক্তির) সহিত আত্মার যে সংযোগ, তাহাই মৈথুনতত্ত্ব; প্রত্যুত স্ত্রীসম্ভোগ মৈথুনতত্ত্ব নহে।

নিরুত্তর-তন্ত্রের ১০ম পটলে লিখিত আছে,—

“সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।”

অর্থাৎ—যাহার মন্ত্র সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই বীর; মদ্যপান দ্বারা বীর হওয়া যায় না।

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, আজি কালির তান্ত্রিক বীরাচারী বা কৌলি-কেরা মদ্যপান দ্বারা কত বীভৎস কাণ্ডই না করিতেছে। ইহাদের আচরণ দেখিয়া এখন অনেকে তন্ত্র বা তান্ত্রিকের নাম শুনিলেই বিরক্তি প্রকাশ করে। তন্ত্র বেদ নহে যে, উহাতে শূদ্রাদির অধিকার নাই। তন্ত্র সর্ব্বজাতির পাঠ্য ও আচরণীয়। উহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। যিনি তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অল্প আয়াসেই উহার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন। তন্ত্রবিষয়ে জনপ্রবাদ বা ধারণা অনুসারে কার্য্য না করিয়া, তন্ত্রপাঠ দ্বারা উহার মর্ম্মোদ্ধার করাই সঙ্গত। কিন্তু অধুনা শাস্ত্রপাঠে আর লোকের পূর্ব্বের ন্যায় অভিরুচি নাই। সুতরাং গোঁড়া হিন্দুদিগের অনেকে মন্ত্রদাতা গুরুর যেরূপ আচরণ দর্শন করেন, তাহাই ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি বলিয়া মনে করেন। এই গুরু মহাশয়েরা কখন কখন তন্ত্রের অপব্যাখ্যা অবলম্বনে নিজ নিজ অন্যায় আচ-রণের সমর্থন করিতে ত্রুটি করেন না। সুতরাং গুরুর উপদেশে শিষ্য এবং শিষ্যের কার্য্যে গুরু উত্তরোত্তর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে থাকেন।

আমরা একথা বলিতেছিনা যে, হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ও সাধক

গুরুর একেবারে অভাব হইয়াছে। অভাব না হউক, কিন্তু এরূপ গুরুর সঙ্খ্যা যে বিরল, তদ্বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে একথাও সত্য যে, মন্ত্র-গ্রহীতা যদি সৎস্বভাবান্বিত, বিজ্ঞ, সদাচারী ও গুরুপদে ভক্তিসম্পন্ন হন, তবে মন্ত্রদাতা যে-প্রকৃতির লোকই কেন হউন না, তাহাতে বড় ক্ষতি হয় না। চিন্তা-শীল সাধকের নিকট অচিরেই মন্ত্রার্থ প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং সেই মন্ত্রমাহা-ত্ম্যেই তিনি ক্রমশঃ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। সকলে তো আর এরূপ অধিকারী নহে। গুরুই শিষ্যকে সনাতন-ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া সাধনার পথে অগ্রসর করিয়া লইবেন, ইহাই সর্ব্বথা হওয়া উচিত। তজ্জন্যই বলি, আমাদের গুরু-সম্প্রদায়ের সংস্কার হইলেই হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার আপনা আপনিই হইবে।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মে অনেক কুসংস্কার ও কদাচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এ কথা সকলেই বোধ হয় একবাক্যে স্বীকার করিবেন। দোষ হইলেই উহার শান্তি আবশ্যক এবং শান্তির জন্যই অবতারের প্রয়োজন। বেদার্থের বহুকাল অর্থান্তর হওয়াতে সমাজে যে সমুদয় কুক্রিয়া আসিয়া ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে, বেদোদ্ধার দ্বারা সেই সকল কুক্রিয়ারূপ দৈত্যগণকে বিনাশ করিবার জন্যই ভগবান্ নারায়ণ যুগে যুগে আবির্ভূত হন। কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব এই ভাবেই লিখিয়াছেন,—

> "বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
> দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
> পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
> ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

কোন্ কালে কেশব কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া বেদোদ্ধার করিবেন, ততকাল কি আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া থাকিব? না, কখনই নয়। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্র, সরল ভাবে সরল ভাষায় বেদার্থ প্রতিপাদন করিয়া আমাদের উন্নতির পথ কত সহজ করিয়া দিয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজ্যপাদ ভাষ্যকার ও টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা এবং গুরুর উপদেশ অনু-সারে যদি সেই সকল শাস্ত্র পাঠ করি ও তদনুরূপ কার্য্য করি, তবেই আমাদিগের শ্রেয়ঃ সাধন হইবে। যিনি এইরূপ সংযমপূর্ব্বক হিন্দুশাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইবেন,

তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে, সাধারণতঃ লৌকিক ভাবে এক্ষণে যাহাকে ধর্ম্ম বলি, তাহা সর্ব্বাবয়য়ব-সম্পন্ন ধর্ম্ম নহে; যাহাকে সুসংস্কার বলি, তাহা কেবল কুসংস্কার মাত্র; যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নহে পরন্তু পূর্ণ-মাত্রায় ভ্রম ·এবং যাহাকে দেবতা বলি, সে অসুর। মূল কথা এই, প্রকৃত ধর্ম্মলাভ ভিন্ন আত্ম-সংস্কারও হয় না এবং ধর্ম্ম বা সমাজের সংস্কারও হয় না। ধর্ম্মতেই উন্নতি ও অধর্ম্মতেই অবনতি, ইহা অবশ্যম্ভাবী। পূজ্যপাদ ঋষিগণ দেবাসুরের যুদ্ধের আখ্যায়িকা-স্থলে ইহা আমাদিগকে বিশিষ্টরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ধর্ম্মের হানি দ্বারা দেবতারাও হীনবীর্য্য হইয়া অসুর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। আমরাও এখন ধর্ম্মহানি-নিবন্ধন অসুর কর্ত্তৃক পরাজিত। পূর্ব্বকালের ঋষিগণ-কথিত সনাতন-ধর্ম্মের সাধনা ভিন্ন সেই অসুর পরাভবের অন্য উপায় নাই।*

শ্রীরসিকলাল ঘোষ।

আকবরসাহের ধর্ম্মমত।

আমাদের মতে বোধ হয়, সর্ব্ববিষয়িণী প্রতিভা লইয়া, আকবরের ন্যায় কোন বিজাতীয় সম্রাটই এই রত্নপ্রসূ ভারতভূমির একচ্ছত্রা অধিকারিত্ব লাভ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। আকবরসাহের জীবন সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহার বীরত্ব ও গৌরবময় সৈনিকজীবন, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সাম্যনীতিমূলক আদর্শ সম্রাটজীবন, তৃতীয়তঃ পরহিতচিকীর্ষু-প্রবৃত্তি-পরিপূর্ণ তাঁহার ধর্ম্মজীবন। এই তিন জীবনেই তিনি শ্রেষ্ঠতার চরমশিখরে উপনীত হইয়াছিলেন। আমরা এই তিন দিক দিয়া তাঁহার চরিত্র যতই

* এই প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে আমাদের মতৈক্য নাই। এসম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য রহিল।

উদারভাবে আলোচনা করিয়াছি, ততই তাঁহার অমানুষিক গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সর্ব্ববিষয়িণী প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছি।

তাঁহার জীবনচরিত-প্রণেতা, তাঁহার সমসাময়িক ইতিবৃত্তকার, তাঁহার প্রিয় সহচর, অন্তরঙ্গ আবুল্‌ফজল্, তাঁহার চিত্র যে পরিমাণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, অনেকে তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া থাকেন। কেহ কেহবা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে "চাটুকার" ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিতে ছাড়েন নাই। হইতে পারে, আবুল্‌ফজলের বৃত্তান্তের কতকাংশে পক্ষপাতিত্বের ছায়া আছে, কিন্তু তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যের কোন অপলাপ হয় নাই। যেখানে কোন অতিরঞ্জিত বৃত্তান্ত আছে—একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেই তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বন্ধুত্বের, অনুগ্রহের, সদাচরণের ও প্রচুর উপকারের পরিবর্ত্তে যদিও আবুল্‌ফজল্ দুই এক স্থানে বর্ণিত ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া থাকেন—বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে তাহা শতবার মার্জ্জনীয় হইতে পারে।

চুম্বকে লৌহ আকর্ষণ করে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহাতে উভয়েরই আপেক্ষিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফৈজি ও আবুল্‌ফজল্ আকবরের দ্বারা যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—তাঁহাদের নিজের আকর্ষণ-শক্তি তৎপরিমাণে তাঁহার উপর প্রয়োজিত করিয়াছিলেন। "দীন ইলাহি" বা আকবরের নূতন ধর্ম্মমত এই আকর্ষণের অন্যতম ফল।

বাল্মীকি না হইলে, রঘুকুলভূষণ রামের চরিত্র ফুটিত না—ব্যাস না হইলে, মহাভারতোক্ত বীরগণ অপ্রচ্ছন্ন থাকিতেন—হোমার না থাকিলে, ইলিয়াডের প্রচার হইত না—চাঁদকবি না থাকিলে, পৃথ্বীরাজ ফুটিতেন না—আবুল্‌ফজল্ না থাকিলে, আকবরের প্রকৃত চরিত্র আমরা দেখিতে পাইতাম না। আকবরের বংশধরগণের মধ্যেও অনেকে তাঁহার গুণাবলীর কতকাংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত চিত্রকরের হস্তে তাঁহাদের চিত্র প্রতিফলিত করিবার ভার পায় নাই বা পড়িবার সুযোগ হয় নাই বলিয়া, তাঁহারা অন্যপ্রকার ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন।*

---

* আবুল্‌ফজল্ ব্যতীত, অন্যান্য আরও কয়েকজন সমসাময়িক ইতিহাসলেখক আকবরের সময়ের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বদৌনি সর্ব্বপ্রধান। বদৌনি

"আল্লাহো আক্‌বর" "দীন ইলাহির"—আকবরের নূতন ধর্ম্মমতের মূল সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এই শব্দ সমষ্টির অর্থ—"ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ"। অন্যপক্ষে অর্থ করিয়া বলিতে গেলে, ইহাতে "আকবরই শ্রেষ্ঠ" এইরূপ বুঝাইয়া থাকে। আবুল্‌ফজলের মতে আকবরসাহ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা তাঁহার অবতার-স্বরূপ। ইহার সমর্থনার্থে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা এই,—"ঈশ্বরের চক্ষে, কোন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিনায়কত্বই সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ। ঈশ্বর এই মহাজগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্—পার্থিব সম্রাটেরও সম্রাটস্বরূপ। তাঁহার নিয়মে, এই জগতের সমস্ত সৃষ্ট-বস্তুর মধ্যে ন্যায় ও শৃঙ্খলা চলিয়া থাকে। তাঁহার সৃজিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানবের মধ্যে ন্যায়শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পার্থিব সম্রাট-পদের সৃজন করিয়াছেন। * * * ঈশ্বরের অনুমোদিত আদর্শ-সম্রাটের চারিটী বিশেষত্ব চাই। প্রথম—উদার ও প্রশান্তচিত্ততা; দ্বিতীয়—ঈশ্বরের প্রতি দিন দিন বর্দ্ধিতমান ভক্তি; তৃতীয়—প্রার্থনা ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ; চতুর্থ—পুত্রবৎ বা আত্মবৎ প্রজাপালন। প্রথম গুণের কার্য্যকারিতা-শক্তির বলে সম্রাট্, অসন্তোষকর কোন বিষয় বা আকস্মিক কোন দুর্ঘটনায় চঞ্চলচিত্ত হইবেন না; কিম্বা প্রকৃষ্ট বিচারশক্তির অভাবে কোন বিশেষ কর্ম্মফল হইতে বঞ্চিত হইলে নিরাশা-পীড়িত হইবেন না। বিচার বিষয়ে তিনি ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধারণ করিবেন। দ্বিতীয়টীর বলে তিনি ভাবিবেন, তৎকৃত কার্য্যগুলি ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত। তিনি যাহা কিছু করেন তাহা ঈশ্বরের কৃত ও বিনিয়োজিত, অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাতে নিযুক্ত করিতেছেন, রাজা তাহাই করিতেছেন। এপ্রকার স্থলে তাঁহার কার্য্যে সাধারণের সহিত মতভেদজন্য কোন প্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাঁহার সেই কার্য্যের কোন হানি হইবে না। তৃতীয়টীর বলে তিনি জয়ে, পরাজয়ে, ঈশ্বরকে সমভাবে দেখিবেন। বিজয়োৎফুল্ল হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিবেন না। মনুষ্যের উপর কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিশ্বাস না করিয়া ঈশ্বরে করিবেন। বিচারশক্তির

আবুল্‌ফজলের শত্রু। তিনি একজন গোঁড়া সিয়া-সম্প্রদায়ী। আকবর বদৌনিকে কখনও বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখেন নাই। এপ্রকার স্থলে বদৌনির দ্বারা আকবরের চরিত্র-চিত্রণ-কার্য্য সম্পূর্ণরূপে অতিরঞ্জিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু এই বদৌনির লেখা হইতেই আবুল্‌ফজলের লিখিত বৃত্তান্তের সম্যক সমর্থন হয়।

দ্বারা ইচ্ছাসমূহ পরিচালিত করিবেন। চঞ্চল হইয়া কার্য্যহানি করিবেন না। যাহার অর্জ্জনে কোন ফল নাই, তজ্জন্য তিনি বৃথা সময়ক্ষেপ করিবেন না। তিনি ক্রোধ ও অবিমৃশ্যকারিতাকে দমন করিবেন। অত্যাচারীকে জ্ঞানের দ্বারা বশীভূত করিবেন। বিচারকালে তিনি বিচারক-স্বরূপ না হইয়া, বিচার-প্রার্থীর ন্যায় আপনাকে বোধ করিবেন। অর্থী প্রত্যর্থীদের বৃথা আশায় প্রলোভিত করিবেন না। সত্যবাক্য, কঠোরতা ও কর্কশতাপূর্ণ হইলেও তাহা গ্রহণ করিবেন। তিনি নিজে অত্যাচার করিবেন না বটে, কিন্তু তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইলে হইবে না। রাজ্যমধ্যে আর কেহ যাহাতে পরস্পরের উপর অত্যাচার না করে, এরূপ ব্যবস্থাও তাঁহার করা কর্ত্তব্য। * * * চতুর্থটী হইতে তিনি প্রেমে প্রজামণ্ডলীকে আবদ্ধ করিবেন। বিভিন্ন জাতি বা ধর্ম্মসংকুল প্রদেশ শাসনসময়ে বিশেষ সাবধান হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন। যাহাতে তাঁহার নিজকৃত কার্য্যে অথবা তাঁহার কর্ম্মচারীদের ব্যবহার-দোষে কোন প্রকার অযথা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হয়।”

আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—“ঈশ্বর স্বেচ্ছামতে মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানবিশিষ্ট করিয়া সৃজন করিয়াছেন। কাহাদেরও বা প্রজ্ঞা ও বিবেক-শক্তি খরতর তেজবিশিষ্ট, আবার কাহাদেরও তদ্বিপরীত। এই জন্যই ঈশ্বরের সৃষ্ট লোকপুঞ্জের মধ্যে “দীন্” ও “দুনিয়া” লইয়া পার্থক্য জন্মিয়া যায়। কেহবা “দীন্” অর্থাৎ ধর্ম্ম-পথ অবলম্বনে মুক্তিপথে চলিয়া যায়, আবার কেহবা “দুনিয়া” (সংসার) অবলম্বনে তদ্বিপরীত পথানুবর্ত্তী হয়। * * যখন সাধারণ মানবের সৌভাগ্যবশে এমন সময় উপস্থিত হয় যে, তাহার গুণে তাহারা সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে; তখন, তাহাদের দৃষ্টি তাহাদের সম্রাটের উপর পতিত হয়। সম্রাট্ তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ। সম্রাটের বুদ্ধি সাধারণ মানবের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ ও সর্ব্ব বিষয়ে প্রসারিণী। তিনি এই মর্ত্ত্য-ধামে, ঈশ্বরের প্রতিনিধি—ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রধান পরিচালক। তিনি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সাধারণ প্রজারও তদনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।” * *

আবুল্‌ফজলের উল্লিখিত উক্তিগুলি, সম্রাটের প্রতি একান্ত আনুরক্তি ও নির্ভরতাব্যঞ্জক হইলেও ইহাদের দ্বারা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, আকবরসাহ নূতন ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে কি প্রকার আদর্শ অধিনায়কত্বে উপনীত

হইয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে এ সম্বন্ধে অন্য কোন কথা না বলিয়া, কি প্রকারে আকবরের রাজত্বকালে মহম্মদীয় ধর্ম্মের পতন ও তাঁহার নিজ-উদ্ভাবিত ধর্ম্ম "দীন্-ইলাহির" সম্যক পরিপুষ্টি হইয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিব।

আকবরের মনুষ্যচরিত্রাংশ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা সর্ব্ব-প্রথমেই দেখিতে পাই, তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা সকল বিষয়ে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি-করণে সহায়তা করিয়াছে। বাল্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগের সময়ে—যে সময়ে অন্যান্য রাজপুত্রেরা পঠদ্দশায় বা ক্রীড়ামোদে আসক্ত হইয়া কালযাপন করেন, সেই সময়ে তিনি সৈন্যদল সঙ্গে, রণরঙ্গে জীবন কাটাইয়াছেন। তার পর, পিতার ক্ষীণ-হস্ত-স্খলিত, অদৃষ্ট-পরিবর্ত্তন-সূচিত, অপহৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সেই কোমল কিশোর বয়সে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও শোণিতক্ষয় করিতে হইয়াছে। যৌবনে, সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়াও তিনি নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। আত্মীয় ও সেনানায়কদিগের বিদ্রোহিতা তাঁহাকে যথেষ্টরূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এ সমস্ত অসুবিধা সত্বেও আবার বিজিগীষা-বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সমস্ত ভারতে দৃঢ়হস্তে স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সিংহাসনে বসিবার সময়, কোন প্রদেশেই তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূভাগে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়া যান।

হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্যক্রমেই, আকবরসাহ কৌশল করিয়া তাহাদিগের সহিত সাংসারিক-সম্বন্ধ স্থাপনে ও তৎসহায়তায় ভারতের সর্ব্বত্র বিজয়লক্ষ্মী লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এবং কার্য্যক্ষেত্রেও পরিচয় পাইয়াছিলেন যে, এই হিন্দুসংকুল ভাবতবর্ষে মুসলমানের তর-বারীর সহায়তায় রাজ্যমূল সুদৃঢ় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। হিন্দুর প্রিয় হইতে হইলে—হিন্দুর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইলে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাম্যনীতি প্রশস্ত পথ। বলদর্পিত শৌর্য্যবীর্য্যময় জাতীয় গৌরবের অনন্ত কেন্দ্রভূমি, সনাতনধর্ম্মের প্রধান পরিপোষক রাজপুত জাতি তখন ভারতের জ্বলন্ত গৌরব-স্বরূপ। রাজপুতের কেন্দ্রীভূত শক্তি, এক মুহূর্ত্তেই হয় তো সমস্ত মোগল-সাম্রাজ্যকে ক্ষণমাত্রেই বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু সকল রাজপুতই তো অম্বররাজের মত নহেন, সকলেই তো ভিন্নধর্ম্মী যবন-সম্রাটের করুণা-ভিখারী

হইতে ইচ্ছুক নন। নানাদিক ভাবিয়া আকবরসাহ, মিবারের মহারাণা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতাপন্ন রাজপুত মহারাজাগণের ও সামন্তবর্গের সহিত নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। কাহাকেও বা উচ্চপদ, কাহাকেও বা সেনাধিনায়কত্ব, কাহাকেও বা স্বাধীন ক্ষমতা প্রদান, আবার কাহাকেও বা সাংসারিক-বন্ধনে হস্তগত করিয়া নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করেন। এই দুর্ভেদ্য নীতির কূট-মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়াই—ভারতের দুর্ভাগ্যসূত্রে, বিহারীমল্ল, ভগবানদাস, মহারাজ মানসিংহ প্রভৃতি, মহাগৌরবময় আর্য্যনামকে যবন-সংস্পর্শে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন।

রাজ্য যখন সুদৃঢ় হইল, তাঁহার রণদুন্দুভির গভীর নির্ঘোষে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শত্রুগণ যখন মহাঝটিকা-মুখে তৃণ পত্রাদির ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন মহা-প্রতাপান্বিত আকবরসাহ, আর এক কঠোর দুঃসাধ্য বিষয়ে হস্তার্পণ করিলেন।

এই কঠোর ও দুঃসাধ্য বিষয় আর কিছুই নহে, প্রচলিত ধৰ্ম্মমত পরিবর্ত্তন। মহম্মদের মৃত্যুর পর, তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন বিজেতার অধিনায়কত্বে মরুপ্রান্তর হইতে শস্য-শ্যামলা, ফলজল-ধনরত্নাদি-পূর্ণা সনাতনধর্ম্মের পুণ্যক্ষেত্রে কতই না অত্যাচার, অনাচারের অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এই ধর্ম্ম-প্রসারণের ধূয়া ধরিয়াই ভারতের বহিঃশত্রুগণ, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ভারতে ক্রমাগত মুসলমান অধিকারের ফলস্বরূপ, এখানে একটী স্বতন্ত্র-গঠিত পরাক্রান্ত মুসলমানজাতি সংগঠিত হইয়াছিল। ভারতীয় মুসলমান সম্রাট্‌গণ ইহাদের অধিনায়কত্ব করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মের রক্ষক, পরিপালক ও পরিপোষক এবং মহম্মদের প্রধান কর্ম্মচারী ও ধর্ম্মপ্রচারার্থে উত্তরাধিকারীরূপে বিবেচিত হইতেন।

এই বর্দ্ধিতপ্রতাপ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক উভয়বিধ অধিনায়কত্বে মুসলমান সম্রাটদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। ইহার মধ্যে প্রথমটিতে তাঁহাদের স্বপরিচালিত স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিতেন। দ্বিতীয়টিতে তাঁহারা অত্রস্থ মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা ও ধর্ম্মজীবি কতকগুলি ব্যবস্থাপকের সহায়তার ফলভাগী হইতেন। এই সকল ধর্ম্মনৈতিক ব্যবস্থা-কারেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত বিভাগের সর্ব্বোতোমুখী অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া

বাদসাহকে তৎসম্বন্ধে সহায়তা করিতেন। বাহিরে প্রকাশ থাকিত, বাদসাহ রজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উভয় বিভাগেরই নির্ব্বাচিত অধিনায়ক। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবস্থাপক, মুসলমান ধর্ম্মাধ্যাপক বা "উল্‌মা"গণ এসম্বন্ধে যাহা কিছু ক্ষমতা নিজেদেরই হস্তে রাখিয়াছিলেন।

বাহির হইতে দেখিলে, তৎকালীন ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রোপজীবি সম্প্রদায় বলিয়া একটা আলাহিদা সম্প্রদায় ছিলনা, এইরূপই অনুভূত হয়। কিন্তু একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমরা ইহার বিপরীত অবস্থাই দেখিতে পাই। পূর্ব্ববর্ত্তী বাদসাহেরা সময়ে সময়ে একটি বিশেষ কৃতবিদ্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিৎ সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন। এই সম্পত্তিগুলির আয় হইতে বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতির ব্যয় সংকুলান হইত। প্রধান প্রধান মুসলমান পণ্ডিতগণ, কোরাণ ও তৎসম্বলিত শাস্ত্রোপদেশ সমূহ এই সকল বিদ্যালয়ে পাঠার্থী বালকদিগের নিকট প্রচার করিতেন। এতদ্ব্যতীত সমাজের কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধীয় তর্ক উঠিলে, তাহাও এই পণ্ডিতদিগের দ্বারা মীমাংসিত হইত।

সম্রাট্‌দিগের অনুগ্রহে সম্পত্তি-বৃদ্ধির সহিত, সাধারণের সহানুভূতির সহিত, বড় বড় আমীর ওমরাহ্‌দের পৃষ্ঠপোষকতায়, এই সমস্ত পণ্ডিত, প্রচুর সম্পত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাধারণ প্রজার উপর রাজ-নৈতিক-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্রাটের যেরূপ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ছিল, এই সকল পণ্ডিতের আবার অন্য পক্ষে সেই সমস্ত সাধারণ প্রজার উপর ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তদনুরূপ ক্ষমতাই পরিচালিত হইত। এ পর্য্যন্ত বাদসাহগণ, (অর্থাৎ হুমায়ূন পর্য্যন্ত), এই সকল পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তুআকবর সাহ এইবার বীর-বিক্রমে মনে মনে ইহাদের ক্ষমতা উচ্ছেদের কল্পনা করিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে এক দুরাশা জাগিয়া উঠিল যে, তিনি এই ধর্ম্ম-নৈতিক দল-পতিগণকে, ক্ষমতাভ্রষ্ট ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নিজ সাম্রাজ্যমধ্যে ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক উভয়বিধ ক্ষমতাই নিজহস্তে সংযত করিয়া রাখিবেন। কি প্রকার ঘটনাসূত্রে এই "উল্‌মা" পণ্ডিতদিগের মহাপতন সুচিত হইয়াছিল ও সেই মহাপতনের ভিত্তির উপর আকবরের নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, তাহাই ইহার পরে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহরিসাধন শর্ম্মা।

"ওঁ যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব"

স্বর্গের সপ্ত দ্বার।

(১)

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখায় স্বর্গ লাভের পর পর সাতটি দ্বার বর্ণিত হইয়াছে। একটির পরে একটি, ক্রমে সপ্তদ্বার অতিক্রম করিলে স্বর্গপুরী লাভ করা যায়। বলা বাহুল্য, স্বর্গ ও সুখ একার্থ শব্দ এবং পুরদ্বার হইতেই পুরীর আরম্ভ স্বীকার্য্য হইয়া থাকে।

প্রথম দ্বার আশা—

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন,—"কোন দ্রব্যাদির লাভ সম্বন্ধে (অদ্য, কল্য বা কিছুদিনে নিশ্চয় হইবে ভাবিয়া) কালপ্রতীক্ষারূপ তৃষ্ণাবিশেষকে আশা কহে। সেই আশা দ্বিবিধা—অনৃতা ও সত্যা। ফলশূন্যা আশাকে অনৃতা কহে অর্থাৎ মিথ্যা, তদ্বিপরীতা অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবি-ফলাই সত্যা।" বৈদিক যাগানুষ্ঠানের যোগ্য শুভ ফলের আশা অবশ্যই সত্যা। সেই সত্য আশাকেই মূর্ত্তিমতী করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এই আখ্যায়িকাটি রচিত হইয়াছে—

(১) "তমাশাব্রবীৎ প্রজাপত আশয়া বৈ শ্রাম্যসি অহ মু বা আশাস্মি মাং যজস্ব অথ তে সত্যাশা ভবিষ্যতি অনু স্বর্গং লোকং বেৎস্যসীতি" ইত্যাদি।

অর্থ—আশা তাঁহাকে বলিলেন,—হে প্রজাপতি! তুমি আশা করিয়া করিয়া শ্রান্ত হইয়াছ; এই আমি আশা; আমাকেই যজন কর, অনন্তর (এইবার) তোমায় সত্যাশা হইবে; ক্রমে স্বর্গলোক লাভ করিবে।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া দেখিয়া যাঁহারা সর্ব্বদা ঔষধাদি ক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট উল্লিখিতরূপ লিপিভঙ্গী নূতন নহে এবং দুরারোগ্য রোগাদি বিবিধ যন্ত্রণার মধ্যেও এই আশাই যে কিছুক্ষণ তাঁহাদিগকে স্বর্গভোগ করায় বা তাঁহাদিগের নিকট স্বর্গদ্বাররূপে প্রতীত হয়, ইহাও সর্ব্ববিদিত।

সায়ণাচার্য্যের মতে আশা দ্বিবিধা হইলেও আমরা "দুরাশা" নামে আর এক প্রকার আশা দেখিতে পাই। অযোগ্য আশাকেই দুরাশা কহে। ইহা যদিও মিথ্যাশার অন্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যাশা ও দুরাশা অভিন্না নহে। কেন না, যোগ্য আশাও সময়ে সময়ে ফলশূন্য হইয়া থাকে। যথা—

"মনো বভূবেন্দুমতীনিরাশম্ (রঘু ৬। ২)"

"রাঘবো রথমপ্রাপ্তাং তামাশাঞ্চ সুরদ্বিষাম্ (রঘু ১২। ৯৬)"

এতদুভয়ই মিথ্যাশার উদাহরণ হইতে পারে কিন্তু দুরাশা নহে। দুরাশা যথা মহাভারতের শল্য পর্ব্বে—

"আশা বলবতী রাজন্! শল্যো জেষ্যতি পাণ্ডবান্"

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে স্থলদ্বয়ে আছে—

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ; অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি"(২।৪।২ এবং ৪।৫।৩)

অর্থ—সেই মৈত্রেয়ী (যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতর পত্নী) বলিলেন,—ভগবন্! বিত্তপূর্ণা এই সমগ্র পৃথিবী যদি আমার হয়, তাহাতে আমি অমৃতা হইতে পারি কি না? (এতদুত্তরে) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—না; তাহাতে সাধারণ সাধনবিশিষ্ট-দের যেরূপ সুখ-পূর্ণ জীবিত, তোমারও জীবিত সেইরূপই হইতে পারে;—বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব (কৈবল্য) লাভের আশা নাই।

ইহাও দুরাশারই উদাহরণ হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যাশাও বটে। বস্তুত মিথ্যাশাই দ্বিবিধা; নিষ্ফলাশা ও দুরাশা। এই মিথ্যাশাই "আশাপিশাচী" প্রভৃতি নিন্দিত ভাবে অভিহিতা হইয়া থাকে। যথা পঞ্চতন্ত্রে—

"সর্ব্বোঽপি জনোঽশ্রদ্ধেয়া মাশাপিশাচিকাং প্রাপ্য হাস্যপদবীং যাতি"

অযোগ্য আশারূপ দুরাশাকে ত আশাপিশাচী বলাই যাইতে পারে, যোগ্য আশাও কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হইলে নিষ্ফলা হইয়া আশাপিশাচী হইয়া পড়ে। আশাপিশাচী, পিশাচীরূপে নিন্দাযোগ্যা হইলেও কিছুক্ষণের জন্য সুখদায়িনী, অতএব স্বর্গের দ্বাররূপ গণনীয়া হইতে পারে। সংসারী জীবমাত্রেই আশাবলম্বী। যিনি যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন না কেন, চিরসঙ্গিনী আশাই তাঁহার তাহাতে প্রবর্ত্তক ও প্রধান অবলম্বন। সে আশা পরে যদিও দুরাশা বা নিষ্ফলা রূপে পরিচিতা হইতে পারে, কিন্তু প্রথমে উহাই যে স্বর্গভোগ করায় তাহাতে সন্দেহ নাই;—যদি সে সত্যাশা হয়, তবে ত কথাই নাই।

সাংখ্যশাস্ত্রীয় ষষ্টিতন্ত্রকারিকার ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্র বুঝাইয়াছেন,—"চক্ষুরাদির বিষয় যে রূপাদি, যথাসময়ে তাহাদের একতমের অলাভেও দুঃখ

সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাদের একতমের লাভেও সময়ে সময়ে সুখ বোধ হয়।” সেই লাভ করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমেই আশা দেবীর উপাসনা করিতে হয়। আশা দেবীর তাবৎ উপাসকই যে প্রকৃত স্বর্গ লাভ করেন, তাহা নহে, কিন্তু সকলেই স্বর্গের দ্বার দর্শন করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও সত্য, যে, আশা দেবীর শরণাগত না হইয়া, কেহ কখন কোনরূপ স্বর্গ লাভ করিতে পারেন না; যিনি যখন যে কোন উপায়ে যে কোনরূপ স্বর্গ ইচ্ছা করুন না কেন, সকলকেই সর্ব্বপ্রথমে আশার নিকটে নতশির হইতে হইবে এবং ক্রমে আরও ছয়টি দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রকৃত স্বর্গ লাভ করিতে সমর্থ হউন বা নাই হউন, প্রথম দ্বারের ফললাভে বঞ্চিত হইবেন না।

আশাই আমাদের জীবনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রুতিতে আছে—

“আনন্দেন জাতানি জীবন্তি” (তৈ০ উপ০ ৩।৬)

অর্থ—জাত প্রাণিমাত্রেই আনন্দে জীবিত থাকে।

কৃমি কীট পর্য্যন্তের বিচরণাদি-জন্য একরূপ আনন্দ আছেই এবং তাহারা বুঝুক বা নাই বুঝুক, সেই আনন্দটুকু ভোগের নিমিত্তই তাদৃশ নিকৃষ্ট শরীরও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, প্রত্যুত সর্ব্বদা যথাসাধ্য রক্ষা করিবারই চেষ্টা করিয়া থাকে; আশাই যে, সে আনন্দের বীজ, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

অধিক কি, যদি আশানামক কোন পদার্থ এ জগতে না থাকিত, তাহাহইলে আমাদের জন্মলাভও অসম্ভব হইত। শ্রুতিতে ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছে যে, বাসনাই জীবের জন্মহেতু। বলা বাহুল্য যে, আশা ভিন্ন বাসনা হয় না। এ সমস্ত ভাবিলে স্পষ্টই জানাযায় যে, আশাই আমাদের জীবনের জীবাতু, আশাই আমাদের প্রধান সম্বল, আশাই আমাদের স্বর্গলাভের প্রথম দ্বার, কাজেই আমাদের বড় আদরের ধন। সেই জন্যই ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—

“অমৃতত্ত্বং দেবভ্যঃ * * *, স্বধাং পিতৃভ্যঃ,
আশাং মনুষ্যেভ্যঃ, তৃণোদকং পশুভ্যঃ” ইত্যাদি। (৪।২২।২)

এতৎপাঠে জানা যায়, মনুষ্যগণকে অনেক সময়ে অনেক অবস্থাতেই আশাদান অতীব কর্ত্তব্য। এপ্রকার কতকগুলি রোগ আছে, যাহাতে বিশেষ আশাদান ব্যতীত চিকিৎসাই চলে না; এমন কি জীবনের আশাদানই তাহার প্রধান চিকিৎসা।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং" উপদেশ অনাসঙ্গ হইবার জন্য। অনাসঙ্গ হওয়া আশাভঙ্গের ক্লেশ নিবারণের জন্য। হিতোপদেশের "যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্য মবলম্বিতম্" প্রভৃতি উপদেশও সেই অভিপ্রায়ে। বস্তুত বেদে আশাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করিতেও অত্যুক্তি-ভয়ে ভীত বা কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যথা—

"য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আশয়াস্য সর্ব্বে কামাঃ সমৃদ্ধ্যন্তি"

(ছান্দো০ উপ০ ৭। ১৪। ২)

অর্থ—যে আশাকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করে, তাহার আশা দ্বারা সর্ব্ব-কামনা সমৃদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধ হয়।

স্বর্গধামে প্রবেশের প্রথম তোরণরূপ আশা হইতেই আশীঃ। অতএব শ্রুতি বলিতেছেন—

"অমোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি" (ছন্দো০ উপ০ ৭।১৪।২)

অর্থ—যে আশাকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করে, তাহার পক্ষে সকল আশী-র্ব্বাদই অব্যর্থ হয়।

আশীর্ব্বাদই আমাদের প্রধান অবলম্বন॥

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

হরিবোল।

সুন্দর সৌধ অট্টালিকায় বাস, স্বর্ণপাত্রে ভোজন, দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন, অতুল ধনরত্ন অকাতরে দান, কিছুতেই সেই "শেষের সে দিন" নিবারণ হয় না। "পঞ্চভূতময় দেহ পঞ্চভূতে মিশে যাবে" একথা চিরদিনই সত্য—চিরদিনই সার।

আমি ভিখারী, দিন আনি দিন খাই, কখন একবেলা আহার জুটে, কখনও জুটে না। আর তুমি দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকায় বাস কর, স্বর্ণ বা রৌপ্যপাত্রে ভোজন কর, পৃথিবীর যত কিছু সার বস্তু নিত্য তোমার উদরস্থ হয়, সংসারের কোন বস্তুরই অভাব তোমার নাই। জগতের সকলেই মনে

করে যে, তুমি খুব সুখী। কিন্তু হায়! তোমার "শেষের সে দিনে" যে "হরিবোল" আমারও সেই "হরিবোল"।

একটী গল্প মনে পড়িল। কোন দেশে একজন রাজার শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। গ্রহাচার্য্য বিপ্র পণ্ডিতগণে ভূত-ভবিষ্যৎ তিথি-নক্ষত্র ধরিয়া ঠিকুযি কোষ্ঠী লিখিয়া দিলেন। মহা ধূমধামে, মহা সমারোহে সকল কার্য্য সমাধা হইল। আর ঠিক সেই লগ্নে, ঠিক সেই সময়ে, সেই মুহূর্ত্তে রাজ্ঞীর এক পরিচারিকার একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উভয়েই এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিল শুনিয়া মহারাজ সেই দাসী পুত্রেরও ভূতভবিষ্যৎ ভাগ্য-ফলাফলের গণনার ভার পণ্ডিতগণের হস্তে প্রদান করিলেন। গণনায় রাজপুত্রের ভাগ্য-ফলাফল, দাসীপুত্রের সহিত সমস্তই মিলিল—বিন্দুমাত্র প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হইল না।

ক্রমে দাসীপুত্র ও রাজপুত্র উভয়েই বাড়িতে লাগিল। উভয়েই যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিল। একদিন উভয়ের ভাগ্য-ফলাফল মিলাইয়া দেখা হইল যে, সেই দিন উভয়ের ভাগ্যে "ধনলাভ" লিখিত আছে। নৃপতি উভয়ের ভাগ্যে কিরূপ "ধনলাভ" হয়, তাহা দেখিবার জন্য ব্যস্ত রহিলেন। রাজপুত্রের সেই দিন মাতামহের মৃত্যু হওয়াতে একটী ভিন্ন রাজ্যের অধিকারী হইলেন, আর দাসীপুত্র রাস্তায় খেলিতে খেলিতে একটী স্বর্ণমুদ্রা কুড়াইয়া পাইল। নৃপতি তচ্ছ্রবণে আশ্চর্য্য হইলেন। ভাগ্যফল উভয়েরই মিলিল বটে—"ধনলাভ" উভয়েরই হইল সত্য—কিন্তু, একজন একটী রাজ্যের অধিকারী হইলেন আর একজন একটী স্বর্ণমুদ্রামাত্র পাইল।

আর একদিন দেখা হইল, উভয়ের অদৃষ্টে "রক্তপাত" লিখিত আছে। রাজপুত্র অস্ত্রশিক্ষা করিতেছিলেন, সহসা তরবারির আঘাতে তাঁহার অঙ্গুলির এক স্থানে সামান্য কাটিয়া গেল। দাসীপুত্র কাট কাটিতেছিল, কুঠারের আঘাতে, তাহার একটী পদ জন্মের মত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। আশ্চর্য্য বিধাতার লীলা! উভয়ের ভাগ্যের ফলাফল এক, কিন্তু হীনত্ব ও গুরুত্ববোধে তাহার ফল স্বতন্ত্র। দাসীপুত্রের অদৃষ্টে "ধনলাভ" একটী স্বর্ণমুদ্রা মাত্র, আর রাজপুত্রের একটী সাম্রাজ্যলাভ। অদৃষ্ট উভয়েরই সমান, কিন্তু পৃথিবীতে অবস্থাভেদে তাহার কত তারতম্য!

কিন্তু "শেষের সে দিনে" উভয়েরই সেই "হরিবোলে" জীবলীলার অবসান। সে বিষয়ে আর তারতম্য নাই।

ধনবান পিতামাতা কত কষ্টে, কত যত্নে, ননীর পুতলি সন্তানকে মানুষ করিলেন। সে বড় হইল, বিদ্যোপার্জ্জন করিল, হয় তো সমাজের একজন প্রধান নেতা হইয়া "স্বনামোপুরুষোধন্য" বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু তারও যে দশা, আর একজন দরিদ্র, মূর্খ, মহাপাতকী তারও সেই দশা। অন্তকালে তারও সেই "হরিবোল" আর এরও সেই "হরিবোল"।

তোমার সহিত আমার ভীষণ শত্রুতা, তোমায় আমায় সর্ব্ব সময়ে সকল কার্য্যে চির বৈরীভাব, তুমি আমার ভাল দেখিতে পার না, আমি তোমার ভাল দেখিতে পারি না। তোমার উন্নতি হইলে আমার হিংসা হয়, আমার সৌভাগ্য সন্দর্শনে তুমি ঈর্ষায় প্রজ্বলিত হও। তোমায় আমায় সকল বিষয়ে, সকল সময়ে, সকল কার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তোমার যে দশা, আমারও সেই দশা। অন্তকালে তোমারও "হরিনাম"মাত্র সম্বল, আমারও তাই। মাঝে দিন কয়েকের জন্য তোমার এবং আমার কার্য্যকলাপ বিভিন্ন মাত্র।

জগতের ক্ষুদ্র কুটাণুকীট আমি, আমার আশা নাই, উৎসাহ নাই, উন্নতির পথ নাই, দশজনের কাছে পরিচয় দিবার বা প্রশংসনীয় হইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তুমি হয় তো বাল্যকাল হইতেই সুখের সাগরে ভাসিয়া, যৌবনে ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে; সুযশ সুখ্যাতি লইয়া জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ অতিবাহিত করিলে, তোমাকে একদিনেও কোন বিষয়ের জন্য ভাবিতে হইল না, চিন্তা কি তুমি তাহা জানিতেই পারিলে না; আর আমি হয় তো দিনান্তে এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাতরভাবে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলাম, সংসারের কত অত্যাচার সহ্য করিলাম, কত লোকের কাছে বিশ্বাসের কার্য্য করিয়াও অবিশ্বাসী হইলাম—কিন্তু "শেষের সে দিনে" তোমার যে দশা আমারও সেই দশা। তোমাকেও পুত্রকলত্র ও পরিজনেরা সেই "হরিবোল" দিয়া বিদায় করিল, আমারও সেই অবস্থা ঘটিল। সংসারের লীলাখেলায় তোমায় আমায় সামান্য কয়দিনের জন্য অনেক প্রভেদ ঘটিল বটে, কিন্তু শেষে সেই পঞ্চভূতময় দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল। দেহ পড়িয়া রহিল, আত্মা লইয়া সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের কাছে বিচার চলিতে লাগিল। তুমি ধনী,

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত থাকিয়া হয় তো কত পাপকার্য্য করিয়াছিলে, কত অনাথের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে, তুমি তাহার ফলভোগের জন্য অনন্ত নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে; আর আমি দীনহীন ভিখারীর ন্যায় চিরজীবন অন্নচিন্তায় মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া, জীবনের মধ্যে বিন্দুমাত্র পাপকার্য্য না করিয়া, হয় তো দুর্ব্বহ জীবনের অবসান করিলাম—আমার, তোমার অপেক্ষা সুগতি হইল। সেই অনন্তরাজ্যে ভগবানের বিচারে হয় তো আমি তোমা অপেক্ষা অনেক উন্নত হইলাম। তোমায় আমায় যতটা প্রভেদ এখানে, সেখানে গেলে আর ততটা প্রভেদ থাকিবে না। তাই এক এক বার মনে হয়, সেই "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" আর "হরিবোল" কথাটা তোমার কর্ণমূলে ঢালিয়া দিই; তাতে যদি তোমার চৈতন্য হয়, তাতে যদি তোমার মনের গতি ফিরে, তাতে যদি তুমি আমার সুখ দুঃখের সমভাগী হও।

সংসারে বাসনা বড় প্রবল। কিন্তু এই বাসনাই বিড়ম্বনা। অনিত্য সংসারে ছার বাসনা লইয়াই আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছি। যার যত আছে, তার মনে ততোধিক বাসনা। বাসনা আর মিটে না, সাধ আর পূরে না, কামনার আর শেষ হয় না। যত পাই, তত চাই, কিন্তু শেষে ঐ "হরিবোল" ভিন্ন আর কিছুই সঙ্গে যায় না।

অনেক দুঃখে এইজন্য একদিন এক জন স্বভাব-কবি এক মৃতা সুন্দরী রমণীর কমনীয় দেহ গঙ্গা-বক্ষে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কে তুমি গো চিৎ হয়ে ভাস্‌ছো নদীর জলে?
　　(জলের মধ্যস্থলে)
আমার মাথা খাও, কথা ক'ও, হাসির লহর তুলে,
　　(তা কি গিয়েছ ভুলে?)
আয়না, ফিতে, চিরুণ ডুরি, যাচ্চে পড়ে গড়াগড়ি,
এখন যাচ্চ কোথায় তাড়াতাড়ি, এলো থেলো চুলে?
　　(ঢেউয়ের সঙ্গে দুলে)
বিধুমুখে মৃদু হাসি, গলায় দিতে প্রেমের ফাঁসী,
এখন ছেড়ে দিয়ে হাসি খুসী, মুখ ভারী করিলে,
　　(কেন, কি ভাবিলে?)

যে রূপের ও রূপসী, গরব কর্‌তে দিবানিশি,
এখন কোথায় গেল তোমার রূপরাশি
(ঢাক হয়েছ ফুলে)
(যা'বে দুদিনে গলে)
তোমায় দেখে সুখী হলেম, এই উপদেশ পেলেম,
আহা ! সংসারের কি এই পরিণাম ?
(কালের অদ্ভুত লীলে)
(তুমি দেখিয়ে গেলে)।"

আর একদিন কোন বাটীর কর্ত্তার শব সন্দর্শনে কবি গাহিয়াছিলেন,—

"বাড়ীর কর্ত্তা আজ যাচ্চ কোথায় এ অপূর্ব্ব বেশে ?
তোমায় কে বেঁধেছে চট্ দড়ীতে লম্বা বাঁশে কসে।
একবার নয়ন মেলে দেখ তাই,
কি আদরে যাচ্চরে ভাই,
তোমায়, গোবর ছড়ায়, কর্‌ছে বিদায়, ঘরের গিন্নী এসে।
পথের সম্বল অষ্ট কড়া,
মেটে কল্‌সী মাল্‌সা সরা,
এই যে সাজিয়ে দিয়েছে এরা, তোমারই উদ্দেশে।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে,
যা' কিছু উপায় করিলে,
আহা একটি পয়সাও পেটে না খেলে, ফুরাবে তরাসে।
ব্যয়ের মধ্যে সোণা কেনা,
স্বর্ণকারের শুধ্‌লে দেনা,
তুমি দান করিলে অনেক গয়না, গৃহিণীর সন্তোষে।
সাধুসেবা না করিলে,
চিরদিন পুঁজী বাঁধিলে,
আজ তা'র কি সঙ্গে নিলে, ওরে সর্ব্বনেশে।
ছলে বলে কি কৌশলে,
পরের ধন যা' হরেছিলে,

আজ কেন ভাই যাচ্চ ফেলে, নেওনা ট্যাঁকে কসে।
তোমায় মিছে দুষী ভাই,
তুমিও যা আমিও তাই,
ওহে, আমার হবে ঐ দশাই, পাগল বলে হেসে॥”

তাই বলি এ অনিত্য-সংসারে কেহ কিছু লইয়া আসে না, কেহ কিছু লইয়া যাইতে পারে না। উঁচু নীচু ভেদাভেদ সকলই বৃথা। অর্থ, মান, সুযশ, সুখ্যাতি, পরকালের কোন কায করে না, বরং সময়ে সময়ে মায়ামোহে জড়িত করিয়া অনিষ্ট সাধন করে।

চক্ষের উপর যাহা দেখিতে পাই, তাহা কেন বুঝিতে পারি না, জানি না। শ্মশানে বেড়াইতে যাও—মন উদাস হইয়া যাইবে, আর গৃহে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিবে না, প্রিয়বস্তু আর ভাল লাগিবে না, সবই অনিত্য বলিয়া বোধ হইবে, সেই “হরিবোল”-রবে প্রাণ উদাস হইয়া যাইবে, কিন্তু একবার ফিরিয়া আসিলেই, আবার সে সব মতিগতি আর এক প্রকার আকার ধারণ করিবে। স্বর্গীয় লালাবাবু “বেলা যে গেল” শুনিয়া, অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, আর একজন ঘোর মহাপাতকী একদিন বলিয়াছিল,—“পাপকার্য্য কি আর আমি করি, আমায় ভগবান্ যা করান আমি তাই করি। ‘ত্বয়া হৃষীকেশেন হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি’। আমি যে পরের দ্রব্য হরণ করি, সে ভগবান আমায় করান তাই করি। আমি যে মাদকদ্রব্য সেবন করি, সে ভগবান আমায় সেবন করান তাই করি।”

এই দুইজনের উক্তিতে কত প্রভেদ। একজনের মনের ভাব কত উচ্চ, আর একজনের কত হীন। কিন্তু শেষের সে দিনে দুইজনের ভাগ্যে সেই “হরিবোল” ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

এ “হরিবোল” আমরা জীবনের লীলাখেলায় একবারও করিনা কেন?

শ্রী——

জিজ্ঞাসা।

[কলিকাতাবাসী একজন গ্রাহক নিম্নলিখিত প্রশ্নটি পাঠাইয়াছেন। আমরা সাদরে ইহা প্রকাশিত করিলাম। সাধারণের মধ্যে এরূপ বিষয়ের যত আলোচনা হয়, ততই ভাল। যিনি অনুগ্রহ করিয়া এ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া আমাদিগের উত্তরের সহিত প্রকাশিত হইবে।—
পুরোহিত সম্পাদক]

* * * * *

পঞ্জিকাতে এক এক তিথিতে এক এক রকম দ্রব্য ব্যবহার করিবার নিষেধ দেখা যায়। যথা,—

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা—স্ত্রী, তৈল, মৎস্য ও মাংস। প্রতিপদ—কুষ্মাণ্ড ;দ্বিতীয়া—বৃহতী ; তৃতীয়া—পটোল ; চতুর্থী—মূলক ; পঞ্চমী—বিল্ব ; ষষ্ঠী—নিম্ব ; সপ্তমী—তাল ; নারিকেল ; নবমী—অলাবু ; দশমী—কলম্বী ; একাদশী—শিম্বী ; দ্বাদশী—পূতিকা ; ত্রয়োদশী—বার্ত্তাকু ; চতুর্দ্দশী—মাসকলাই।

আমরা বালককাল হইতে পঞ্জিকার এই নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া ও দেখিয়া আসিতেছি; কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝি না। পঞ্জিকাকারগণের নিষেধাজ্ঞা শাস্ত্রসম্মত কি না, তাহাও ঠিক জানি না। যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তাহা হইলে কোন্ শাস্ত্রসম্মত তাহাও অবগত নহি। যাঁহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, তাঁহারা এই সকল নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলেন, কিন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার ব্যবহারে তত নিষ্ঠাবান্ নহেন, তাঁহারা অবশ্য এ সকল মানিয়া চলেন না। আজিও দেশে লক্ষ লক্ষ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু রহিয়াছেন। সুতরাং কতকগুলি লোকে না মানিলেও সাধারণ হিন্দুগণের নিকট এ সকল আজ্ঞা পালনীয়। আমরা আজ্ঞাপালন করি বটে, কিন্তু নিতান্ত অন্ধ হইয়া তাহা পালন করি।

হিন্দুশাস্ত্রে যত বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহার সমুদয়গুলিই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে সবগুলি আমরা বুঝিতে পারি না, ইহার কারণ আমাদিগের অজ্ঞতা। পঞ্জিকার উপরোক্ত নিষেধ বাক্য কোন্ যুক্তির অনুমত, তাহা জানিতে পারিলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা। অতএব, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার জিজ্ঞাসাটি প্রকাশিত করিয়া এবং ইহার উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি না, যদি থাকে, তাহা কি? ইহাই জিজ্ঞাস্য।

শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
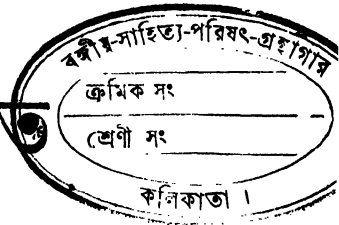
মাসিকপত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ } ১৩০০ সাল, মাঘ। { তৃতীয় সংখ্যা।

তারা-মা।

(বোধন)

হৃদ্‌বিল্বমূলে নিহিতোঽতিযত্নাৎ
জীবো ঘটো ভক্তিজলেন পূর্ণঃ।
হে মাতরানন্দময়ি! ত্বমেহি
বীক্ষে শ্মশানং সকলং বিনা ত্বাং॥ ১॥

হৃদি-বিল্বতরু-মূলে অতি যত্ন করি'
পাতিয়াছি আত্মা-ঘট ভক্তি-জলে ভরি';
কর মা আনন্দময়ি! ঘটে অধিষ্ঠান,
তোমা বিনা হেরি আমি সকলি শ্মশান। ১।

অহং তনীয়াংস্ত্বমনন্তমূর্ত্তিঃ
সমস্তবিশ্বেঽপি ন মানমেষি।
বিম্বেন সূর্য্যো জলবিন্দুমধ্যে
যথা তথা মে হৃদয়ে বিশ ত্বং॥ ২॥

বিন্দু আমি, সিন্ধু তুমি— অসীম অপার,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে স্থান না হয় তোমার;
বিন্দু-জলে বিম্বরূপে প্রবেশে ভাস্কর,
তেমতি প্রবেশ তুমি আমার ভিতর। ২।

সংসারপুষ্পস্য রসং বিষাক্তং
পীত্বা বিমূঢ়ো মম জীবভৃঙ্গঃ।
হে চেতনাদায়িনি! চেতয় ত্বং
স্বপাদপদ্মস্য সুধাং প্রদায় ॥ ৩ ॥

বিষময় সংসার-পুষ্পের মধু পিয়া
জীব-ভৃঙ্গ আছে মোর মূর্চ্ছিত হইয়া;
চেতনাদায়িনি! গো মা! করহ সজ্ঞান,
পদ-কমলের সুধা করিয়া প্রদান। ৩।

স্থিতামপি ব্যাপ্য চরাচরং ত্বাং
পশ্যামি নৈবান্ধতয়া বতাহং।
চক্ষুঃ সমুন্মীলয় সারদে! মে
ত্বাং জন্ম দৃষ্ট্বা সফলং করোমি ॥ ৪ ॥

সর্ব্বময়ী তুমি গো মা! আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
তবু হায়! অন্ধ আমি দেখিতে না পাই;
হে সারদা! জ্ঞান-চক্ষু দাও ফুটাইয়া,
জনম সফল করি তোমারে হেরিয়া। ৪।

বীক্ষে তমোন্ধো নহি যদ্যপি ত্বাং
তথাপি তারে! মুহুরাহ্বয়ামি।
মামেতি শশ্বৎ তনয়ং রুদন্তং
ক্রোড়ে কিমঙ্কং ন করোতি মাতা ॥ ৫ ॥

যদিও মোহান্ধ আমি দেখিতে না পাই,
তথাপি তোমারে তারা! ডাকি মা! সদাই;
অন্ধ ছেলে মা-মা বোলে ডাকিলে কাতরে,
অন্ধ বোলে মা কি তারে কোলে নাহি করে?। ৫।

অকিঞ্চনোঽহং বত দীনমাতঃ!
দাস্যামি কিংবা চরণে ত্বদীয়ে।
দীনস্য মে কেবলমশ্রু সারং
তদেব নিত্যং চরণেঽর্পয়ামি॥ ৬॥

হা দীনজননি তারা! আমি অকিঞ্চন,
কি দিয়া পূজিব গো মা! তোমার চরণ?
একমাত্র নেত্রজল দীনের সম্বল,
তব পদে ঢালি আমি তাহাই কেবল। ৬।

(জীব-প্রবোধন)

ভ্রান্ত্বাঽসি খিন্নো বিষয়াটবৌ কিং
তারেতি নামাক্ষরমেব জল্প।
রে জীব!　বীতাময়শোকমৃত্যুঃ
গন্তাসি ধামামৃতমেব তূর্ণম্॥ ৭॥

বিষয়-অরণ্যে কেন ঘুরে হও সারা?
সঘনে বল রে! জীব! তারা-তারা-তারা;
শোক তাপ দূরে যাবে পলাবে শমন,
অচিরে আনন্দধামে করিবে গমন। ৭।

ফলং যদি স্যাদপি লোভনীয়ং
সর্পক্ষতং কাঙ্ক্ষতি কোঽপি কিং তৎ।
রে জীব!　বৈবস্বতভোগিদষ্টে
ভবে তদা কিং মমতাং করোষি॥ ৮॥

হলেও সুন্দর ফল, সর্পে যদি খায়,
সে বিষাক্ত ফল আর কে লইতে চায়?
কালরূপী সর্পে যারে করেছে দংশন,
সে সংসারে ওরে জীব! কেন আকিঞ্চন?। ৮।

যথাহি মূষস্য বিলং ভুজঙ্গঃ
কায়ে কৃতান্তঃ প্রবিশত্যলক্ষ্যং।
মা দেহগেহে ভজ জীব! নিদ্রাং
তারাপদং সংশ্রয় শীঘ্রমেব॥ ৯॥

মূষিক-বিবরে সর্প প্রবেশে যেমন,
অলক্ষিত আসে কাল এ দেহে তেমন;
রে জীব! এ দেহ-ঘরে ঘুমা'ও না আর,
অভয় চরণ শীঘ্র ধর তারা-মার। ৯।

সদা রুজার্ত্তিজ্বলিতে কিলৈকং
'মা'-নাম শান্তির্হতজীবিতেহস্মিন্।
রে জীব! তদ্বিস্মৃতিরেব যাবৎ
পাতোহপি তাবৎ জ্বলদগ্নিকুণ্ডে ১০

এ জীবন রোগে শোকে সদা দহ্যমান,
'মা'-নাম কেবলমাত্র জুড়াবার স্থান;
রে জীব! 'মা'-নাম তুমি ভুলিবে যখনি,
জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে পড়িবে তখনি। ১০।

রে জীব! পাপীতি বিভেষি কিং ত্বং
তারাপদং ভীতিহরং ভজস্ব।
তস্যৈব যো ধারয়তে রুদংস্তৎ
দয়াময়ী মার্ষ্টি করেণ বাষ্পম্॥ ১১॥

পাপী বোলে ভয় তুমি কর কি কারণ?
ধর জীব! তারা-মার অভয় চরণ;
মা-মা বোলে কেঁদে কেঁদে যে পড়ে সে পায়,
দয়াময়ী তারি অশ্রু স্বহস্তে মুছায়। ১১।

এহ্যেহি রে পুত্রক! মাতুরঙ্কে
তারৈবমাকারয়তে শৃণু ত্বং।
সংসারলীলাং পরিহৃত্য দূরে
ক্রোড়ে দ্রুতং গচ্ছ জগজ্জনন্যাঃ॥ ১২॥

"আয় রে মায়ের বাছা! মার কোলে আয়!"—
ওই শুন! তারা কত ডাকিছে তোমায়;
রে জীব! এ ভব-লীলা দূরে পরিহরি,
জগজ্জননী-কোলে চল ত্বরা করি। ১২।

তারানামসুরোন্মত্তঃ কদা ধাবন্ মহাবনে।
প্রেয়সীতি হৃদা ব্যাঘ্রীং ব্যালীং বা ধারয়াম্যহম্॥ ১৩॥

তারা-নাম-সুরা-পানে উন্মত্ত হইয়া,
কবে আমি ঘোর বনে যাইব ধাইয়া?
সাপিনী বাঘিনী বনে করি দরশন;
প্রেয়সী বলিয়া বক্ষে করিব ধারণ!। ১৩।

নার্য্যো নরা হে পশুপক্ষিকীটাঃ!
প্রেমোন্মদা বিস্মৃতসর্ব্বভেদাঃ।
পরস্পরালিঙ্গিতকণ্ঠদেশাঃ
তারেতি সর্ব্বে সমমীরয়ধ্বম্॥ ১৪॥

নর নারী পশু পক্ষী কীটাদি সকলে,
ভেদাভেদ ভুলি সবে এস! কুতূহলে;
গলাগলি করি মোরা মিলি এক ঠাঁই,
এক প্রাণে এক তানে তারা-নাম গাই। ১৪।

তারা ন মাতা মম বা পরং তে
সা বিশ্বমাতা বয়মেকমূলাঃ।
ততঃ কথং ভিন্নপথং ভজামঃ
সম্ভূয় সর্ব্বে জননীং ব্রজামঃ ॥ ১৫ ॥

তারা তো আমারি নয় অথবা তোমারি,
তোমার আমার সে যে জননী সবারি;
তবে কেন ভাই ভাই থাকি ঠাঁই ঠাঁই ?
সবে মিলি' এস ! সেই মার কোলে যাই। ১৫।

আয়ান্তু মূর্খবুধপাতকিপুণ্যবন্তঃ
চণ্ডালবিপ্রধনহীনসমৃদ্ধিমন্তঃ।
নানাদরো নচ ভয়ং নহি তত্র লজ্জা
সর্ব্বে সমাধিকৃতয়ঃ খলু মাতুরঙ্কে ॥ ১৬ ॥

আয় রে চণ্ডাল বিপ্র পাপী পুণ্যবান !
আয় রে দরিদ্র ধনী জ্ঞানী বা অজ্ঞান !
নাহি তথা লজ্জা ভয় মান অপমান,
মার কোলে অধিকার সবারি সমান। ১৬।

বদন্তু সর্ব্বে জয় তারিণীতি
প্রয়াতু দূরং চকিতঃ কৃতান্তঃ।
যন্নামতো দীর্য্যতি কালদণ্ডঃ
তস্যাঃ সুতা বিভ্যতি কিং কুতোঽপি ॥ ১৭ ॥

'জয় তারা'-বলি সবে কর জয় ধ্বনি,
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে পলাবে অমনি;
যার নামে যমদণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়,
তাহার সন্তান মোরা কারে করি ভয় ?। ১৭।

প্রণত—

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মণঃ

বসন্তে।

বসন্তকালের নাম করিবামাত্র মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হয়। সে ভাবকে তুমি কি বলিবে? বলিবে সৌন্দর্য্য—কান্তি—শোভা—রূপ—লাবণ্য—রমণীয়তা? তা বলিলেও তো তৃপ্তি হয় না। সে সৌন্দর্য্যের সহিত যে মাধুরী আছে, সে কান্তির সহিত যে কোমলতা আছে, সে শোভার সহিত যে শ্যামলতা আছে, সে রূপের সহিত যে নবীনতা আছে, সে লাবণ্যের সহিত যে বিচিত্রতা আছে, সে রমণীয়তার সহিত যে এক অভূতপূর্ব্ব সুখ আছে। এ সমস্ত ভাবের সঙ্গে যে এক উল্লাস আছে—যে উল্লাসে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, যে উল্লাসে পিকবধূ ডাকিয়া উঠে, যে উল্লাসে কুসুমাবলী প্রস্ফুটিত হয়, যে উল্লাসে ভ্রমরা ফুলে ফুলে গুঞ্জরিয়া বেড়ায়, যে উল্লাসে মলয়ানিল কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিয়া চারিদিক সৌরভে পরিপূর্ণ করে, আর ধীরে ধীরে মৃদুহিল্লোলে তোমার গাত্রে মধুরতা সঞ্চারিত করে—বসন্তের সে উল্লাসকে তুমি কি কথায় বিকাশ করিতে চাও? সে উল্লাস কি কথায় প্রকাশিত হয়?

এই মধুর বসন্তকালে প্রকৃতি শত শোভায় শোভিতা। বনে বল্লরী সকল মৃদু সমীরণে নৃত্য করিতেছে। তরুরাজি নব কিসলয়ে নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। প্রসূনরাশি তরুরাজিকে শোভিত করিয়াছে। ভারতের উদ্যান-রূপ বঙ্গদেশে বসন্তের রমণীয়তা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। কুসুমাকর সর্ব্বত্রই কুসুমমালায় সুশোভিত। কিসলয়-কান্তিও কুসুমের সৌন্দর্য্যে সুরঞ্জিত। বনবল্লরীর নৃত্য ও হাস্য, কুসুম-শোভা বুঝি পরাজিত করে। মুকুলমালাও ফুলকুল বিজয়িনী। দেখিতে দেখিতে কত ফুল ফুটিতেছে। কত বিচিত্র বর্ণের রাগরঞ্জন তোমার চিত্ত বিমোহন করিতেছে। আর জলে—সরোবরে নলিনী ঢল ঢল করিতেছে। এ যে সকল শোভাকে পরাজয় করিল। তেমন সুষমা, তেমন রমণীয়তা বুঝি আর কুত্রাপি নাই। তুমি যদি কবি হও, তবে এই রমণীয় রূপ যথার্থ অনুভব করিতে পারিবে। তবে সেই সরোবরের কমলরঞ্জিত দেশকে প্রকৃতিসুন্দরীর এক বিচিত্র আসন-রচনা বলিয়া দেখিতে পাইবে। সে বিচিত্র কমলদল-সুরঞ্জিত আসন যেন কোন দেবীর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ঋতুরাজ বুঝি প্রেমপ্রতিমার জন্য সেই আসন রচনা করিয়াছেন। কবি! তুমি সেই কমলদলবাসিনীকে সেই

থানে.কল্পনা কর। কল্পনা কর, তিনি সেই কমলদল শোভিয়া উদয় হইলেন। উদয় হইয়া সরসীমাঝে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইলেন, করে কমলিনী। চন্দ্রনিভাননা অবনত মুখে সরসীর মোহন মুকুরে বুঝি নিজ মুখবিম্ব দেখিয়া মোহিতা। তাই ঈষৎ বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতেছেন, যেন সেই ভঙ্গিমাতেই তাঁহাকে ভাল দেখায়। বিম্বাধরার মুখমাধুরী ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই মাধুরীর নিঃসরণে এক একটি নব কমল প্রস্ফুটিত হইতেছে, অথবা কোথাও কমলদলে নব রাগরঞ্জন উদ্ভাসিত হইতেছে। মোহিনীর চিকুরদামে কত কুন্দকলি বিকসিত। পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী। চিরযৌবনা নবলাবণ্যে বিমোহিনী। প্রেমের মধুরতা সেই লাবণ্যে; আর চির-নবীনতা সেই যৌবনে। প্রেমের সরসতায় নবীনা প্রফুল্লিতা। প্রফুল্লিতা যেন কুসুম শোভা। মধুকর নিকর তাই গুন গুন গুঞ্জরিয়া ভ্রান্তিক্রমে কভু বিম্বাধরে, কভু বা কপোলকান্তিতে বসিতে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দূরে যাইতেছে। বসন্তরাগের নবীনতা, মনোহারিতা এবং সৌকুমার্য্য তাঁহার রূপে বিকশিত হইয়াছে। দেবজ্যোতিঃ তাঁহার চারিধারে। পুষ্পবর্ষণে যেন সেই বিভা ঝরিয়া পড়িতেছে। দেবতারা বুঝি পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন। সৌরভে দিগ্‌দশ আমোদিত।

কবি সেই কমলাসনে প্রেমময়ী প্রকৃতিসুন্দরীকে কল্পনাচক্ষে দেখিতে পান। দেখিতে পান—সেই প্রেমময়ী দেখিতে দেখিতে স্বপ্নবৎ হৃদয়ে মিলাইয়া যান। তাঁহার প্রেমভাব হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। তখন কবি বাসন্তী দেশের সমস্ত সৌন্দর্য্যে ও নবজীবনে—কুঞ্জে, বনে, কান্তারে, নবপল্লবে, নবকুসুমে, নবরঞ্জনে এক অভূতপূর্ব্ব প্রেমের বিকাশ দেখিতে পান। দেখেন, প্রেমে পুনর্জ্জীবিতা প্রকৃতি, বসন্তের নবসৌন্দর্য্যে বৃন্দাবনশোভা বিকাশ করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন। অথবা প্রকৃতি বুঝি পুরুষকে সাজাইতেছেন—প্রেমময়ী প্রকৃতি বুঝি পুরুষকে প্রেমময়রূপে সাজাইতেছেন। জগৎপতি আজি প্রেমময়ী প্রকৃতিসুন্দরীর লীলায় অনুরক্ত। প্রেমময়ী প্রকৃতি যেন নিজ মাধুরীতে জগৎসংসারকে নবজীবনে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। সংসার প্রফুল্লতায় হাসিতেছে। আনন্দময়ের সংসারধাম নবরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বসন্তময় সেই আনন্দ ও উল্লাস।

ভক্তি সমস্ত বসন্তছবিকে এইরূপ প্রেমময় করিয়া তোলে। যে প্রেমে

সংসার বার বার নবীভূত হইয়া সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইতেছে, সেই প্রেমলীলার ঐশ্বর্য্যময় বিকাশ বসন্ত। আজি সংসার পুরাতন ও মৃতপ্রায়, শীতে জর জর শীর্ণ-কলেবর, যেন কেবল সৎস্বরূপ বর্ত্তমান; কাল সব নবজীবনে চৈনন্যময়—নবশোভায় সব রমণীয়। বসন্ত সেই সৎস্বরূপের চৈতন্যময় বিকাশ। এ বিশ্ব সেই চৈতন্যময় কৌশলজ্ঞ পুরুষের আনন্দময়ী লীলা। সৎস্বরূপ কভু চৈতন্যে পরিদৃশ্য, চৈতন্য কভু আনন্দলীলায় ব্যক্ত। সেই সচ্চিদানন্দের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝাইয়া দিবে? ভক্তিকে কে তত্ত্বজ্ঞানে লইয়া যাইবে? ভক্তি যখন এই ভাবে ভাবিত, তখন তাঁহার সেই প্রেমময়ী চৈতন্যরূপিণীরূপে দেখা দিলেন।

ভক্তি দেখিলেন সেই চৈতন্যই সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া আছেন; সেই চৈতন্যই সমস্ত সংসারের প্রাণ ও জ্ঞান। তাঁহাতেই শক্তি, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য সকলই বর্ত্তমান। তখন ভক্তির যে জ্ঞানোদয় হইল, সেই জ্ঞানে তিনি চৈতন্যরূপিণীকে পূজা করিতে গেলেন। কল্পনা জাগরিত হইয়া দেখিল, প্রেমময়ীর করকমলে বীণা*। জ্ঞানদায়িনী, চৈতন্যময়ী, কিরিটিনী, পদ্মাসনা বীণাপাণির মুখমণ্ডলে বাসন্তী মাধুরী। কুঞ্জকাননের কূজনরবে বীণা ঝঙ্কারিত হইতেছে। ভক্তি সেই মধুর রবে বীণাপাণির স্তোত্ররব মিশাইয়া দিলেন। ভক্তির বীণাপাণি জগতে সরস্বতীরূপে প্রকাশিত হইলেন।

কে বলে স্পর্শমণি অলীক পদার্থ? জগতে স্পর্শমণি যদি কিছু থাকে, তবে তাহা নিশ্চয় কবির হৃদয়। কবির হৃদয় ধূলিকেও স্বর্ণময় করে। আর, স্পর্শমণি ভক্তি। ভক্তি মৃত্তিকাকেও দেবত্বে লইয়া যায়। কবি-কল্পনার সহায়তায় ভক্তি—বন, উপবন, নদ, নদী, পর্ব্বতগহ্বর ও সমস্ত জগৎ দেবদেবীতে পরিপূর্ণ করে। মৃণ্ময়ী সরস্বতী আজ ভক্তির স্পর্শে দেবীরূপে বঙ্গধামে উদয় হইয়াছেন। ঋতুরাজ বুঝি দেবীকে পূজা করিতেছেন। বঙ্গদেশ সেই পূজায় মাতিয়া গিয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভক্তিতে সরস্বতীদেবী রমণ করিতেছেন। ভক্তির মনে বালকগণ তাঁহাকে আরাধনা করিতেছে—তাঁহার

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-মতে বাগ্‌বাদিনী সরস্বতীদেবী বৈকুণ্ঠধামে প্রেমময়ী কৃষ্ণযোষিৎ প্রকৃতি সুন্দরীর জিহ্বাগ্র হইতে সমভূতা।

পদকমলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। তদ্‌সঙ্গে কুলবধূ, গৃহিণী, যুবা, যুবতী, বৃদ্ধ— সবাই সমভক্তিতে দেবীকে পবিত্র মনে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। জ্ঞানময়ীর পদতলে সমস্ত পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও শাস্ত্র সমর্পণ করিয়াছে। সমর্পণ করিয়া সুন্দরীকে দেবজ্যোতিঃতে আরও সুন্দরতর দেখিয়া তাঁহার বন্দনা করিতেছে। সে বন্দনার পদাবলী মুক্তামালার ন্যায় গ্রথিত। জয়দেব তেমন সুন্দর পদাবলী দিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ।

শ্রীকৃষ্ণ যে মোহন বনবিহারীরূপে বৈষ্ণব-কল্পনায় সমুদিত, সরস্বতীর মূর্ত্তিতে ততোধিক সৌন্দর্য্য। তত্ত্বজ্ঞানের সেই প্রেমমুগ্ধ বঙ্কিমভাব। শিরে, মোহন-চূড়ার পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল কিরীট। করে বংশীর স্থলে বীণা। উভয়েরই গাত্রে জ্বলদগ্নিশিখাসম পীতাম্বর এবং পদতলে শতদল শোভিত। বিষ্ণুর শ্বেতবরণে দেবী মনোহরা। শ্বেতাঙ্গিনীর সমস্ত অঙ্গ উৎকৃষ্ট রত্নভূষণে ভূষিত। মুখে উভয়েরই হাস্যবিকাশ। মা বলিয়া ডাকিতে না পারিলে ভক্তি বুঝি পরিতৃপ্ত হয় না, তাই নারায়ণ দেবীরূপ ধারণ করিয়াছেন। আর ভক্তি তাঁহার পদতলে উপহার দিতেছে কি? সমস্ত শ্বেতবর্ণ সামগ্রী—সুগন্ধি শ্বেতপুষ্প, শ্বেতচন্দন, শ্বেতবর্ণ নববস্ত্র, মনোহর শঙ্খ, শ্বেতপুষ্পের মালা, শুক্লবর্ণের হার এবং শুক্লবর্ণ ভূষণ*। এ যে পুণ্যের প্রতিমা, পবিত্রতার পূজা, চন্দ্রমার পরিবেশ, প্রকৃতির মায়া, কুসুমিত বসন্ত, বিকশিত বৃন্দাবন।

যেখানে জ্ঞানদীপ জ্বলিতেছে, সেস্থান সেই জ্ঞানালোকে সমস্ত শুভ্রময়। যেখানে তত্ত্বজ্ঞান উদয়, সেখানে সকলই পবিত্রতাময়। এই সৌন্দর্য্য বীণাপাণির রূপে ও পূজায়। যে কল্পনা বীণাপাণির রূপ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্যানু-ভাবুকতার সম্যক্ প্রশংসা করা যাইতে পারে না। সমস্ত বাসন্তী মাধুরী ও কান্তি, সমস্ত পবিত্রতা ও শান্তি, সমস্ত সৌকুমার্য্য ও শোভা একত্রিত করিয়া বুঝি সরস্বতীর রূপ গঠিত হইয়া থাকিবে। যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হওয়া যায়, সেই ব্রহ্মাণ্ডকমল ভারতীর পদতলে প্রস্ফুটিত। দেবী ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী হইয়া তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিতা হইয়াছেন। সেই ঐশ্বর্য্যসম্পন্না, জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিতা, পরম পবিত্রতাময়ী সুন্দরীর কোমল

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণান্তর্গত প্রকৃতি খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোক দেখ।

করপল্লবে বীণা ব্যতীত আর কি ভূষণ শোভা পাইতে পারে? বেদমাতার উপযুক্ত যন্ত্র বীণা। সেই বীণারবে দেবী ব্রহ্মাণ্ডময় ব্রহ্মসংগীতে পূর্ণ করিতেছেন। যে ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত, তাঁহার পত্নী হইয়া তিনিও ব্রহ্মাণ্ডময়ী* হইয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মকে ব্রহ্মাণ্ডময় দেদীপ্যমান দেখিয়া তাঁহারই গুণকীর্ত্তনে অনন্ত-দেশ সঙ্গীতময় করিয়াছেন। সেই গানে মোহিতা দেবী ঈষৎ বঙ্কিমভাবে অবস্থিতা। তত্ত্বজ্ঞানী সদাই তত্ত্বজ্ঞানে বিভোর হইয়া আছে।

সরস্বতী আবার বাগ্দেবী কল্পনাময়ী। বাগ্দেবীর শব্দলহরী সুস্বনে ধ্বনিত। সেই সুস্বর-সুধা তাঁহার বীণাবাদনে উৎসারিত। কবির কল্পনা-সৌন্দর্য্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। তিনি কল্পনাবলে ব্রহ্মাণ্ডময় ভ্রমণ করেন। কবি কোথায় না গমন করেন? কল্পনাসহকারে ব্যাস ও বাল্মীকি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন; দ্যুলোক, ভূলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক প্রভৃতি অযুত লোক ভ্রমণ করিয়া সেই সমস্ত লোকের সৌন্দর্য্য ও কান্তি পুরাণময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। দিব্যলোকের শোভা দিব্যগানে বীণার মধুর স্বরে বাদন করিয়াছেন। তাই কল্পনাদেবী ব্রহ্মাণ্ডে দণ্ডায়মানা হইয়া বীণাবাদনে মোহিতভাবে অবস্থিতা। যে শতদলে কল্পনাময়ী বাগ্দেবী স্থাপিতা, তাহা কি ব্রহ্মাণ্ড-কমল? না—কবি-হৃদয়ের পদ্মাসন?

কল্পনাদেবী কবির হৃদয়বাসিনী। কল্পনাদেবীর নিত্য সুখের ধাম, কবির হৃদয়। সেই কবির হৃদয়ে সরস্বতী নন্দনকানন বিরচন করিয়া সর্ব্বক্ষণ বাস করিতেছেন। সে কাননে অন্ধকার নাই, রাত্রি নাই—সর্ব্বদাই পূর্ণশশীর চন্দ্রিকা। সে বনে বসন্ত নিত্য বিরাজিত। মধুর স্বরে কল্পনাদেবী নিত্য গীত গাইতেছেন। নিত্য নব-কমল চারিদিকে প্রস্ফুটিত হইতেছে; নব নব দিব্য কুসুমপারিজাত-সৌন্দর্য্যে নিত্য শোভিত হইতেছে। তাই কল্পনাদেবী সরস্বতীর চারিপার্শ্বে কমলদল বিকশিত রহিয়াছে। তাঁহার রূপে কবিত্ব-চন্দ্রিকার আভা ফুটিয়াছে। তাঁহার অঙ্গে কাব্য-কাননের নানা কুসুমমালা শোভিত রহিয়াছে। দেবী চারিদিকেই সৌন্দর্য্যরাশি বিকীর্ণ করিয়া কবি-হৃদয়ের পদ্মাসনে বিরাজিতা রহিয়াছেন।

* ব্রহ্ম এক বই দুই নহে; দেবদেবী তাঁহার আংশিক বিকাশ ও অবতার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের কল্পনায় কেবল পূর্ণ ব্রহ্মত্বের বিকাশ।

কবি-হৃদয়ের নন্দনকাননে যে সমস্ত কল্পতরু কুসুমিত, সেই তরুরাজি সুধারসে নিত্য-সেবিত। সে কাননে নবরসের উৎস সদাই উৎসরিত হইতেছে। সেই নবরসের সরসীতে যে কাব্য-কমল প্রস্ফুটিত, সেই কাব্য-কমলে বীণাপাণি বীণাবাদন করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকেই বসন্তরাগ-রঞ্জিত ভাবের কুসুমাবলী প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনুরাগ-হিল্লোলে, প্রেমের মধুরতায় মলয়ানিল নিত্য সুধা সঞ্চারিত করিতেছে। ভারতী সেইভাবে ভোর; কবির হৃদয়রসে নিমগ্না হইয়া রহিয়াছেন। মাধুরী তাঁহার লাবণ্যে ঝরিয়া পড়িতেছে। বাসন্তীসরসী-কমলে কমলদলবাসিনীরূপে কবি এই হৃদয়বাসিনী ভারতীরই প্রতিবিম্ব দেখিয়াছিলেন।

আর সঙ্গীত! তোমার মধুময় সুরলহরীতে কি জগৎ মুগ্ধ নয়? তাই গীতি-দেবী জগতের কমলদলে আসীনা হইয়া সঙ্গীতে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতে-ছেন। আর কথক, বাগ্মি তোমরা কোন্ শক্তি-প্রভাবে জগৎকে মোহিত কর? তোমাদের সেই বাক্যের স্রোত—সেই কল্পনার সৃষ্টি—সেই সুস্বর ও মধুর ধ্বনিতে জগজ্জনের মনোরঞ্জন—সেই সমস্ত কি সংসারকে মোহিত করে না? কিন্তু সে সমস্তের দেববল কি? সে সমস্তের মহাশক্তি জ্ঞানরূপিণী বাগ্দেবী সরস্বতী—সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান ভক্তিরসে অভিষিক্তা—সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান বাল্মীকি ও ব্যাসের সঙ্গীতে প্রচারিত, যে জ্ঞানে ত্রিজগৎ মোহিত, যে জ্ঞান বসন্তের মাধুর্য্যময় রসে পরিপূর্ণ। সেই দেব-জ্ঞানময়ী সরস্বতী বাগ্দেবী বীণাপাণি।

সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তিকল্পনায় এতই সৌন্দর্য্য ও মাধুরী। সে কল্পনায় এক নিগূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে। দেবী শুধু যে জ্ঞানদায়িনী, বাগ্বাদিনী, কল্পনাময়ী এমত নহে, তিনি আবার বরদায়িনী তপস্যাস্বরূপা। তিনি নিজে তপস্বিনী এবং যাঁহারা তপোনুষ্ঠানে রত, তাঁহাদিগের ফলদাত্রী। এইরূপে দেবী করে রত্নমালা লইয়া সতত জপপরায়ণা হইয়া আছেন*। জপ করিতেছেন পরমাত্ম-স্বরূপকে।

বিদ্যা তপস্বিনী। বাস্তবিক তপস্যা যদি কাহারও থাকে, সে কেবল বিদ্যার

* হিমচন্দন কুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
জপন্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণরত্নমালয়া॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ১ অধ্যায়, প্রকৃতিখণ্ড।

আছে। তেমন উগ্র তপঃ আর কাহারও নাই। অপরের তপস্যার শেষ আছে, বিদ্যার তপস্যার শেষ নাই। সেই যে শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে তপের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাড়িতেছে। বাড়িবে কতকাল? যতদিন না শেষের সে ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হয়। কিন্তু এ তপস্যায় সুখ আছে, সুখ আছে তাই তাহার বৃদ্ধি। যত বৃদ্ধি তত সুখ। এ তপের প্রারম্ভই কঠিন। এ তপের জন্য চাই কি?—না বুদ্ধি, প্রতিভা, ধারণা, কল্পনা ও স্মৃতিশক্তি—সরস্বতীর পূর্ণাবয়ব। যিনি শৈশবে কিয়দংশ স্বাভাবিকী প্রতিভা না লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার বিদ্যালাভ হওয়া দুঃসাধ্য। এজন্য লোকে কথায় বলে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার না থাকিলে বিদ্যালাভ হয় না। এই প্রতিভা লইয়া বিদ্যার তপোযোগ আরম্ভ করিলে, বুদ্ধি, মেধা, কল্পনা, স্মৃতি পরে সহায়তা করিতে থাকে। সহায়তা করিয়া অনুরাগকে আনিয়া দেয়। যখন অনুরাগ ও প্রেম আসিয়া উপনীত, তখন তপস্যা রসযুক্ত হয়। লোকে বিদ্যা-রসাস্বাদনের সম্ভোগী হইলে আর তপস্যার বিরাম নাই। তপস্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। সেই তপোবৃদ্ধিতে লোকের ঐশ্বর্য্যলাভ। বিদ্যাদ্বারা কোন্ ঐশ্বর্য্য না লব্ধ হয়? পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ও সুখ বিদ্যাবলে অর্জ্জিত হয়। সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর এইরূপে মিলন হয়। তখন বিদ্যাদেবী সর্ব্বার্থ-সাধিকা ও সর্ব্বকামনা-সিদ্ধিদাত্রী*। কিন্তু এই সম্পদ ও সুখ কখন স্থায়ী হয়? যখন তাহার সহিত ভক্তি মিশে। যখন বিদ্যার সহিত ভক্তি মিশে, তখন বিদ্যা বেদের দিকে অগ্রবর্ত্তিনী হন, তখন লক্ষ্মীদেবী সরস্বতীকে সর্ব্বসম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আনিয়া দেন। সরস্বতী ও লক্ষ্মী একত্রে অগ্রসারিণী হইয়া বেদাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। যখন সাবিত্রীর সহিত সরস্বতী দেবীর মিলন হয়, তখন কৈবল্যদায়িনী দুর্গার সহিত সরস্বতীর সাক্ষাৎকার। সেই সাক্ষাৎকারে বিদ্যা কৈবল্য লাভ করে।

মূল প্রকৃতিদেবীকে এজন্য আমরা এই পঞ্চবিধ রূপে দেখিতে পাই। মূল প্রকৃতি—জ্ঞান, ভক্তি, ঐশ্বর্য্য, পরমার্থ ও ব্রহ্ম। সরস্বতীর জ্ঞান, রাধিকার ভক্তি, লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য, সাবিত্রীর পরমার্থতত্ত্ব-বেদ এবং দুর্গার কৈবল্যময় ব্রহ্মত্ব।

---

* হিন্দুর কামনা ধর্ম্মের জন্য, ধন মান হিন্দু কামনা করেন ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্মের জন্য হিন্দু সকাম। তাঁহার যশ ধর্ম্মের যশ।

অথবা পরব্রহ্ম, পরমার্থতত্ত্ব বেদের পরম পুরুষ। পরম পুরুষ, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যে প্রকাশিত। ঈশ্বর, ভক্তি ও জ্ঞানে লব্ধ। পুরাণে মূল প্রকৃতির এই পঞ্চবিভাগ বর্ণিত হইয়াছে*। মূল প্রকৃতি দেবীর এই পঞ্চবিভাগ বাসন্তী পূজায় প্রকটিত হইয়াছে। বাসন্তী দুর্গাপূজায় আমরা শুদ্ধ প্রকৃতিকেই পূজা করি এমত নহে, সেই মূল প্রকৃতি যে সৎস্বরূপ পুরুষের আশ্রিতা, তাঁহাকেও পূজা করি। পূজা করি বাসন্তী মধুরতায়। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী ও দোলে রাধিকার পূজা অগ্রে করিয়া যে জ্ঞানোদয় ও ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়, সেই জ্ঞানোদয়ে ও ভক্তিতে সমগ্র ভগবৎশক্তিকে একত্রে পূজা করিয়া বাসন্তী উৎসব পরিশেষ করি।

নিজে সরস্বতীদেবী ভক্তিময়ী নারায়ণী—শ্বেতবর্ণা বিষ্ণুরূপিণী। দেবী শুধু ভক্তিময়ী নহেন, তিনি আবার সৃষ্টিরূপিণী ব্রহ্মার পত্নী†। যেখানে অনুরাগ নাই, সেখানে বিদ্যা নাই। সেই প্রেম ক্রমশঃ বিষ্ণু-ভক্তিতে পরিণত। জ্ঞানের সহিত মিশিয়া তাহা বিষ্ণু-ভক্তিতে পরিণত হয়। বিষ্ণু-ভক্তির সহিত জ্ঞান যখন মিশে, তখন জ্ঞান পরমার্থ-রসে মগ্ন হয়। সেই পরমার্থ-রসমগ্না সরস্বতী দেবী তপস্বিনী—তপস্বিনী ব্রহ্মময়ী—ব্রহ্মধ্যানমগ্না। নারায়ণী ভক্তিরূপিণী ব্রহ্মধ্যানমগ্না জ্ঞানযোগিনী। সেই সরস্বতীতে আমরা একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে দেখিতে পাই। ব্রাহ্মীশক্তি মহাকর্ম্মদেবী, বিষ্ণুরূপিণী মহাভক্তিরূপা, আর মহাজ্ঞানময়ী সরস্বতী জ্ঞানযোগিনী মহেশ্বররূপা। সরস্বতীর কল্পনায় আমরা কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের একত্র সমাবেশ দেখি। সরস্বতী দেখাইতেছেন, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ একত্রে মিশিয়া মহা জ্ঞানযোগে আরোহণ করে। জ্ঞান-যোগে আরোহণ করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। তখন কৈবল্যদায়িনী দুর্গা আপনি কৈবল্য আনিয়া দেন। জীব মুক্ত হয়।

ব্রহ্মা যে মহাসৃষ্টি-ব্যাপারে ব্যাপৃত, তাহাতেই তিনি মহা কর্ম্মযোগী। সেই কর্ম্মযোগীর পত্নী মহাকর্ম্মদেবী। জ্ঞানের সহায়তায় আমরা ব্রহ্মার সৃষ্টিব্যাপার অবলোকন করি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলই আমাদের জ্ঞানাকারে

* তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টি কর্ম্মনি ভেদতঃ।
অথ ভক্তানুবোধাদ্বাভক্তানুগ্রহ বিগ্রহ।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ১ অধ্যায়।

† ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-মতে সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী।

আবির্ভূত। এজগৎ কেবল আমাদের জ্ঞান-জগতে বর্ত্তমান। আমাদের জ্ঞান-চক্ষু না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না। এ বিশ্ব কেবল জ্ঞানেরই স্থষ্টিকাণ্ড। সরস্বতীর স্থষ্টি, জ্ঞানের মহা স্থষ্টি-ব্যাপার। ব্রহ্মার বিরাট স্থষ্টি, কেবল জ্ঞানময় স্থষ্টিব্যাপারে প্রতীত। মহাজ্ঞানী কপিল এই জ্ঞানময় স্থষ্টি-ব্যাপারের বিকাশ দেখাইয়া জগতে পরম পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি এই বিচিত্র বাহ্য-বিশ্বধামে এক জ্ঞানময় জগৎ দেখাইয়াছেন। সরস্বতী সেই জ্ঞানময় জগতের স্থষ্টিকারিণী। সেই জ্ঞানময় জগতের স্থষ্টি আছে বলিয়া আমরা ব্রহ্মাণ্ডের উপলব্ধি করি এবং তদ্‌সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই কোথায়? সেই জ্ঞানময় স্থষ্টিজগতের অভ্যন্তরে। পরম পুরুষ জ্ঞানের অনুভবে অনন্ত চৈতন্যরূপে ব্যক্ত হন। তখন আমরা সেই অনন্ত চৈতন্য দেবকে হৃদয়ের ভক্তিরাজ্যে অধিষ্ঠিত করি। হৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাব ঘটে। নারায়ণী নারায়ণকে আনিয়া দেন। হৃদয়ের মহা আনন্দধামে, নন্দালয়ে নারায়ণকে অধিষ্ঠিত করিয়া তবে তাঁহাকে দেদীপ্যমান দেখিতে থাকি। যে জ্ঞানময় স্থষ্টি-প্রভাবে আমরা এই নারায়ণের আবির্ভাব দেখি, তাহাই ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী দেবীর মহা স্থষ্টিকাণ্ড। ব্রহ্মার স্থষ্টির মধ্যে এই জ্ঞানময় স্থষ্টি মিশিয়া আছে। দিব্যজ্ঞানে তাহা প্রতীত হয়। সরস্বতী ব্রহ্মে লীনা হইয়া আছেন। পুরুষে প্রকৃতিসুন্দরী অব্যক্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। সরস্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের রূপ পরব্রহ্মেরই বাহ্যবিকাশ মাত্র। তিনিই মহেশ্বররূপা মহাজ্ঞান। মহেশ্বরে যে মহা জ্ঞানযোগ বর্ত্তমান, যে জ্ঞানযোগে সেই মহাযোগী সততই ধ্যানমগ্ন, সরস্বতী দেবী সেই জ্ঞানের প্রতিমা। যিনি সরস্বতীকে পূজা করেন; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে পূজা করেন; তিনি পরম পুরুষকে পূজা করেন, তিনি জ্ঞান, কর্ম্ম, ও ভক্তিকে পূজা করেন। সরস্বতী দেবী সেই পরম পুরুষের রূপান্তর মাত্র। আইস আমরা সকলে সরস্বতীর পূজা করি। পূজা করিয়া জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগে মহা সংসারলীলায় পরম পুরুষকে সর্ব্বঘটে বিদ্যমান দেখি।

সরস্বতী দেবী যে অলঙ্কারদামে ভূষিতা, দেবতারা তাঁহাকে সেই ভূষণ-রাশি বিতরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা ভারতীকে রত্নেন্দ্রসার-বিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট হার ও সর্ব্ব-ব্রহ্মাণ্ড-দুর্লভ শিরোরত্ন প্রদান করিয়াছেন। সেই হার, মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্রনীল ও হীরকমালায় গ্রথিত। সেই পঞ্চরত্ন চতুর্ব্বেদ ও গায়ত্রী স্বরূপ।

সেই হারে ভূষিতা হইয়া সরস্বতী বেদমাতা ও গায়ত্রী স্বরূপা। সে হার সরস্বতী দেবীর পঞ্চশক্তির বিকাশ—বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতিভা, কবিত্ব ও ধারণাশক্তি। সে হার পঞ্চতন্ময় ও পঞ্চ মহাভূত পংক্তিরূপ পঞ্চরত্নে রচিত। সেই হারে ভূষিতা হইয়া দেবী ব্রহ্মার সৃষ্টি-ব্যাপারে সংলিপ্তা। ব্রহ্মা যে শিরোরত্ন দিয়াছেন, তাহা কিরীটস্থ সৎরূপ শ্রেষ্ঠ পদার্থ। এই ভূষণদ্বয়ে সরস্বতী দেবী ব্রহ্মরূপিণী। তাহাতেই তাঁহার ব্রহ্মত্ব। শ্রীকৃষ্ণ বাণীকে সর্ব্বরত্ন-প্রধান কৌস্তভরত্ন দিয়াছেন। এই কৌস্তভরত্ন বাক্যের তেজস্বরূপ এবং নির্গুণ, নির্লেপ, অমল আত্মা। এই ভূষণে সরস্বতী অমলতা এবং ব্রহ্মতেজস্বিতায় সম্পন্না হইয়াছেন। রাধিকা তাঁহাকে অমূল্য প্রেমহারে ভূষিতা করিয়াছেন। এই হার-প্রভাবে সৎস্বরূপা ব্রাহ্মীশক্তি জগৎপ্রেমে ও বিষ্ণুপ্রেমে মুগ্ধা। সনাতন নারায়ণ তাঁহাকে মনোহর বনমালা দান করিয়াছেন। সিদ্ধগণের হৃদয়স্থ ভক্তিপুষ্পমালা চয়ন করিয়া নারায়ণ এই হার গাঁথিয়াছেন। যে ভক্তি ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, সেই ভক্তি-পুষ্পমালা সরস্বতী-কণ্ঠে। লক্ষ্মীদেবী অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মকরকুণ্ডলদ্বয় তাঁহার কর্ণভূষণ করিয়া দিয়াছেন। এই কুণ্ডদ্বয় স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ। ভগবতী, সরস্বতীকে বিষ্ণুভক্তি দিয়াছেন। ধর্ম্ম, বাগ্দেবীকে ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিপুল যশস্বরূপ অগ্নিশুদ্ধ পবিত্রতার বসনে ভূষিতা করিয়াছেন। আর বায়ু তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক মণিময় নূপুর অর্পণ করিয়াছেন। সেই নূপুর-ধ্বনিতে দেবী সংগীতময়ী হইয়া রহিয়াছেন*।

জ্ঞান দ্বারা আমরা কেমন ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হই, তাহা বোধ হয় এক্ষণে প্রতীত হইতেছে। সরস্বতীদেবীর জ্ঞানময় সৃষ্টিকাণ্ডে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত হন। জ্ঞান, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে উপনীত হইতে পারে। সরস্বতী দেবী সেই জ্ঞান ও বিচারে বাগ্বাদিনী। তিনি জ্ঞানযোগময়ী। সেই জ্ঞানযোগে তিনি পরব্রহ্মকেও অনুভবে উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা জ্ঞান-বিরহিত অজ্ঞ; যাহাদের প্রতি সরস্বতীর কৃপা নাই; যাহাদের বুদ্ধি, প্রতিভা,

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণস্থ প্রকৃতিখণ্ডের দশম অধ্যায়ে এই সমস্ত ভূষণের কথা উল্লিখিত আছে। সরস্বতীদবী, যে সমস্ত দেবভাবে কল্পিত, এই ভূষণ সকল সেই দেবত্ব। এই সমস্ত অলঙ্কারের ব্যাখ্যা বিষ্ণু পুরাণান্তর্গত ১'.অংশের দ্বাবিংশ অধ্যায়, গোপালতাপনীয় উপনিষৎ এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইল। যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত কাণ্ব শাখায় সরস্বতীর ধ্যান ও স্তব লিখিত হইয়াছে।

স্মৃতি, মেধা ও কল্পনা তত তেজস্বিনী নহে, অথবা যাহারা সেই শক্তি সমূহের বিকাশ সাধন করিতে পারে না; যাহারা বিদ্যালাভে অসমর্থ, সেই অগণ্য লোকের গতি কি? তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ না হইলে কি হয়? তাহাদের প্রেম আছে, দয়া আছে, ধর্ম্ম আছে, ক্ষমা আছে, শ্রদ্ধা আছে, অনুরাগ আছে এবং ভক্তি আছে। ভক্তি থাকিলেই যথেষ্ট। ভক্তির হৃদয়রাজ্যে নিজে হরি বিচরণ করেন। ভক্তির সাধনায় ভগবান্ দেখা দেন। জ্ঞানের ব্রহ্ম, ভক্তির ভগবান্। ভক্তি ব্যতীত উপাসনা নাই; উপাস্য দেবতা ভগবান।

সরস্বতীর পূজায় যে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়, শৈশব হইতে সেই ভক্তির পরিপুষ্টি হইতে থাকে। বসন্তকালে জ্ঞানীর ভক্তি ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। জ্ঞানী, বাসন্তী-সৌন্দর্য্য মাঝে প্রেমের পরিচয় পাইয়া উল্লসিত মনে ভক্তির পথ বিমুক্ত করিয়া দেন। তখন ভক্তি প্রবলা হইয়া মনকে উদ্বোধিত করিতে থাকে। ভক্তি যেমন জ্ঞানকে প্রথমে দেবতুল্য করিয়াছিল, তেমনই এখন জ্ঞান ক্রমশঃ ভক্তিকে দেবতুল্য করিতে চলিল। জ্ঞানের উদ্রেকে হৃদয় বুঝিল, ভক্তি নিজেই দেবতা ও পবিত্রতাময়ী; তাই তাঁহার সংস্পর্শে সকলই পবিত্র হইয়া যায়। যে হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ, সেই হৃদয়ই পরমানন্দ ধাম। যে আনন্দ, ভক্তিতে—মুক্তি সেই আনন্দের প্রয়াসিনী। পরাভক্তি নিত্য আনন্দময়ী প্রকৃতি দেবী। ভক্তি অমৃতস্বরূপ, তাহার মুক্তি-পিপাসা নাই। মুক্তি তাহার দাসী। ভক্তিকে পাইলে মানুষের সকল তৃষ্ণা, শোক ও দ্বেষ বিদূরিত হয়। ভক্তিকে পাইলে মানুষের সকল সম্পদ লাভ হয়। রাজসিংহাসনও তুচ্ছ বোধ হয়। যে জ্ঞানে এই ভক্তির উদয় না হয়, সে জ্ঞান নিশ্চয় বৃথা জ্ঞান। বসন্তের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যদি হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক না হয়, তবে সে হৃদয় নিশ্চয় অপবিত্র। বাসন্তী-কান্তি মানুষকে কবি করিয়া তোলে, ভক্তি কবিকে উন্মত্ত করিয়া দেয়। সেইরূপ উন্মত্ত কবি জয়দেব।

উন্মত্ত জয়দেবের মনে ভক্তি অতি মধুরভাব ধারণ করিয়াছে। জয়দেব বৈষ্ণবানুরাগের বাসন্তী বিকাশ। বসন্তের যে উল্লাস, নবজীবনের যে উৎসাহ, প্রেমের যে মুগ্ধতা, সে সমস্তই একত্রিত হইয়া জয়দেবের সরস হৃদয়কে মুঞ্জরিত করিয়াছে। সেই মুঞ্জরিত কুসুম—শ্রীমতী রাধিকা। জয়দেবের রাধিকায় যে অনুরাগ, যে ঐকান্তিকতা, যে উন্মত্ততার সহিত বাসন্তী মধুরতা,

ততোধিক বুঝি আর কোথাও নাই। বাসন্তীরাগে রাধিকা উৎসাহিতা, উল্লসিতা। ঐকান্তিক কৃষ্ণ-ভক্তিতে রাধিকা আত্মহারা, মাতয়ারা। তাঁহার প্রেম, পতিপত্নীর ঘনিষ্ট প্রেম। তাঁহার আসক্তি, কান্তাসক্তি—প্রেমিক ও প্রেমিকার আসক্তি—তাই মধুর। সেই মধুরভাবে রাধিকা কোমলতায় পরিপূরিতা। সরস বসন্তের সর্ব্বদেশে রাধিকা পরম আনন্দময় ও রসময়কে যেন স্বপ্নবৎ জাজ্বল্যমান দেখিতেছেন। আনন্দের ছবি তাঁহার মানসে সতত উদিত হইতেছে। সেই আনন্দময়ে মিশিবার জন্য রাধিকা পাগলিনী। তাই বসন্তকালের শোভাময় দেশে বৃন্দাবন প্রস্ফুটিত দেখিয়া আত্মহারা-প্রায় ভক্তিরূপা রাধাসুন্দরী পরম আনন্দময়কে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। স্থূলরূপা আরাধনা-দেবী স্থূলরূপ আনন্দময়কে অন্বেষণ করিতেছেন। ভক্তির পিপাসা অমৃতের জন্য লালায়িত। সেই পিপাসা বসন্তকালে দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে! যে আনন্দময় রাধিকার অন্তরে ও ধ্যানে—ভক্তের হৃদয়ে—সর্ব্বদাই জাগিতেছে, সেই আনন্দময় রমণ—ভগবানের সহিত ভক্তির রমণ—আকুলা রাধিকা একদা চিত্তময় চিত্রিত করিলেন—চিত্রিত করিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন। তন্ময়ী রাধিকা যেন সেই ছবি বৃন্দাবনে প্রকাশিত দেখিলেন। কিন্তু, হায়, রাধিকার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধ্যান ভঙ্গ হইল! কবে তিনি সেই নিত্য সুখে সুখিনী হইবেন, রাধিকা তজ্জন্য ব্যাকুলা। ক্ষণিকের স্বপ্ন-সুখে রাধিকা সুখিনী নহেন। সেই রসসাগরের নিত্য সহবাস জন্য রাধিকা আবার ধ্যানমগ্না—প্রেমের প্রাচুর্য্যে পরিপূরিতা। প্রণয়াভিমানে যাঁহার দেহ পরিপূর্ণ, ভগবানের যিনি একান্ত আদরিণী, সেই প্রণয়াভিমানে, সেই আদরে কমলিনী মানিনী। ভক্তি, ভগবানের বড় আদরের জিনিষ। সেই আদরের রসময়ী কল্পনা—মান। ভক্ত, সরস্বতীর কৃপায় কবি। মান, ভক্তির কবিত্ব—রসময়ের সহিত রসময়ীর লীলা—ভগবানের সহিত ভক্তির লীলা। প্রেমের সহিত প্রেম আকৃষ্ট হইবে বলিয়া রাধিকা মানিনী। ভক্তির চক্ষে মানের সৌন্দর্য্য। রাধিকা মানিনী—রাধিকা-রমণকে চিরদিন আপনার করিবার জন্য। প্রেমকে নিত্যানন্দময় করিবার জন্য রাধিকার মান। পলকের জন্যও সেই রসময়ের বিরহে রাধিকা কাতরা। কত কাতরা? শতবর্ষ বিরহে যেমন প্রেমিকের জন্য প্রণয়িনী কাতরা।

জয়দেবের ভক্তি-কুসুম বসন্তকালের রাধাসুন্দরীতে প্রস্ফুটিত। বসন্তের

উৎসাহে, উল্লাসে ও মধুরতায় ভক্তিমতী রাধিকা প্রেমময়ী সুন্দরী। কবি, ভক্তিকে ঘনিষ্টতর প্রেমময়ী করিয়া সাজাইয়াছেন। সে রাধিকাকে দেখিলে মনে হয়, মধুরতা বসন্তে মিশ্রিত; বসন্ত, প্রেমে মিশ্রিত; প্রেম, সর্ব্বসুন্দরীর সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত, সর্ব্বসুন্দরী সর্ব্বসুন্দরের রমণে অনুরক্তা। বসন্তকালে সর্ব্বসুন্দরী প্রকৃতি-প্রেমে পরিপূরিতা হইয়া সর্ব্বসুন্দরের অঙ্কে, জয়দেব, শোভিতা দেখিয়াছেন। দেখিয়া প্রেমোল্লাসে গীতাবলির সুসংগীতে, কীর্ত্তনের নৃত্যতালে মত্ত হইয়াছেন।*

যিনি গোপিনীগণের প্রেম বুঝিতে পারেন, তিনিই বুঝিতে পারেন সে প্রেম বসন্তকালের রমনীয়তায় সর্ব্বসুন্দরের মনোমোহন লীলায় কেমন দ্বিগুণতর উদ্দীপ্ত হয়! গোপবালাগণ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, সর্ব্বত্যাগিনী, ব্রজবাসিনী। কৃষ্ণপ্রেমে তাহাদের প্রাণ মন সমর্পিত। তাহারা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। বসন্তকালের সৌন্দর্য্যে, প্রেমের উল্লাসে, মানের উৎফুল্লতায় গোপিনীগণ কৃষ্ণলীলায় উন্মত্ত। সে উন্মত্ততা কেবল কবি-হৃদয়েই অনুভনীয়, কবি-হৃদয়েই সেই উল্লাসের নৃত্য, সেই নৃত্য সুধাসঙ্গীতে উৎসারিত।

প্রেমের পরিপুষ্টি-সাধনের বিশিষ্ট উপায় বিরহ। বঙ্গকবিগণ এই জন্য বিরহে বড় উন্মত্ত। বিরহে ব্রজবাসিনীগণের ব্যাকুলতায় বঙ্গকবি কাঁদিতে ভালবাসেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-কবিগণ সেই বিরহে কাতর। কাতর রাধার এবং সখীগণের কাতরতায়। সেই ক্রন্দনে কাতর কবি রাম বসু। সেই ক্রন্দনরবে কবি মধুসূদন তাঁহার বীণায় সুর দিয়া ব্রজাঙ্গনার দুঃখে বিগলিত হইয়া বঙ্গীয় বৈষ্ণব-কবির হৃদয়ে কাঁদিয়াছেন। বিরহে—কৃষ্ণবিরহে—ভক্তির মহা উদ্দীপনায় একদা বসন্ত-সৌন্দর্য্যের মধ্যে শ্যামসুন্দরের আবির্ভাব দেখিয়াছেন। বসন্ত-সমাগমে রাধিকা কৃষ্ণভক্তির উদ্দীপনায় বৃন্দাবনময় শ্যামাবির্ভাব অনুভব করিয়াছেন। বিরহিনীর স্বপ্নে—

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরালী রে রাধিকারমণ"

এই তন্ময়তা, কবি অতি সুন্দর বর্ণে বসন্তানুরাগের সুকুমার তুলিকায় রাধার হৃদয়োচ্ছ্বাসে শ্যামাবির্ভাবের স্বপ্নরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যে যে স্থলে রাধার এই তন্ময় শ্যাম স্বপ্নভাব, সেই সেই স্থল মধুর হইয়া গিয়াছে। কবি সেই

* কীর্ত্তনের আদিগুরু জয়দেব। বৈষ্ণব-রাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন

মধুরতায় ভক্তির মধুর ভাব বিকাশ করিয়াছেন। মধুসূদন বঙ্গবাসীগণের কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়াছেন।

বিরহ-কাতরা রাধিকা ও সহচরীগণ শ্যামানুরাগে এতই পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন যে, সেই ভক্তির উদ্দীপনায় তাঁহারা বৃন্দাবন শ্যামময় দেখিয়াছিলেন। বৃক্ষের পত্র-সঞ্চালনে শ্যামের নৃত্য শুনিতেন। বসন্ত সমাগমে শ্যামের মধুরতায় বৃন্দাবন পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। বসন্তকাল যেমন মধুর, শ্যাম তাঁহাদের ততই মধুর ছিলেন। তাই তাঁহারা বসন্ত-সমাগমে শ্যামাবির্ভাব অনুভব করিতেন। বকুলের মুকুল-প্রস্ফুটনে তাহার মূলে শ্যামরূপ স্বপ্নবৎ দেখিতেন। সমীরণের সুরবে শ্যামের বেণুরব শুনিতেন। বসন্তের সমস্ত মধুরতার সহিত তাঁহারা শ্যামকে একাঙ্গী করিয়াছিলেন। তাই বঙ্গকবি রমাপতি যখন গাইলেনঃ—

"সখি! শ্যাম না এল।

অলস অঙ্গ শিথিল কবরী, বিভাবরী বুঝি অমনি পোহা'ল।"

তাহার উত্তরে রমাপতির কবিরমণী গোপাঙ্গনার মধুর ভক্তিতে গাইলেনঃ—

"সখি! শ্যাম আইল।

নিকুঞ্জ পূরিল মধুর ঝঙ্কারে, কোকিলের স্বরে গগণ ছাইল।"

বঙ্গীয় কবিহৃদয়ের এই মধুরতা—ভক্তির মধুরতা—যে ভক্তি শ্যামকে বাসন্তী সৌন্দর্য্য ও মধুরতার সহিত অভেদ করিয়াছে—যে ভক্তি বসন্তকে শ্যামময় করিয়াছে। শ্যাম কি?—না, মাধুরী। বসন্ত কি?—না, শ্যামসুন্দর। বসন্তের মধুরতাই, শ্যামসুন্দর; আর শ্যামসুন্দরের মধুরতাই বসন্ত। তাই নিজে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমি—

"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং ঋতূনাং কুসুমাকরঃ।"

কুসুমাকরের সৌন্দর্য্য ও মধুরতাই শ্যামসুন্দর। শুধু বসন্ত কেন, যাহা কিছু সুন্দর, রমণীয়, মনোহর ও মধুর, তাহাই শ্যামসুন্দর। নবজলধর বেশ, উজ্জ্বল নীলকান্তমণি-নিভা, ইন্দীবরদলশোভা, অতসীকুসুম-শ্যামলতা, সুচিক্কণ কৃষ্ণকান্তি—এসমস্তই শ্যামসুন্দরের রূপ। তাহাদের সেই সেই মনোহারিতা, কোমলতা, কান্তি, ও মাধুরীই শ্যামসুন্দর। যাহা কিছু সুন্দর ও মধুর, তাহাই রাধিকার শ্যামস্বপ্ন উদয় করে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বাসন্তী মাধুরীই প্রধান শ্যামোদ্দীপনা। বাসন্তী-নিকুঞ্জে রাধিকা যান, শ্যামসুন্দরের মধুরতা

সম্ভোগের জন্য। সেই মধুরতায়—নিকুঞ্জের পুষ্পময় সৌন্দর্য্যে—মনোহর বাসন্তী শোভায়—শ্যাম বনবিহারী। সেই নিকুঞ্জে গোপীগণ রাধিকা সঙ্গে—অনুরাগ, প্রেম, সাধনা, আরাধনা, ধারণাদি ভক্তির সঙ্গে—শ্যামসুন্দরের মধুরতা সম্ভোগ করেন। সেই মধুরতায় তাঁহারা বিগলিত। মধুরতায় সমস্ত ভক্তিরস মাখামাখি। গোপীগণের সহিত রাধাশ্যামের এই নিকুঞ্জবিহার—ঈশ্বরের সহিত ভক্তির সহবাস—আরাধনার সহিত উপাস্য দেবতার রমণ। সেই রমণের ছবি গীতগোবিন্দে। সেই রাধাশ্যামের সম্ভোগ-সুখে সমস্ত বাসন্তী-প্রকৃতি সুখিনী। সেই সুখেই তাহাদের উল্লাস ও প্রেমবিলাস। সমস্ত বাসন্তীদেশ রাধাশ্যামময়। তাই বসন্ত বুঝি লজ্জা পরিহার করিয়া সেই বিলাসে উন্মত্ত।

"বিগলিত লজ্জিত জলদবলোকন তরুণ করুণ কৃতহাসে।"

বসন্তের প্রেম-বিলাসে সকলেরই লজ্জা একেবারে বিগলিত হইয়াছে। তরুণ করুণ পাদপগুলি যেন তাহাই দেখিয়া পুষ্পচ্ছলে হাসিতেছে। হাসিতেছে ক্ষুদ্র-শাখীর কিসলয় হইতে বৃহৎ অশ্বথ পর্য্যন্ত। সেই হাসির আনন্দে মিশিয়া বল্লরী নাচিতেছে, তরুশাখায় পত্রাবলী নাচিতেছে। মলয়, প্রেমানন্দে ধীরে ধীরে সুস্বরে প্রবাহিত হইতেছে। বসন্তবন আনন্দে গীত গাইতেছে—নিকুঞ্জে, কুসুমকাননে—পিকের পঞ্চমস্বরে গীত গাইতেছে। এই মহান্ প্রেমলীলায় গহনকানন, আনন্দগগণ সকলই হাসিতেছে, সকলই নাচিতেছে, সকলই গাইতেছে, সকলই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে মাতিয়াছে। এই আনন্দই প্রকৃতির মহা দেবদোল। এই আনন্দে সমস্ত বাসন্তীরাজ্য দোদুল্যমান। এই আনন্দে ভক্তের মানস-বৃন্দাবন প্রস্ফুটিত। সেই বৃন্দাবনের মধুময় নিকুঞ্জে ভক্তিময়ী রাধাসুন্দরী বিরাজিতা। বসন্তকাননে সরসীমাঝে কবি কমলদল-বাসিনীকে যেমন শোভিতা দেখিয়াছেন, রাধাসুন্দরী ভক্তহৃদয় তেমনই শোভিতা করিয়া আছেন। প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্যে রাধিকা সুন্দরী। প্রকৃতিধামে ভক্তি অপেক্ষা সুন্দরী কে? পৃথ্বীর সম্পদ যাঁর পদতলে, সেই জগল্ললামভূতা সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইয়া হীরক-ভূষণে ভূষিতা ও মুক্তামালায় শোভিতা। কৃষ্ণপ্রেমের তন্ময়তায় তিনি নীলাম্বরা। পার্শ্বে রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ। যিনি অনন্তশয্যায় অনন্তচক্ষু উন্মীলন করিয়া পদতলে সেই ঐশ্বর্য্যময়ীর পানে চাহিয়া থাকেন, সেই প্রকৃতিপ্রেমমুগ্ধ রাধানাথ আজ রাধিকা-

পার্শ্বে সুশোভিত। বঙ্কিমদৃষ্টিতে সেই রাধাসুন্দরীকে তিনি নিয়ত দেখিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডকমল তাঁহার পদতলে। গলে প্রেমপুষ্পের বনমালা। করে শান্তির মোহন বাঁশরী। পীতাম্বরে বাসন্তী রাগ ও মাধুরী। রূপে প্রফুল্ল ইন্দীবরদল-নিভা বা তমালের শ্যামলতা*। সত্যের বিজয়রূপ মোহনচূড়া শিরে শোভিত। মুখে আনন্দময়ের মৃদু মধুর হাস্য। চারিধারই হৃদ্‌বৃত্তিরূপা গোপাঙ্গনাগণ প্রেমের রাগ-রঞ্জনে রঞ্জিত করিতেছে। বাসন্তী-রাগে অনুরাগ সঞ্চারিত হইতেছে। বসন্ত সুরঞ্জিত হইতেছে। বসন্ত শ্যামময় ও রাধাময় হইয়া দেব-দোল করিতেছে। সমস্ত বঙ্গদেশ সেই দোলে মাতিয়াছে। শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতময় সেই দোলের আনন্দলহরী প্রবাহিত হইতেছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে আর্য্যঋষি।

ভারতীয় অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যে এক সময় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। আমরা যতই চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা করি, ততই নিত্য নিত্য নূতন নূতন মাধুর্য্যময় তত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়ি। কিছুদিন পূর্ব্বে যে তত্ত্বটি সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস ছিল, সেই তত্ত্বটি পুনর্ব্বার আলোচনা করিয়া দেখিলে অসীম সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হয়; আজীবন আলোচনা করিলেও হয়ত সে তত্ত্বটীর শেষ হইবে না। এই ত গেল ঘরের কথা।

ঘরে ঘরে আমরা যাহা বুঝিলাম, তাহাই ঠিক কি না, এই কথা লইয়া যখন আমরা বিদেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিকট উপস্থিত হই, আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সেই পুরাতন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র এতই উচ্চ শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত যে, তুলনায় উভয়ের পর্ব্বত ও শর্ষপ প্রভেদ। ঋষিগণ যে বাস্তবিকই ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, একথা তাঁহাদের কথিত প্রত্যেক শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ, পাদ, পদ, পদাংশই আমাদিগকে জলদক্ষরে বুঝাইয়া দিতেছে।

আমাদের ঘরের জিনিষ বলিয়াই যে আমরা গোয়ালার দধির ন্যায় তাহার

* পাপ-বিনাশন হরি তমোরূপী। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সাধক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। পক্ষান্তরে আদিরস শ্যামবর্ণ, তাহার দেবতা বিষ্ণু।

প্রশংসা করিতেছি তাহা নহে, বৈদেশিক প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণও এ কথা স্বীকার করিতেছেন। উদাহরণ দেখাই :—

**** "If the physicians of the present day would drop from the pharmacopia all the modern drugs and chemicals, and treat their patients according to the method of Charaka, there would be less work for the undertakers and fewer chronic invalids in the world."

—Geo. H. Clark., M. A., M.D.

ভাবার্থ এই :—"আধুনিক চিকিৎসকগণ যদি বিলাতী ভৈষজ্যরত্নাবলী-উল্লিখিত সমস্ত ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া চরকের মতে চিকিৎসা করিতেন, তাহা হইলে এত মৃত্যুও হইত না আর সংসারে এত লোকও পুরাতন রোগে কষ্ট পাইত না।"

আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিদেশীয় ঔষধই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশের মূল কারণ। এ কথায় আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির অনেকটা আশা করা যাইতে পারে, যে হেতু শিক্ষিতসম্প্রদায় এতদিনের চেষ্টায় বা অভিজ্ঞতার ফলে বিদেশীয় ঔষধ আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এইরূপ কারণনির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে যে দিন বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ এবং অনবরত বিদেশীয় শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যগুলিও শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির কারণশ্রেণীতে তাঁহারা প্রবিষ্ট করাইবেন, সেইদিন জানিব বাস্তবিকই দেশের প্রতি দেশীয়লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

আহা! আর্য্যঋষিদিগের কি জ্ঞানমাহাত্ম্য! কি ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, কি আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, সকলেই একমাত্র জীবহিতৈষণারূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ করিতে গিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো-ভয়াবহঃ"। পাঠক! একবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন, এ কথার গুরুতা কতদূর। সামান্য দুইটি কথায় কি বা প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গের বীজস্বরূপ এ কথাটি লিখিত হয় নাই কি?

এইটি যদি বুঝিতে কষ্টবোধ করেন, তাহা হইলে অন্যদিকে চলুন। চরক-সংহিতার সূত্রস্থান দেখুন, তিনি কি বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,— "কাল

বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতিচ দ্বয়াশ্রয়ানাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ।” অর্থাৎ (শীতোষ্ণাদি), বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং অর্থের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদির) মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগই সকল ব্যাধির মূল কারণ।* পাঠকগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ঋষিগণ কি অর্থযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।

অধুনা স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ নির্দ্দেশ বা তন্নির্দেশ-বিষয়ে চেষ্টা করা এবং প্রাচীন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপযোগিতা আমাদের দেশে কতদূর উপকারী এতদ্বিষয়ের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ আমরা বিদেশীয় চালচলনগুলির অনুকরণ আমাদের হিতজনক কি না, তাহাই সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিব। তাহার পর, দেশীয় খাদ্যাখাদ্যের উপযোগিতা প্রভৃতির বিষয় যথাসাধ্য ও যথাশাস্ত্র দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শরীর-জগতের সঙ্গে বাহ্যজগতের এত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, তাহা আর বলিবার নহে। আমরা মুহূর্ত্তকালও বাহ্যজগতের সাহায্য ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারি না। যাহা সর্ব্বদাই আমাদের শরীরের অভাবপূরণ করিয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিতেছে, তাহা বহির্জগৎ ব্যতীত অন্যত্র পাইবার উপায় নাই। নিশ্বাস লইবার বায়ুটুকু পর্য্যন্ত আমাদের বহির্জগৎ হইতে সাহায্যরূপে চাহিয়া লইতে হয়।

বহির্জগতের বস্তুমাত্রই আমাদের হিতকারী সত্য, কিন্তু অবস্থা ও দেশবিশেষে যে অন্ন ব্যতীত স্বাস্থ্যাবস্থায় জীবনধারণ করা কঠিন হয়, সেই অন্নই রোগবিশেষে মারাত্মক হইয়া পড়ে। যে স্তন্যদুগ্ধ শিশুদিগের একমাত্র জীবনোপায়, সময়বিশেষে তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে হয়। সেইরূপ বহির্জগতের বস্তুমাত্রেই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও অবস্থাবিশেষে বস্তুবিশেষ গ্রহণ করিতে হয়। শীতকালে যদি আমরা বরফপ্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহা

* মিথ্যাযোগ, অযোগ, অতিযোগ এই তিনটি শব্দের অর্থ যদিও সরল ও সহজবোধ্য, তথাপি সন্দেহ নিবারণার্থ একটিমাত্র বিষয়ের উদাহরণ দিতেছি। পাঠকগণ সেই দৃষ্টান্তানুসারে অন্যান্য বিষয়ে অযোগাদির সন্ধান করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। যথা,—কালের মিথ্যাযোগ—শীতকালে শীত না হইয়া বৃষ্টি হওয়া; অযোগ—একেবারেই শীত না হওয়া; অতিযোগ—যে দেশের উপযোগী যতটুকু শীত হওয়া উচিত, তদপেক্ষা অতিরিক্ত শীত হওয়া ইত্যাদি।

হইলে অবশ্যই আমাদের পীড়া হয়। কিন্তু তাই বলিয়া বরফকে একেবারে স্বাস্থ্যের অনুপযোগী বলিতে পারি না।

এইরূপ একদেশের খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতিও অন্যদেশের পক্ষে একেবারেই উপকারী হয় না। যে দেশের আচারব্যবহার, খাদ্যাখাদ্য যেরূপভাবে চলিয়া আসিতেছে, সে দেশের পক্ষে তাহাই ভাল। যে সকল বিদেশীয় ঔষধ আজকাল আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইতেছে, অনেকেরই বিশ্বাস যে, উহা আশু-ফলদায়ক। আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিতে চাহি না। আশু-ফলপ্রদ হইলেও উহা যে আমাদের শরীরের উপযোগী নহে, তাহা সকলেই আজকাল অনুভব করিতেছেন। যে সকল ঔষধে বর্ত্তমান পীড়া শান্তি করে এবং অন্য পীড়া উৎপাদন করে না, তাহাই বাস্তবিক ঔষধ এবং সেই চিকিৎসাই বাস্তবিক চিকিৎসা। যে সকল চিকিৎসায় বর্ত্তমান ব্যাধি শান্তি করে এবং নূতন ব্যাধি উৎপন্ন করে, তাহা বাস্তবিক চিকিৎসা নহে, তাহা ভেল্‌কিমাত্র। এই ভাবেই মহর্ষি সুশ্রুত এই কথাটি বলিয়াছেন ঃ—

"যাত্যুদীর্ণং শাময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ
সা ক্রিয়া নতু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ।"

—সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৩৫ অধ্যায়।

অনেকে অবশ্যই আমাদিগকে বলিতে পারেন, ঔষধ যেরূপই হউক না কেন, মাত্রা স্থির করিয়া দিলেই চলিতে পারে ; অন্যদেশীয় ঔষধসমূহ ব্যবহার করিলে বিশেষ অনিষ্ট কি হইবে ? আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা বলি, দ্রব্যসকলের সাধারণ ধর্ম্মানুসারে যেরূপ কার্য্যকারিতার উপলব্ধি হয়, উহাদের বিশেষ ধর্ম্মানুসারে আবার সাধারণ দ্রব্য ধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য করিয়াও থাকে। এরূপ বিশেষ ধর্ম্মকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বীর্য্য ও প্রভাব কহে। কেহ কেহ বিপাক নামক অপর একটি বিশেষ ধর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত।

দ্রব্যসকল সাধারণ ধর্ম্মানুসারে হিতকর বা অহিতকর হইলেও বীর্য্যানুসারে বিপরীত ধর্ম্ম প্রদর্শন করে, যথা কথবেল ও আমলকী। কথবেল ও আমলকীর সাধারণতঃ ধর্ম্ম-সাম্য থাকিলেও কথবেল সংগ্রাহী, আমলকী ভেদক। যথা—

"কপিত্থঃসংগ্রাহী ভেদিচামলকং যথা"—চরক, সূত্রস্থান।

সেইরূপ বিদেশীয় ঔষধ প্রয়োগে আপাততঃ ফল পাইলেও, তাহার পরিণাম যে বিষময়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেহেতু শীতপ্রধান দেশজাত উষ্ণবীর্য্য ঔষধ উষ্ণপ্রধান দেশের পক্ষে কোনক্রমেই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। বর্ত্তমান অম্লরোগ ও শিরঃপীড়ার এত পরিমাণ বিস্তৃতির কারণও বোধ হয় ঐরূপ।* ঔষধের মাত্রা যাহাই হউক না কেন, তাহার বীর্য্য কিছুতেই যাইবার নহে। এই ত গেল সাধারণতঃ ঔষধের কথা। এখন দেখুন, পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ অনিষ্টোৎপাদক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থলই উষ্ণপ্রধান। উষ্ণপ্রধান দেশে শ্বেত ও সূক্ষ্ম বস্ত্র উপকারী ও ব্যবহার্য্য। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা যদি পুরু ও রঙ্গীন এবং পশমি বস্ত্র সর্ব্বদা ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমরা কতটা অনিষ্ট লাভ করিয়া থাকি, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। চৈত্রমাসের বেলা দুপ্রহরে আমাদের পক্ষে শীতল গৃহে বসিয়া পাখার বাতাস সেবন করা আবশ্যক ; সেই সময় কোট্‌পেণ্টালুন্‌ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া কি আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ নহে? কেমন সুন্দর কালমাহাত্ম্য! যাঁহারা আপিষে চাকরী করেন, তাঁহাদের অবশ্যই দায়ে পড়িয়া পরিতে হয়, কিন্তু অনেকে আবার স্বাস্থ্যরক্ষার্থই ঐরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন।

এখন দেখুন, আহারের পরিবর্ত্তনে আমাদের কতদূর অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা বাঙ্গালী; আমাদের দেশ উষ্ণপ্রধান। আমাদের পাচক অগ্নি অতিশয় দুর্ব্বল। আমাদের আহার্য্যবস্তুর মধ্যে অন্নই প্রধান। তাহাও বেশ একটু পুরাতন হওয়া আবশ্যক, নহিলে উদরের পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমাহাত্ম্য এত অধিক যে, ঐরূপ দুর্ব্বলাগ্নি সত্ত্বেও কালিয়া, কোর্‌মা, পলান্ন এবং যিনি কিঞ্চিৎ অর্থশালী লোক, তাঁহার সাহেবি-খানা ব্যতীত পছন্দ হয় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাবুরা উক্তরূপ আহারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ডাক্তার কবিরাজকে প্রণামী দিতেও ত্রুটি করেন না। কিন্তু দিলে কি হইবে? যেমন অসুখটি সারিয়া গেল, অমনই আহারের নিয়মও পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দাঁড়াইল। এইরূপ পুনঃ

* এই নিয়ম যে কেবলমাত্র আমাদের পক্ষেই বিরুদ্ধ, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য তাহা নহে। ইউরোপ প্রভৃতি ভিন্নদেশীয় লোকও যদি সেই দেশে আমাদের ন্যায় আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও এই দুর্গতি হইতে দূরে থাকিতে পারিবেন না।

পুনঃ অজীর্ণরোগাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ শরীর দুর্ব্বল হইতে চলিল, অবশেষে পাচকাগ্নি বিকৃত হইয়া যাওয়াতে অম্ল প্রভৃতি রোগ শরীরটিকে অধিকার করিয়া বসিল। ঐরূপ রুগ্নশরীরে যে সকল সন্তানসন্ততি হইতে চলিল, তাহারা জন্মাবধিই দুর্ব্বলপ্রকৃতি ও অজীর্ণরোগী বলিয়া পরিচিত হইল। আজ পেটের পীড়া, কাল সর্দ্দি, পরশ্ব যকৃৎ ইত্যাদি বহুবিধ রোগ আসিয়া জুটিল। কেহ বা ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। যাহারা ইহার পরও বাঁচিয়া রহিল, তাহারা জীবন্মৃতই রহিল। যৌবনে কি সুখ, তাহা অনুভব করা তাহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িল। ইহাদেরও আবার সন্তানসন্ততি হইতে লাগিল। সে সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা আর তুলিয়া কাজ নাই।

স্বাস্থ্যভঙ্গের আর একটী কারণ স্কুল ও কাছারি। কাছারির বড়বাবু হইতে ক্ষুদ্রতম বাবু পর্য্যন্ত সকলকেই ১০টার সময় যাইয়া খাতায় নাম লিখিতে হইবে। কাজে কাজেই দুচারিটি অন্ন নাকে মুখে দিয়া, প্রাণ থাকে আর যায় এই হিসাবে উদ্দিষ্ট স্থলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকেরও এই দশা। শাস্ত্রে বলে "মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ।" এই বচনের সত্যতা বোধ হয়, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। অনেকেই ভুক্তভোগী, অধিক কথায় কাজ কি? স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একটীমাত্র কথা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। বিলাতে কথাতেই বলে

"After dinner walk a mile,
After supper rest a while"

অর্থাৎ গুরুতর ভোজনের পর এক মাইল ভ্রমণ ও অল্প ভোজনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম উচিত। এদিকে আমাদের বিজ্ঞান বলিতেছে ঃ—

"ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্নক্লমোগতঃ
ততঃ পাদশতং গত্বা বামপার্শ্বেন সংবিশেৎ"—সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অধ্যায়।

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভোজনের ক্লান্তিদূর না হয়, ততক্ষণ রাজার ন্যায় (অর্থাৎ সুবিধা ও আরামের সহিত) উপবেশন করিবে ও তৎপরে শতপদ মাত্র গমন করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। এখন বিবেচনা করুন, এক গাছের পাতা অন্য গাছে কেমন করিয়া যোড়া লাগে? এরূপ একটা নূতন কার্য্য করিতে গেলে, ফলটাও যে একটু নূতন রকম হইবে, তাহাতে সন্দেহ আছে কি?

ইংরাজী, পারসী প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়নও যে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, তাহা আর দেখাইবার আবশ্যক নাই। মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন-প্রথা তিরোহিত হইয়াছে, অতএব সে বিষয়ের আলোচনা অনাবশ্যক। ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন ব্যতীত আজিকালি আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নাই, অতএব ঐরূপ অপরিহার্য্য বিষয়ের দোষগুণ সমালোচনা করিবার প্রয়োজন একেবারেই নাই। পাঠক, একটুমাত্র অনুধাবন করিয়া মুসলমান-রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতবাসীর বলবীর্য্য ও আচারব্যবহারের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন, অপরদেশীয় ভাষা শিক্ষা করায় কিছু ফল আছে কি না! শব্দবিশেষের উচ্চারণবিশেষের জন্য যে বিভিন্ন ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহবিবাদ পর্য্যন্ত যে বিষয় লইয়া চিন্তা করিবেন, সেই বিষয়েই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, পরধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পরের নামগন্ধটিও অপরের পক্ষে অনিষ্টকারক কি না! (ক্রমশঃ)

শ্রীমণিমোহন সেন।

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন অবস্থা।

(১)

আজি কালি বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া জেলার একটী সব্‌-ডিবিসন বা উপবিভাগ। ইহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একটী ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারালয়, একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে মাত্র। যখন এই সকল বিচারালয় ছিল না, তখনও এতদ্দেশস্থ ব্যক্তিগণ বিষ্ণুপুরকে, ইহার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, পল্লীগ্রাম বা সাধারণ পল্লীগ্রামের উপর গণ্ডগ্রাম বলিতেও সঙ্কুচিত হইতেন। বিষ্ণুপুর একটী নগর, এ কথা পূর্ব্বাপর সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরাও তজ্জন্য ইহার পূর্ব্ব গৌরবের অপচয় করিতে কোনমতে প্রস্তুত নহি, সুতরাং এক্ষণে ইহাতে নাগরিক সাধারণ বিভবের অস্তিত্ব না থাকিলেও নিরাপত্তিতে ইহাকে একটী নগর বলিতে সম্মত আছি।

বিষ্ণুপুর অতি প্রাচীনকালের একটী পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্দ্ধমান হইতে ইহা ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত এবং বাঁকুড়া সদর-ষ্টেশন্ হইতে ৩০ মাইলেরও কিছু বেশী। বিষ্ণুপুর অতি রমণীয় স্থান। ইহার পথঘাটগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; লোকালয়গুলি সুন্দররূপে শ্রেণীবদ্ধ; হাটবাজারগুলি দেখিলে ইহাকে কোন অংশে আজিকালিকার ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত নগর অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে সেখানে দেবালয়; সহজে তাহাদের সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। দেবালয়গুলি প্রাচীন পদ্ধতিক্রমে নির্ম্মিত; দেখিলে পুরাকালের স্থপতিবিদ্যার প্রভূত পরিচয় লাভ করা যায়। নগরের সকল স্থানেই কাকাক্ষিবর্ণের জলরাশি-পরিপূরিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয়। ইহারা দেশীয় লোকের দ্বারা "বাঁধ" নামে অভিহিত। নগরটীর আয়তন বর্দ্ধমান ও হুগলী অপেক্ষা অনেক বড়—দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক। ইহার অনতিদূরেই বন—মহাসমুদ্রের ন্যায় পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, চতুর্দ্দিকেই প্রসারিত; অথচ স্থানে স্থানে জনস্থান ও শস্যক্ষেত্রে পরিব্রাজকদিগের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুর মল্লভূমির রাজাদিগের রাজধানী ছিল। বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার সমগ্র ভূভাগ এককালে তাঁহাদিগের শাসনাধীন ছিল। বিষ্ণুপুর বড় অল্পদিনের নগর নহে এবং বিষ্ণুপুরের রাজবংশও আধুনিক নহে। বঙ্গদেশে যখন পাল-বংশীয় নরপতিগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহারও শতবর্ষ পূর্ব্বে মল্লভূমির রাজবংশের আদিপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া আপন রাজ্যের ভিত্তি-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর কথা।

এই রাজবংশের আদিপুরুষের নাম রঘুনাথ সিংহ। তিনি পবিত্রতীর্থ বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী জয়নগরের রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন। একদা জয়নগরাধিপতি তীর্থপর্য্যটনে অভিলাষী হইয়া সস্ত্রীক পুরুষোত্তম দর্শনে যাত্রা করেন। রাজমহিষী সসত্বা ছিলেন। যৎকালে তাঁহারা অধুনাতন বিষ্ণুপুরের পূর্ব্বদিকৃবর্ত্তী লাউগ্রাম নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন, তৎকালে মহিষীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তিনি যথাকালে অরণ্যমধ্যে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। রাজা দেখিলেন, সেই সদ্যপ্রসূত সন্তানসহ সহধর্ম্মিণীকে লইয়া তীর্থযাত্রা অতীব কষ্টকর। রথ-যাত্রার সময় অতি নিকট; রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে ঈদৃশ পুণ্যরাশি

সঞ্চিত হয় যে, আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ; নিশ্চয়ই স্বর্গ-লাভ হইয়া থাকে। পাছে রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধি করিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় নবপ্রসূত শিশুকে তাহার জননীর সহিত সেই হিংস্রজন্তু-সমাকুল অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়া রাজা নিজ অভীপ্সিত স্থানে যাত্রা করিলেন। প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্মপিপাসা ঈদৃশ বলবতী ছিল যে, প্রিয়তমা পত্নী এবং প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকেও হিংস্রজন্তুর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হইতেন না। স্বধর্ম্মে অচলা ভক্তি এবং অটল বিশ্বা-সের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছিলেন যে, ভগবান হরি সেই অসহায়া রাজপত্নীর সহায় হইয়া তাঁহাকে পুত্রের সহিত নিরাপদে রক্ষা করিবেন। কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। রাজা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পরেই কুশমেটে নামক বাগ্দী-জাতীয় এক ব্যক্তি বনমধ্যে কাষ্ঠাহরণে আসিয়াছিল। সে সেই সদ্যজাত শিশু-পুত্রটিকে বনমধ্যে একাকী পতিত থাকিতে দেখিয়া তাহাকে আপন বাটীতে লইয়া যায়। রাজসীমন্তিনীকে সে দেখিতে পায় নাই। তিনি আপন শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যে পলায়ন করিয়াছেন, একথা কোনমতে সম্ভাবনাযোগ্য হইতে পারে না। নিশ্চয়ই তাঁহাকে যে, বন্যজন্তুর করাল কবলে নিপতিত হইয়া জীবনরত্নে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

রাজপুত্র কুশমেটের গৃহে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। সাত বৎসর বয়সের সময় এক ব্রাহ্মণ, তাঁহার অসাধারণ রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া এবং তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রাজচিহ্ন সকল স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে বাগ্দীবাড়ী হইতে আপন ভবনে লইয়া গেলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের বিষ্ণুপুর-অঞ্চলে ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। এই ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র ছিলেন, এজন্য রাজপুত্রকে গোচারণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাগ্দীগৃহে অবস্থিতিকালে বাগ্দীরা তাঁহার নাম রঘুনাথ রাখিয়াছিল। এজন্য ব্রাহ্মণালয়েও তিনি সেই নামে অভিহিত হইতেন। বাল্যাবধি বাগ্দীগৃহে লালন-পালনপ্রযুক্ত বাগ্দীরা তাঁহাকে আপনাদিগের স্বজাতীয়ের ন্যায় জ্ঞান করিত, এবং যথেষ্ট স্নেহ যত্ন করিত। যখন তিনি গোচারণে যাত্রা করিতেন, তখন অন্যান্য বাগ্দীবালকেরা আপনাপন গোরু লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইত।

তাহারা গোরু ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত খেলা করিত, গ্রাম্যগাথা গাইত এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে গোচারণ-ক্লেশ ভুলিয়া যাইত। রঘুনাথের জনক জননী না থাকায় এবং তিনি দেখিতে সর্ব্বজনহৃদয়রঞ্জক ছিলেন বলিয়া রাখালগণ তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিত। এই ভালবাসার জন্য অনেকে রঘুনাথের গবাদি আপনারা চরাইয়া রঘুনাথের পরিশ্রম বাঁচাইয়া দিত। এজন্য রাখাল হইয়াও তাঁহার ততটা কষ্ট ছিল না।

একদিন সকল রাখাল গোরু চরাইবার পর আপনাপন গোরু লইয়া বাড়ী আসিতেছিল, এমন সময় রঘুর পালের একটী গাভী যূথভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে চলিয়া যায়। রঘু তাহার অন্বেষণে বনে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্তিপ্রযুক্ত একটি বৃক্ষতলে ঘুমাইয়া পড়েন। বেলা অবসান হইয়া আসিল, তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। প্রতিপালক ব্রাহ্মণ, রঘুকে প্রত্যাগত না দেখিয়া অন্যান্য রাখালদিগকে জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন, গাভী হারাইয়া রঘু বনে বনে তাহা খুজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রাহ্মাণ তাঁহাকে অপত্যবৎ স্নেহ করিতেন, কিন্তু অবস্থা ভাল নহে বলিয়া তিনি রঘুকে গোপালনের কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন; নতুবা তাঁহার কোনমতে ইচ্ছা ছিল না যে, রঘুনাথকে রাখালী করিতে দেন। স্নেহের প্রবলতাপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণ, রঘুর বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। গাভীর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ক্লান্তিপ্রযুক্ত রঘুনাথ এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই শন্তিদায়িনী নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছিল। তিনি নিদ্রাগত হইলে, অস্তগমনোদ্যত সহস্রাংশুর অংশুমালা পাছে তাঁহার সুকুমার মুখমণ্ডল তাপিত করে, এজন্য একটী শুভ্রকায় ভুজঙ্গ আপনার বিচিত্র ফণা বিস্তারিত করিয়া তাঁহাকে ছায়া দান করিতেছিল। রঘুর অন্বেষণে বাহির হইয়া প্রতিপালক ব্রাহ্মণ নানা স্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক বনমধ্যে যখন তাঁহাকে সর্পফণাতলে শায়িত দেখিলেন, তখন তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার প্রাণের রঘু আর নাই, ভুজঙ্গ-দংশনে নিশ্চয় প্রাণ হারাইয়াছে। তখন তিনি—হায়! হায়!! কি ঝকমারি করিয়া রঘু তোমায় গোরু চরাইতে পাঠাইয়াছিলাম, গোরু চরানই তোমার কাল হইল—আহা! আমি কেমন করিয়া দশজনের নিকট মুখ দেখাইব, পুনঃ পুনঃ এই বলিয়া রোদন করিতে

লাগিলেন। ব্রাহ্মণের ক্রন্দনশব্দে অহি, ফণা সঙ্কুচিত ও অবনত করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল এবং সূর্য্যোত্তাপে রঘুর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে রঘুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন—যে দিন হইতে বাগ্দীর বাড়ী হইতে আনিয়াছি, সেই দিন হইতে এক মুহুর্ত্তের জন্য তোমাকে চক্ষের আড়াল করিতে পারি নাই, তোমাকে পাইয়া আমি সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়াছি; না জানি, আজি কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়াছিল! আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসি—আর কখনও তোমায় গোরু চরাইতে পাঠাইব না। গোরু, খাইতে না পাইয়া মরিয়া যায় যাউক, আর তুমি গোরু চরাইও না। বলিতে বলিতে অশ্রুজলে ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

প্রাবৃট্কালে যখন শস্যক্ষেত্রসকল জলরাশিতে পরিপূর্ণ হয়, তখন রঘু এক দিন মৎস্য ধরিবার জন্য মাঠে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি জলমধ্যে একটী স্বর্ণ-গোলক কুড়াইয়া পাইয়া তাহা ব্রাহ্মণকে আনিয়া দেন। সেই দিন ব্রাহ্মণ, রঘুনাথের অঙ্গে রাজচিহ্ন দর্শনের সার্থকতা অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার রঘু, কালে একজন অসাধারণ লোক হইবেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে সেই স্থানের পূর্ব্বতন রাজা পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার শ্রাদ্ধে মহা সমারোহ হয়। নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণেরা সমাগত হয়েন। রঘুনাথের প্রতিপালক ব্রাহ্মণও রঘুকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণভোজন হইতেছিল; আমাদিগের প্রবন্ধোক্ত ব্রাহ্মণও আহার করিতেছিলেন; রঘু বাহিরে ছিলেন। এমন সময় রাজহস্তী রঘুর নিকটবর্ত্তী হইয়া শুণ্ডদ্বারা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। ইহা দেখিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল; ভাবিল, রাজার মৃত্যুতে রাজহস্তী বুঝি পাগল হইয়া বালকটীর প্রাণবধ করে। এরূপ সাহস কাহারও হইল না যে, হস্তীর শুণ্ড হইতে রঘুনাথের উদ্ধারসাধন করে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আহার হইল না। তিনি আহার পরিত্যাগ করিয়া উঠিতেছেন, এমন সময় রাজহস্তী রাজসিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইয়া রঘুনাথকে তাহাতে সংস্থাপিত করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে একটা আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। সকলেই এই রাজনির্ব্বাচনকে দৈবনির্ব্বাচন বিবেচনা করিয়া স্তম্ভিত হইল। মন্ত্রীগণ রঘুনাথকে সর্ব্বাগ্রে রাজসম্মান প্রদান করিলেন। তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট স্থাপিত হইল। ভৃত্যগণ চামর ব্যজন করিতে

লাগিল। কেহ বা তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। বন্দীরা স্তুতিগান আরম্ভ করিল। বাদ্যকরে মঙ্গল বাজনা বাজাইতে লাগিল। মধুর সঙ্গীতে সকলেই মোহিত হইল। রাজ্যের সর্ব্বত্র রঘুনাথের অভিষেক ঘোষিত হইল*।

রাখাল রঘুনাথের রাজ্যপ্রাপ্তি সাধারণের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও যাঁহারা তাঁহার জন্মবিবরণ ও আভিজাত্য জানিতেন, তাঁহাদিগের বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না। রঘুনাথ রাজপুত্র—দৈববিড়ম্বনায় অন্ত্যজগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। নতুবা তিনি রাজপুত্র, রাজা হইলেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে ঘটনাচক্রটী অত্যাশ্চর্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। সেকালে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যে সকল সবলকায় মহাবল বাগ্দী বাস করিত—বলশালিত্ব হেতু তাহাদিগের "মল্ল" আখ্যা ছিল। রঘুনাথ মল্লদিগের প্রথম বলিয়া, তিনি বিষ্ণুপুর রাজ-বংশে"আদিমল্ল"নামেই সমধিক পরিচিত। আদিমল্ল, বাগ্দীগৃহে প্রতিপালিত বলিয়া, বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে সাধারণ লোকে বাগ্দীরাজা বলিয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে যে তাঁহারা বাগ্দীজাতীয় ছিলেন না, এই প্রবন্ধপাঠে সে সন্দেহ অপনীত হইবে।

---

*কেহ কেহ বলেন—রঘুনাথ বালককালে যে লাউগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মণালয়ে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, সেই লাউগ্রামে পূর্ব্বে একজন রাজা ছিলেন। রাজা অতিথিপালন করিতেন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সকল সন্ন্যাসী জগন্নাথদর্শনে যাইতেন, তাঁহারা প্রায়ই এই স্থানে অবস্থিতি করিতেন। রঘুনাথ এই সকল সন্ন্যাসীর সহিত বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা করিতেন বলিয়া তাঁহারা সকলেই রঘুনাথকে স্নেহ করিতেন। লাউগ্রামের রাজা বড় প্রজাপীড়ক ছিলেন। সন্ন্যাসীগণের সমক্ষে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উৎপীড়ন করায় তৎকালে যে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত এবং রঘুনাথকে রাজ-লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া তাঁহাকেই সিংহাসন অর্পণ করেন। লাউগ্রাম এক্ষণে হুগলী জেলার জাহানাবাদ সব্-ডিবিসনের পশ্চিমাংশের অন্তর্গত।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সন্ন্যাসী।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্ন চাক্রিয়ঃ॥"—গীতা ,৬,১।

যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য-বোধে বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী—অগ্নিসাধ্য ইষ্টাদি-কর্ম্মত্যাগীও নহেন, আর অনগ্নিসাধ্য পূর্ত্তাদি-কর্ম্মত্যাগীও নহেন। আর যিনি কাহারও দ্বেষ করেন না, কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নাই, তিনি নিত্য-সন্ন্যাসী।

যিনি জানেন—পার্থিব বস্তু অনিত্য; ভোগেচ্ছার আসক্তিই সর্ব্বনাশের মূল, মোক্ষই জীবের একমাত্র লক্ষ্য, তিনিই সন্ন্যাসী। আর যিনি ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া, বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইয়া বিশ্বহিতের জন্য সর্ব্বত্যাগী, তিনিও সন্ন্যাসী এবং তাঁহার সেই বিশ্বহিত-ব্রতই সন্ন্যাস-ব্রত। মহামুনি শাক্যসিংহ রাজপুত্র হইয়াও, অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়াও, ভোগেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা স্ত্রীর ও প্রাণ-পুত্তলী সন্তানের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, বিশ্বহিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া, যে ব্রত ধারণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন, তাহাই সন্ন্যাস-ব্রত। যে ব্রতের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া, তিনি মানবহিতের জন্য, জীবের উদ্ধারের জন্য, অনায়াসে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ব্রতই সন্ন্যাস-ব্রত। যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়া চৈতন্যদেব মাতা, পিতা ও ভার্য্যাদির মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া কৌপীন পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষান্নে নির্ভর করিয়া, বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইয়া, ভগবৎ-প্রেমে—হরিনামে সমস্ত বঙ্গদেশ আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, হরিপ্রেমে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ব্রতই সন্ন্যাস-ব্রত। যখন তান্ত্রিকগণের কদাচারে দেশ কলুষিত; অজ্ঞানতিমিরে দেশ তমসাচ্ছন্ন; স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসকল যখন লুপ্তপ্রায়; যখন জ্ঞানকাণ্ড অতলজলে নিমজ্জিত; যখন ধর্ম্মবিপ্লবে পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল; তখন সেই তমসাচ্ছন্ন ভারতাকাশে অকস্মাৎ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গৌরচন্দ্রের উদয় হইল; অন্ধকার তিরোহিত হইল; বিশ্বপ্রেমের নির্ম্মল আলোকে পাশবাচার ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইল। হঠাৎ দৈববাণীর ন্যায় শব্দ উত্থিত হইল—

"সকলেই হরিপ্রেমের সমান অধিকারী, হরিনামেই জীবের মুক্তি—"হরের্ণামৈব কেবলং"। এই ব্রতে ব্রতী হইয়াই তিনি অকাতরে বিশ্বের জন্য, সর্ব্বভূতের জন্য, জীবের উদ্ধারের জন্য, নিজ স্বার্থকে বলি দিয়া, নিজের সত্তা জগতের সহিত মিশাইয়া, আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আজিও তিনি দেবভাবে পূজিত। আজিও তাঁহার নামে ভক্তের নয়নে প্রেমাশ্রু উপস্থিত হয়। আজিও তাঁহার মধুর হরিসংকীর্ত্তনে ঘোর পাপীর কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়। ধন্য আত্মোৎসর্গ! ধন্য তাঁহার ব্রত!

ভারতে হিন্দু-যবন-সংঘর্ষণ-কালেও আমরা এই স্বদেশহিতৈষী সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল চরিত্র দেখিতে পাই। যখন দুরন্ত যবন কালান্তক যমের ন্যায়, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সিন্ধুনদী পার হইয়া অমিততেজে ভারত আক্রমণ করিল, তখন ভারতের কত সুসন্তান নিজ রক্তে আর্য্যভূমি রঞ্জিত করিল, জন্মভূমি-রক্ষার জন্য অকাতরে যবন-সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া দিব্যলোক প্রাপ্ত হইল। যখন যবন-রাহুর করালগ্রাসে হিন্দুস্বাধীনতা-সূর্য্য কবলিতপ্রায়; যখন যবন-পদাঘাতে ভারত কম্পিত, রাজাসন কম্পিত ও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত; যখন নরপিশাচগণের পৈশাচিক আচরণে আর্য্যধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়; তখনও—সেই অধঃপতনের সময়ও—বিজয়লক্ষ্মীর চির-অন্তর্ধানের সময়ও—আমরা এই স্বদেশহিতৈষী, ধর্ম্মপ্রাণ, বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসীর জ্বলন্ত চরিত্রের আদর্শ দেখিতে পাই। যবনগণের পদানত হইয়াও, বীরকেশরী মহারাজ সমর সিংহ, স্বজাতির স্বার্থে—স্বদেশের স্বার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়া, আত্মসুখের পূর্ণাহুতি দিয়া, স্বদেশের উদ্ধারের জন্য, জয়লক্ষ্মীকে যবনহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, সর্ব্বত্যাগী হইয়া এই কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সামান্য ছিন্নবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, যদৃচ্ছালব্ধ বন্য ফলমূল ভক্ষণে ভিক্ষুকবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সার্থক তাঁহার জন্ম! ধন্য তাঁহার প্রতিজ্ঞা!

স্বজাতি-প্রেমে, বিশ্ব-প্রেমে বা ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া শাক্যসিংহ, চৈতন্যদেব ও সমর সিংহ যে সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অন্য উদাহরণ জগতে দুষ্প্রাপ্য। ইহাঁদিগের নাম আজিও ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত এবং ভারতবাসীর মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সন্ন্যাস-ব্রতের মাহাত্ম্য বুঝিয়াই,

বিশ্বহিতের জ্বলন্ত অনলে নিজ স্বার্থের পূর্ণাহুতি দিয়া, রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ বিশ্বামিত্র এই ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। এই ব্রতের মহিমায় তিনি জগতে যে কীর্ত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যুগযুগান্তেও তাহা লুপ্ত হইবে না। তিনি তপোবলে নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে রাজন্যবর্গও নতশীর। রাজা বিশ্বামিত্রকে কয়জনে চিনিত; কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্র জগতে বিদিত—সর্ব্বত্র পূজিত।

যখন ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হয় নাই, যখন পবিত্র আর্য্যভূমি ধরার অমূল্য রত্ন ছিল, যখন ভারতের যশোগানে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত হইত, তখন সেই গৌরবের দিনে এই ভারতভূমি এইরূপ বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীগণের পবিত্র নিকেতন ছিল। সেই আধ্যাত্মিক সন্ন্যাসীগণের গৌরবে জগৎ উদ্ভাসিত হইত। তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমের মোহিনী-শক্তিতে মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, হিংস্র পশুরাও হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া যাইত। তাঁহাদের আশ্রমে ব্যাঘ্র হরিণে একত্র বাস করিত। তাঁহাদের আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া রাজাধিরাজও তাঁহাদের নিকট নতশীর হইয়া স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিয়া ধন্য হইতেন।

আবার, সুদূর ইউরোপখণ্ডের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, এই আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইবে। যখন বহুশতাব্দীর দাসত্ব-শৃঙ্খলে ইটালী জর্জ্জরিত, তখন ইটালীর কষ্টে, ইটালীর সকরুণ আর্ত্তনাদে একজন প্রেমিকের হৃদয় গলিল। মহাত্মা গ্যারিবল্ডি স্বদেশপ্রেমে সর্ব্বত্যাগী হইয়া, মানবহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়া এই কঠোর সন্ন্যাস আশ্রয় করিলেন। দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় যাঁহার নিদ্রা হইত না, অপূর্ব্ব সুরম্য অট্টালিকা যাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতে পারিত না, যিনি সর্ব্বদা সুবর্ণে মণ্ডিত থাকিয়া বিলাসিতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন; তিনি আজ চীরধারী, তিনি আজ ভিক্ষুক, স্বদেশ উদ্ধারের জন্য তিনি আজ লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। স্বদেশ-প্রেমে তিনি আজ সন্ন্যাসী। প্রিয় জন্মভূমির দাসত্ব মোচনের জন্য, স্বজাতির উদ্ধারের জন্য, উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি আজ এই কঠোর ব্রতাবলম্বী। এই সন্ন্যাসীর নিয়ত চেষ্টায় ও অর্দ্ধ শতাব্দীর যত্নে ইটালীর স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপিত হইল, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস-ব্রতের উদ্‌যাপন হইল।

দারিদ্র্যও এক প্রকার সন্ন্যাস। দরিদ্র স্বভাব-সন্ন্যাসী। দরিদ্রের সাধনা

অতি কঠোর। দরিদ্রের পদে পদে বিপদ, তাই তাহার দৃঢ় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। তাহার চারিদিকেই অভাব, সুতরাং অভাবে উপেক্ষা করিতে হয়। দরিদ্র নিজের অভাবে কষ্ট পায়, তাই অপরের অভাব শীঘ্রই বুঝিতে পারে। আপনি অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, তাই পরের ক্লেশে তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, তাই সে অশ্রুজলে পরের দুঃখ লাঘব করিতে যায়। দরিদ্র জগতে ভালবাসা পায় না। ভালবাসার অভাবে মর্ম্মান্তিক যাতনার শক্তিশেল তাহার বক্ষে প্রোথিত রহিয়াছে, তাই সে পরকে ভালবাসিতে শিখে, পরের দুঃখে অন্তঃকরণ গলাইতে জানে, তাই সে নিজের অশ্রুজলে ব্যথিতের মর্ম্মব্যথা বিধৌত করিতে যায়।

দরিদ্রে ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ অল্প। পর্ণকুটীর ও তরুতল উভয়েরই বাস-স্থান। উভয়েই চীরধারী। উভয়েই ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করে, সঞ্চয়ের ধার ধারে না। তবে প্রভেদ এই যে, সন্ন্যাসীর এই অবস্থা স্বেচ্ছাকৃত, দরিদ্রের দৈব-নির্দ্ধারিত। সন্ন্যাসী, পার্থিব বস্তুর অনিত্যতা বুঝিয়াছেন, তাই তিনি সর্ব্বত্যাগী। দরিদ্র, পার্থিব সুখের প্রার্থী কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় তাহাতে বঞ্চিত। স্বেচ্ছাকৃত হউক বা দৈব-নির্দ্ধারিতই হউক, ব্রত-পালনের ফল কিন্তু উভয়েরই একরূপ। সহিষ্ণুতা, সংযম, আত্মত্যাগ, পরদুঃখে কাতরতা প্রভৃতি যে সকল গুণে মনুষ্য দেবতা হয়, এই ব্রত-পালনে দরিদ্রের সেই সকল গুণ স্বতঃই অভ্যস্ত হয়। সুতরাং দরিদ্র অনিচ্ছায় সন্ন্যাসী—দীক্ষা ব্যতীত দীক্ষিত। যে দরিদ্র এই স্বভাব-সন্ন্যাস-ব্রতের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছে, সে মনুষ্য হইয়াও দেবতা, সে জগতের পূজনীয়। ভারতবর্ষে আবার এই কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত ধারণের আবশ্যক হইয়াছে—এই আত্মোৎসর্গের দিন আসিয়াছে। এই স্বভাব-সন্ন্যাস-ব্রতে ঘৃণাই জাতীয় পতনের মূল।

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

কোম্পানীর জমিদারী।

(২)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি—কোম্পানী কি প্রকারে এদেশে প্রথম ভূস্বামিত্ব লাভ করিয়া "জমিদার" আখ্যা প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে, কি প্রকারে তাঁহারা তাঁহাদের জমিদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং কি প্রকারেই বা সেই ক্ষমতার পরিপুষ্টি-সাধন হইয়াছিল, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

জমিদার হইয়া কোম্পানীর ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল। বাঙ্গালার অন্যান্য জমিদারদের ন্যায় তাঁহারা আংশিক ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। চট্টগ্রাম জয় করিবার ইচ্ছা ইহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তখন কলিকাতা আমিরাবাদ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোম্পানীর জমিদারীর অধিকৃত ভূমির পরিমাণ ছয় হাজার বিঘা এবং তাহা হইতে তাঁহারা প্রত্যেক বিঘায় গড়ে তিনটাকা হারে কর সংগ্রহ করিতেন! এই সমস্ত খাজনা ছাড়া তাঁহাদের জমিদারীর মধ্যে আরও লাভের পথ ছিল। সাধারণ ব্যবহার্য্য, গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির উপরও কর নির্দ্ধারণ বা শুল্ক আদায় করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। ধান্য, চাউল, তামাক, ঘৃত, সুতা, তৈল, কার্পাস, পান, এমন কি কলাপাতার উপরও তাঁহারা শুল্ক আদায় করিতেন।*

এতদ্ব্যতীত কয়েক শ্রেণীর-দ্রব্যাদির একচেটিয়া বিক্রয়-স্বত্ব প্রদান করিয়া তৎবিক্রেতাদিগের নিকট হইতে তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে শুল্ক আদায় করিতেন।†

কোম্পানীর জমিদারীর মধ্যে লোকসংখ্যার আধিক্য-নিবন্ধন তাহাদের

---

* প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার মার্শম্যান সাহেব বলেন, এই সকল শুল্কের হার শতকরা ৯, টাকারও উপর হইত। Cal. Rev., Vol. III., p. 450.

† নিম্নলিখিত দ্রব্য-বিক্রেতাগণকে একচেটিয়া দ্রব্যবিক্রয়-স্বত্ব দেওয়া ছিল ;—

(১) গ্লাস নির্ম্মাতা (২) সিন্দুক নির্ম্মাতা, পুরাণ ও ব্যবহৃত লৌহ বিক্রেতা (৩) সিন্দুর বিক্রেতা (৪) অগ্নিক্রীড়ার (বাজীর) দ্রব্য বিক্রেতা (৫) তাঁতের দ্রব্য নির্ম্মাতা।

মধ্যে বিচার বিতরণের জন্য কলিকাতার সীমার মধ্যে তাঁহারা নূতন কাছারী স্থাপন করিলেন। জমিদারী পাইবার অব্যবহিত পরেই, মুসলমান ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদের প্রজাগণের মধ্যে বিচার বিতরণের জন্য, হুগলীর তদানীন্তন ফৌজদার একজন কাজি প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু বহু পরিমাণে নবাব সরকারে উপঢৌকন প্রদান করিয়া তাঁহারা এই অসুখকর বন্দোবস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। *

কোম্পানী জমিদারীর স্বত্বাধিকারী হইলেও, তাঁহারা জমিদার বলিয়া কথিত হইতেন না। যে কর্ম্মচারী, তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ, বাঙ্গলায় তাঁহাদের অধিকার সমূহের উপর ক্ষমতা পরিচালন করিতেন—দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগেই নেতৃত্ব করিতেন—তিনিই "জমিদার" নামে পরিচিত হইতেন। এই জমিদার প্রায়ই সিবিলিয়ান-দলভুক্ত, ইহাঁকে সাহায্য করিবার জন্য আবার একজন দেশীয় জমিদার নিযুক্ত হইতেন। পাঠক! শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, তৎকালীন কোম্পানীর অধিকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর বেতন দুইশত মুদ্রারও কিছু কম ছিল। তাঁহার সহকারীস্বরূপ যে দেশীয় লোক কার্য্য করিতেন, তাঁহাকে ইংরাজেরা "ব্ল্যাক্ জমিদার" (Black Zamindar) ও দেশীয়েরা "নায়েব জমিদার" বলিয়া ডাকিতেন। প্রকৃতপক্ষে ব্ল্যাক্ জমিদারের ক্ষমতাই প্রধান জমিদারের অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হইত। আজকাল যেমন অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক জমিদারীর প্রজা জমিদার অপেক্ষা নায়েবকে অধিক পরিমাণে ভয় করে, সেকালে ব্ল্যাক্ জমিদারকে, কোম্পানীর প্রজারা তদপেক্ষা অধিক ভয় করিত। †

* Mill—p.13. Wheeler—p.104.

† প্রাচীন কলিকাতার ব্ল্যাক্ জমিদারদিগের মধ্যে গোবিন্দরাম মিত্রের নামই অধিকতর জাজ্বল্যমান। আর কাহারও নাম বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। স্বর্গীয় গোবিন্দরাম কুমারটুলির প্রাচীন মিত্র পরিবারের আদিপুরুষ। ইহাঁদের অন্যতম শাখা এখন বেনারসে প্রভূত সম্মানের সহিত বিরাজ করিতেছেন। সেকালে একটী প্রবাদ ছিল—

"গোবিন্দরামের ছড়ী, উমিচাঁদের দাড়ি, জগৎশেঠের কড়ি।"

গোবিন্দরাম তাঁহার ছড়ীর (লাঠীর) জন্য বিখ্যাত ছিলেন। প্রসিদ্ধ বণিক উমিচাঁদ তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রুর জন্য এবং জগৎশেঠগণ অর্থের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। গোবিন্দরামের সম্বন্ধে বিশদ বৃত্তান্ত জানিতে হইলে, কল্পনা নামক মাসিক পত্রিকার শেষ বৎসরের প্রথম সংখ্যায় মৎ-প্রণীত প্রবন্ধ দেখুন।

নায়েব জমিদার গোবিন্দরাম, ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ত্রিশ টাকা বেতনে প্রথম "ব্ল্যাক্ জমিদার" নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার বেতন ৫০৲ টাকায় পরিণত হয়। এই সকল লোক সেই প্রাচীন সময়ে, সামান্য ৪০৲ বা ৫০৲ টাকার চাকরী করিয়া যে প্রকার অদ্ভূত ও অসংযত ক্ষমতা পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, আজকালকার কালে একজন প্রাদেশিক লেফ্টেনান্ট্ গবর্ণরও তদ্রূপ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন কি না, সন্দেহ। গোবিন্দরাম এই সামান্য উপায়ে যে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া গিয়াছিলেন, আজকালকার কালে অনেক উচ্চপদস্থ প্রচুর বেতনশালী দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটে কি না, সন্দেহ।*

গোবিন্দরাম মিত্র যে সম্পূর্ণ খাঁটি লোক ছিলেন না, এ সম্বন্ধে অনেক কথা মার্শ্ম্যান সাহেব বলিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আমারা দেখিতে পাই, গোবিন্দরাম তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী-দিগের অপেক্ষা দশগুণ অধিক ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। কোম্পানী সেই সময় তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের অতি অল্পহারে বেতন প্রদান করিতেন। একটি সিবিলিয়ানের বেতন যখন দুইশত মুদ্রারও কম, তখন যে তদধীনস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীর বেতন, ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ মুদ্রা হইবে, তাহা কিছু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণের বিশ্বাস ছিল (এই বিশ্বাস বাঙ্গলায় আজ কাল অনেক জমীদারদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়) যে, অল্প বেতন হইলেও তাঁহাদের নিয়োজিত কর্ম্মচারীরা দস্তুরী ও অন্যান্য বন্দোবস্তে প্রজাদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। এ প্রকার প্রথায় অবশ্য আর কাহারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। কিন্তু, প্রজাশোষণ-কার্য্য অতি উত্তমরূপে সম্পাদিত হইত। মাঝে হইতে গরিব প্রজারা মারা যাইত।

---

* ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জন্ জেফানিয়া হল্ওয়েল্ সাহেব এক সময়ে কোম্পানীর অধিকারস্থ জমিদারীর কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দরামের প্রভূত ক্ষমতা সংযত করিবার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। হল্ওয়েল্ সাহেব, গোবিন্দরাম মিত্রজের নিকট হইতে হিসাব নিকাশ দাবি করিলে, তিনি সে দাবি অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেন। এখনকার কালে যদি একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, ডিষ্ট্রীক্ট্ সাহেবের ক্ষমতার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন, তবে তাঁহার পরিণাম কি হয়?

গোবিন্দরাম মিত্র, সেকালের বিষয়বুদ্ধিশালী চতুর কর্ম্মচারী ছিলেন। সেকালের চাকরেরা ন্যায়, অন্যায়, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, উপরি লাভ প্রভৃতিকে অতটা ঘৃণা করিতে জানিতেন না। তখনকার সমাজে অধুনাতন সময়ের মত পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক সম্পূর্ণরূপে বিকীর্ণ হয় নাই। এই জন্য গোবিন্দরাম মিত্র সেকালে নানাবিধ অযথা উপায়ে কোম্পানীর তহবিল হইতে অর্থ শোষণ করিতেন। যে সকল লোক কোম্পানীর কার্য্যে কখনও নিযুক্ত হয় নাই, বা ছিল না, তাহাদের নাম, কর্ম্মচারীর তালিকাভুক্ত করিয়া তিনি উপরি আদায় করিতেন। পথ-ঘাট মেরামত, সাঁকো ও পোল তৈয়ারি প্রভৃতি তৎসময়প্রচলিত অন্যান্য রথ্যা-কার্য্যের প্রকৃত ব্যয় গোপন করিয়া তিনি কখন কখন তাহার দ্বিগুণ দাবি করিয়া বসিতেন। অপরাধীর শাস্তি লাঘব করণে, বা দেওয়ানী মোকদ্দামায় তাঁহার আশ্রিত পক্ষের সুবিধা করণে, গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় স্বীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কোম্পানীর অধীনে সেই প্রাচীনকালে কলিকাতার যে সমস্ত চাকরি খালি হইত, তাহা পূরণ করিবার কালেও গোবিন্দরাম, উপরি পাওনার পথ সরল করিয়া লইতেন। তাঁহাকে দেশীয়েরা ভয় করিত। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা; সেই সময়ের লোকের পক্ষে অতি দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। দেশীয়েরা দূরে থাকুক—তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা, ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। মার্শম্যান সাহেব বলেন গোবিন্দরামের এই প্রকার উৎকোচগ্রহণ-বাসনা, সম্পূর্ণরূপে কেবল তাঁহার নিজের হৃদয়-প্রসূত নহে। তিনি তাঁহার ইংরাজ উপরিওয়ালাদের অনুকরণে নিজের পথ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেই প্রাচীনকালের উচ্চপদস্থ ক্ষমতা-বান রাজকর্ম্মচারীদের উৎকোচগ্রহণ-প্রথা প্রকৃতপক্ষে নিন্দনীয়। গোবিন্দ-রামের বহু পরবর্ত্তী স্বনামখ্যাত ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ ও মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত আছেন, তাঁহারাই এই বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন।

গোবিন্দরামের উন্নতির ও ক্ষমতার স্রোত শীঘ্রই প্রতিহত হইয়া আসিল। দেশীয়েরা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু ইংরাজদের কাণা-ঘুষায় কথাটা বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ

তাঁহাদের নিয়োজিত "ব্ল্যাক্ জমীদারের" পদ উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের মধ্যে এই সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইলেও, চারি বৎসরকাল ধরিয়া তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন একটা নূতন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা নায়েব ও জমিদারের পদ উঠাইয়া দিয়া—হলওয়েল্ সাহেবকে কলিকাতার ও তৎপার্শ্বস্থ ভূভাগ সমূহের জমিদার নিযুক্ত করিলেন। বত্রিশ বৎসরের প্রতাপান্বিত শাসনকার্য্যের পর গোবিন্দরাম মিত্র অমন্তোপায় হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। হলওয়েলের আমলে কোম্পানীর জমিদারীর আয় লক্ষ টাকা হইয়া উঠিয়াছিল।

সওদাগরী ও জমিদারী চালাইয়া কোম্পানী যখন এই প্রকার সৌভাগ্যের সীমায় উপস্থিত—তখন বাঙ্গলার রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বঙ্গেশ্বর মুরশীদ্ কুলী খাঁ মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জামাতা, সুজা খাঁ, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে শাসনকার্য্য চালাইয়া, ১৭৩৯ অব্দে নিজ পুত্র সরফরাজ্ খাঁর হস্তে শাসনদণ্ড অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সরফরাজের হাত হইতে শেষে, আলিবর্দ্দি খাঁ শাসনদণ্ড লইয়াছেন। সুজা খাঁর আমলে জমিদারদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। মুরশীদ্ কুলী বড় জবরদস্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গলার জমিদারেরা সুখশান্তি উপভোগ করিতে পান নাই। সুজা খাঁর দয়াপূর্ণ ব্যবহারে, রাজ্যের রাজস্ব না কমিয়া, বাড়িয়া উঠিয়াছে। বীরভূমের জমিদার, সুজা খাঁর আমলে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কিন্তু সুজা তাঁহাকে দমন করিয়া বরঞ্চ তাঁহার তিনলক্ষ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিয়াছেন। মুরশীদ কুলীর আমলে জমিদারেরা যে পরিমাণে উত্যক্ত ও অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সুজার ও সরফরাজের আমলে তাহারা আরও একটু শান্তি উপভোগ করিয়াছিলেন। ইহার পর আলীবর্দ্দি, দিল্লী হইতে সনন্দ আনাইয়া সরফরাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলেন। সরফরাজ্ খাঁ, আলীবর্দ্দির প্রতিযোগীতা করিতে গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। আলীবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার মসনদে বসিলেন।

মুরশীদকুলি ও সিরাজ্উদ্দৌলা এই সমস্ত বঙ্গাধিপগণের মধ্যবর্ত্তী নবাব নাজিমদিগের মধ্যে আলিবর্দ্দি খাঁই বিশেষ সহৃদয়তা ও ন্যায়পরতার সহিত বাঙ্গলা শাসন করিয়া গিয়াছিলেন। মুরশীদ্ কুলীর দুর্দ্দান্ত ভাব বা প্রখরতা

তাঁহাতে ছিল না। সাধ্যমতে ন্যায়পথে থাকিয়া বাৎসল্য-ভাবের সহিত প্রজা-পালন ও রাজ্যশাসন করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আমলে জমীদার ও প্রজা উভয়েই শান্তিসুখ উপভোগ করিয়াছিল। কিন্তু অন্য এক প্রকার অত্যাচারে তাহারা জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল।

ইহা বর্গীর হাঙ্গাম। মারহাট্টা বর্গীরা, ফলশস্যশালিনী বাঙ্গলা লুণ্ঠন করিতে আসিয়া প্রজাবর্গের উপর বড়ই অত্যাচার করিয়া যাইত। এই বর্গীর জ্বালায় ঘরে সোণারূপা, টাকাকড়ি থাকিত না; গোলায় লোকে বেশী ধান রাখিত না; বড়মানুষী চাল বাদ দিয়া গরিবানা চাল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কেননা, রাজ্য তখন আজকালের মত শান্তিসুখের আকর ছিল না।

পনর বৎসর আলিবর্দ্দি রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে বর্গীরা প্রায় প্রতি বৎসরেই একবার করিয়া এই দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। আলিবর্দ্দি প্রথমে ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সহজ ব্যাপার নয় ভাবিয়া, সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত সেই বর্গীদিগের প্রতিযোগীতা আরম্ভ করিলেন।

বর্গী আসিতেছে শুনিলেই সে সময়ে লোকে জ্ঞান বুদ্ধি হারাইত। কলিকাতার আশে-পাশের অধিবাসীরা, বর্গীদের আগমন-সংবাদ শুনিলেই দলে দলে ইংরাজের অধিকারমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কারণ, আশেপাশে এমন কোন ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন না, যাঁহার সহায়তায় তাহারা আত্মরক্ষা ও সম্পত্তিরক্ষা করিতে পারিত।

বর্গীর হাঙ্গামের সময়, কোম্পানীর অধিকারমধ্যে দলে দলে লোক আসিয়া আশ্রয় লওয়াতে, কলিকাতার ইংরেজাধিকারের প্রেসিডেণ্ট্ সাহেব, আলিবর্দ্দি খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"কলিকাতার চারিদিকে একটা খাত খনন করিলে, বোধ হয়, মারহাট্টাদিগের আক্রমণের প্রতিরোধ-কার্য্য সহজসাধ্য হইয়া উঠে।" আলিবর্দ্দি খাঁ নিজেই বর্গীর জ্বালায় উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং প্রেসিডেণ্ট্ সাহেবের এই প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। সেই সময়ে যে খাত কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্বদিকে খনিত হইয়াছিল, তাহাই "মারহাট্টা ডিচ্" নামে আজও কলিকাতার মিউনিসিপাল্-সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বর্গীর হাঙ্গামা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে, তিনি মারহাট্টাদিগকে সমগ্র

বাঙ্গলার রাজস্বের চৌথস্বরূপ দ্বাদশলক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহা ব্যতীত উড়িষ্যা প্রদেশও মারহাট্টাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

সামান্য ঘটনাসূত্র হইতে কখন কখনও মহৎকার্য্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্গীর হাঙ্গামের সময় যদি আলিবর্দ্দির ন্যায় একজন বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা বাঙ্গলার মস্‌নদে না থাকিয়া, সর্‌ফরাজ্ খাঁর ন্যায় কোমল প্রকৃতির ও দুর্ব্বলচিত্ত লোক শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ঘটনাস্রোত সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে প্রবাহিত হইত। সমুদ্রস্রোতের ন্যায় প্রবল মহারাষ্ট্রশক্তির উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস সহ্য করিতে না পারিয়া সর্‌ফরাজ্ কোথায় যে ভাসিয়া যাইতেন, তাহার স্থিরতা ছিল না। তাঁহার দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিত রাজদণ্ড মারহাট্টা নায়কগণের হস্তে পড়িত। বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা মারহাট্টা-রাজ্য-সংমিলিত হইয়া পুনরায় ভারতে হিন্দুশাসন প্রবর্ত্তিত করিত। দিল্লী তখন হীন-প্রতাপ। কেবল বাঙ্গলার ও অন্যান্য কয়েকটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা ক্ষমতাশালী ছিলেন। বাঙ্গলা দখল হইলে, যথারীতি শাসন করা মারহাট্টাদের পক্ষে কিছু একটা দুরূহ কার্য্য হইয়া পড়িত না। মারহাট্টাশাসন বদ্ধমূল হইলেই, তৎসঙ্গে বাঙ্গলায় বিদেশীয় অধিকার সমূহের সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ হইত। ইংরাজ ও ফরাসী উপনিবেশ সেই ঘটনা-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইত, তাহার স্থিরতা ছিল না। কিন্তু ভারতে ইংরাজ-শাসন, বিধাতার অখণ্ডনীয় লিপি বলিয়াই আলিবর্দ্দি সেই সময়ে বাঙ্গলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।*

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে স্বনামখ্যাত সিরাজ্‌উদ্দৌলা মস্‌নদে অধিরোহণ করেন। কি কারণে সিরাজের সহিত ইংরাজের প্রথম বিরোধ ঘটে, কি কারণে উত্তেজিত হইয়া তিনি কাশিমবাজার ও কলিকাতার ইংরাজের অধিকার লুণ্ঠন করেন, কি কারণে বিখ্যাত "অন্ধকূপ ঘটনা" সংঘটিত হয়, তাহার বিশদ বিবরণ এস্থলে আবশ্যক করে না। ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

কলিকাতার ইংরাজদের উচ্ছেদে নবাব সিরাজ্‌উদ্দৌলা জয়-গর্ব্বিত হইয়া ইহার নাম "আলিনগরে" পরিবর্ত্তিত করিয়া রাজা মাণিকচাঁদকে ইহার শাসনভার দিয়া চলিয়া গেলেন। এই ভাবে কিছু দিন চলিলে, ক্লাইভ্ ও

* Mill ও চিক্ এই কথা বলেন—Vide History of British India–Vol. II, p. 95.

ওয়াট্‌সন্ পুনরায় মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া, প্রথমে বজবজের দুর্গ ও তৎপরে কলিকাতার পুনরুদ্ধার করেন। সিরাজ্‌উদ্দৌলা, এই ঘটনার পূর্ব্বে, ইংরাজের প্রভাবের বিশেষ পরিচয় পান নাই। তিনি যখন কলিকাতা হইতে ইংরাজের উচ্ছেদ-সংবাদ দিল্লীর দরবারে প্রেরণ করেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, আবার ইংরাজ কোম্পানীর লোকেরা আসিয়া কলিকাতার পুনরুদ্ধার করিবে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি নবাবের সহিত, ক্লাইভ্ ও ওয়াট্‌সনের এক সন্ধি হয়। তাহাতে নবাব সিরাজ্‌উদ্দৌলা ইংরাজদিগকে তাঁহাদের অধিকার সমস্ত ছাড়িয়া দেন এবং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফেরোক্ শিয়ারের নিকট, পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারের নিকট হইতে ভূসম্পত্তি খরিদ করিবার জন্য তাঁহারা যে স্বত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জমীদারদিগকে সহায়তা করিতে আদেশ করেন।

নবাব সিরাজ্‌উদ্দৌলার কথা না জানে, এমন লোক বাঙ্গলায় খুব কম আছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকল সম্প্রদায়ই, কাহারও কোন অসীম অত্যাচারের কথা জ্ঞাপন করিতে হইলে, নবাব সিরাজ্‌উদ্দৌলার সহিত উপমা দিয়া থাকেন। বস্তুত সিরাজ্‌উদ্দৌলা বাঙ্গলার প্রতাপশালী নবাব ছিলেন।

আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর যখন সিরাজ্‌উদ্দৌলা বাঙ্গলার মস্‌নদে বসেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে দুই একটা চক্রান্ত যে না হইয়াছিল, এরূপ নহে। হয়ত চক্রান্তকারীরা একটু বিশেষ বলসঞ্চয় করিলে, তাঁহার সিংহাসনাধিকার সুদূর-পরাহত হইয়া উঠিত। কিন্তু ঘটনাবশে সেই সমস্ত ধূমায়িত বিদ্রোহ দমন করিয়া সিরাজ্ নিজের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

একে অল্প বয়স, তাহাতে বাল্যে সুশিক্ষা হয় নাই, তাহার উপর আবার মাতামহের প্রচুর আদর, এই সকল কারণে সিরাজ্‌উদ্দৌলা সেই যৌবন সময়ে সিংহাসন পাইয়া আরও দুর্ব্বিনীত—আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। কতকগুলা কুচক্রী দুষ্টলোকে তাঁহার মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠিল। তাহাদের পরামর্শে তিনি অধীনস্থ প্রজাবর্গের উপর ও সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে লাগিলেন।

"অত্যুন্নতি হইলেই পতন হয়," এইরূপ একটী চিরপ্রচলিত প্রবাদ আছে।

সিরাজ্উদ্দৌলা বড়ই বাড়াইয়া ছিলেন বলিয়া, তিনি সহজেই পড়িলেন। সে পতনে তাঁহার সহিত ভারতের ভাগ্যও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

যদি এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাপন্ন প্রজাবর্গ সিরাজের বিরুদ্ধে এই সময়ে উত্তেজিত না হইত, তাহা হইলে পলাশীর মহাযুদ্ধ সূচিত হইয়া তৎসঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক মহাপরিবর্ত্তন সংসাধিত হইত কি না, তাহা সন্দেহস্থল। ক্রমাগত অত্যাচার ও অবমাননায় তাঁহার নিজ কর্ম্মচারীরাই তাঁহার ধ্বংসসাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

তাঁহার পতনের জন্য ষড়যন্ত্ররূপ যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল, বাঙ্গলার বিখ্যাত জগৎশেঠগণ তাহার প্রধান হোতা। জগৎশেঠ, ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। ইহা ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক উপাধিমাত্র। ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে গেলে, ইহার ভাষান্তর Banker of the world ইহাই দাঁড়ায়। এই জগৎশেঠ-গণের ঐশ্বর্য্য-প্রবাদ সেকালে সমগ্র বাঙ্গলাদেশের—এমন কি ভারতবর্ষের বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। ইহারা এতদূর ধনী ছিলেন যে, শেঠ মাতাবরায় এক সময়ে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন—"টাকা বিছাইয়া দিয়া আমরা ভাগীরথীর সুতীর মোহানা বন্ধ করিতে পারি।"

এই প্রকার শুনিতে পাওয়া যায় যে, এ হেন জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে,* সিরাজ্উদ্দৌলা সামান্য কারণে অপমানিত করেন। বাঙ্গলার নবাবেরা যখন প্রথম সিংহাসনে বসেন, তখন প্রচলিত প্রথামত দিল্লীর বাদসাহ সরকার হইতে একটা অনুমতি পত্র আনাইতে হইত। সিরাজ্ যখন সিংহাসনে বসেন, সেই সময়ে দিল্লী-দরবারের অতিশয় হীনাবস্থা। সুতরাং তখন সনন্দ না আনাইলেও ক্ষতি নাই, এই ভাবিয়া জগৎশেঠগণ তাহার অপেক্ষা না করিয়াই অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেন।

ইহার পর পূর্ণিয়ার সকতজঙ্গ্ প্রমুখ সিংহাসনপ্রার্থীদল, দিল্লী-দরবারে সিরা-জের বিরুদ্ধে এক আবেদন প্রেরণ করেন যে, "বর্ত্তমান নবাব, দিল্লী-দরবারের সম্মতি না লইয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার দাবি, ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত নহে।" দিল্লী-দরবারে সিরাজের যে উকীল ছিল, তিনি যখন তাঁহাকে এই গোল-যোগের কথা জানাইলেন, তখন তিনি জগৎশেঠদিগকে ডাকাইয়া সনন্দ না লইবার

* স্বরূপচাঁদ ও মাতাবরায়।

কারণ কি, জিজ্ঞাসা করেন। জগৎশেঠেরা মহা ক্ষমতাশালী; তথাপি প্রকৃত কথা বলিয়াও নিস্তার পাইলেন না। সিরাজ্ তাঁহাদের প্রতি যথেচ্ছা অপমানকর বাক্য প্রয়োগ করিয়া পরে তাঁহাদিগকে পাহারার মধ্যে রাখিয়া দেন। কিন্তু শেষে জগৎশেঠের অর্থবলের কথা ভাবিয়া ও ভবিষ্যৎ চক্রান্ত-ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেন।

রাজা রাজবল্লভ, ঢাকা নায়েবাতের প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি ঢাকার শাসনকর্ত্তা। কোন গুহ্য কারণে সিরাজের সহিত রাজবল্লভের মনান্তর ঘটে। সিরাজ্ সুযোগ খুজিতেছিলেন, সহজেই সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি শুনিলেন, ঢাকার সরকারে ভয়ানক তহবিল-তছরূপাত হইয়াছে। তিনি রাজবল্লভের নিকট হিসাব নিকাশ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু হিসাব নিকাশের পূর্ব্বেই তিনি রাজবল্লভের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। রাজবল্লভের পুত্র কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন। ইহার পরিণামফল—সিরাজের কলিকাতা-আক্রমণ ও অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ড-সংসাধন।

এইরূপ নানা কারণে উত্তেজিত হইয়া রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিগণ, আত্মমর্য্যাদা রক্ষার্থে, সিরাজের বিরুদ্ধে ঘোর ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। জগৎশেঠের প্রকাণ্ড অট্টালিকার এক অন্ধকারময় কক্ষের ভিতর বসিয়া যে মন্ত্রণা স্থির হইল, তাহাতে নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মীরজাফরকে নবাব করাই স্থির হইয়া গেল। কিন্তু এ কার্য্যে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করা হইল।

এই চক্রান্তের মধ্যে ছিলেন রাজা দুর্লভরাম, রাজা রাজবল্লভ, বাজপেয়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা মহেন্দ্রলাল, জগৎশেঠগণ ও মীরজাফর। শুনিতে পাওয়া যায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই না কি কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের সহিত সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া যান।

ইহার পরিণাম পলাশীর রণাভিনয়। তৎপরিণামে উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি যুবক নবাবের সিংহাসনচ্যুতি ও শোচনীয় পরিণাম। তাহার আর পুনরুল্লেখের এস্থলে কোন প্রয়োজন দেখি না।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে মীরজাফরের সহিত কোম্পানীর কি রূপ সন্ধি হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের অধিকার কিরূপে নূতন ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহার কথা পরে বলিব।　　শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

শ্রীহরি পদপঙ্কজ ভাবরে ভাব মন, ত্যজি ছার কামনা।
মোহ ঘুম ঘোরে, জীব! রয়েছ অচেতন, আঁখি মেলিয়ে দেখ না।
সম্পদ তব, বিপদ হবে, ত্যজ সুখ বাসনা,
ভজিয়ে সার, ছাড়ি অসার, নিত্য ধনে সাধনা।
এ ধন জন, র'বেনা হেন, অনিত্য ধন ভেবনা,
নীরদরূপ, বিশ্বভূপ, পূরা'বে তব কামনা।
দিয়ে চরণতরি, নাথ! নাশ হৃদয় বেদনা,
পাপ সাগরে ভাসি হে, হরি! দীনে পার কর না।

(২)

ভৈরোঁ—পোস্তা।

জয় জগদীশ্বর, ব্রহ্ম পরাৎপর,
দীননাথ নারায়ণ হে।
জয় বৈকুণ্ঠবিহারী, পাতকহারী,
রমানাথ রাধামোহন হে।
জয় গোলকের পতি, অগতির গতি;
হরি, দুঃখ তাপ-নাশক হে।
জয় বংশীধারী, রাস রস বিহারী,
গোপিনীগণ-মনরঞ্জন হে।
জয় গোবর্দ্ধনধারী, বিপিনচারী,
মুরারী! মদনমোহন হে।
জয় চিন্তামণি! যোগীশিরোমণি,
কর কৃপা বিতরণ হে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

পুরোহিত

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-সম্পাদিত

চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরী হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ।
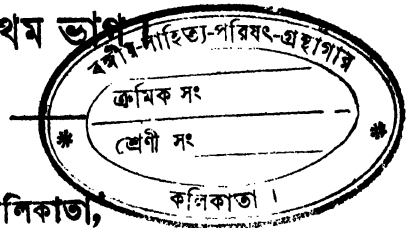
কলিকাতা,
৬৩।৩ নং মেছুয়াবাজার রোড্, "নববিভাকর প্রেস" হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল, ৩০শে চৈত্র।

সূচী পত্র।

"পুরোহিত"-সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের মতামত।

"What appears to be a valuable addition to the Magazine literature in Bengal is a new Bengali monthly called Purohit, the first number of which has reached our hands. This new Magazine is edited by Pandit Mahendranath Vidyanidhi a writer of great ability and a man of extensive journalistic experience. The first number is very creditably edited and is calculated to fulfil the object of publication namely to be a religious guide to the Hindus of Bengal."

—*Hope Jany. 7th, 1894.*

"This is a new accession to the periodical literature of Bengal. The Editor, Pandit Mahendranath Vidyanidhi, who is not a stranger to literary fame, writes an introduction in which the objects of the Journal are clearly set forth, and the selection of the title is justified. Babu Rajkrishna Roy contributes a Bengali rendering of the well-known Mohamudgar, which is interesting not only for the correctness of the translation, but also on account of the fact of its being put in the same metre as the original. The First issue of the journal is full of promising features."—*Indian Mirror, 25th February, 1894.*

"পুরোহিত নামে এক খানি নূতন মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। "বঙ্গ-দেশস্থ হিন্দুসন্তানগণের সাহায্যার্থে" এই পত্রিকা খানি প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাতে শাস্ত্রকথা থাকিবে।

"এই পত্রিকার উদ্দেশ্য মহৎ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ, পূর্ণচন্দ্র বসু, সত্যব্রত সামশ্রমী, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ রায়—ইঁহাদের লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপভাবে লিখিত ও এরূপ ভাবে সম্পাদিত হইলে, "পুরোহিত" বাস্তবিক বাঙ্গালী সমাজের বিশেষ হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা হয়। আমরা নব সহযোগীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।"—হিতবাদী, ১৩০০ সাল, ২৮শে পৌষ।

"পুরোহিত-নামে এক খানি মাসিক পত্র ও সমালোচন, বিগত অগ্রহায়ণ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ এক খানি পত্রিকার অভাব, আমরা অনেক দিন হইতেই, উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি। প্রস্তাবিত পত্রিকা খানি, ঠিক্‌ই আমাদের আশানুরূপ হইয়াছে। তবে পুরোহিত, এক্ষণে আপনার নাম ও ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া লোকশিক্ষায় ব্রতী থাকিলেই, পরম সুখী হইব। পুরোহিতের প্রথম সংখ্যা দেখিয়া আমাদের মনে সে আশারও সঞ্চার হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের 'অনুক্রমণিকা' নামে মুখবন্ধটী অতি সুন্দর ও উপাদেয় হইয়াছে। অনেক দিন আমরা এরূপ মুখবন্ধ পাঠ করি নাই। ইহাতে লেখকের বিশেষ গুণপনা ও গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে। 'বঙ্গে দেবপূজা' প্রবন্ধটীও উত্তম হইয়াছে। ইহাতে আধুনিক বঙ্গীয় যুবকের শিখিবার বিষয় অনেক আছে। 'শুভ অগ্রহায়ণ'-নামক প্রবন্ধের সহিত স্থানে স্থানে আমাদের মতৈক্য না থাকিলেও, ইহার প্রশংসা করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। সামশ্রমী মহাশয়ের 'বৈদিক প্রহেলিকা'ও সুন্দর প্রবন্ধ। তবে সামশ্রমী মহাশয়ের লেখনী হইতে ভাষার আরও একটু প্রাঞ্জলতা আমরা আশা করিতে পারি। অপর দুইটী প্রবন্ধে নূতন কথা অনেক আছে। ফলতঃ প্রথম খণ্ড, যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ হইলে, পুরোহিত, সাময়িক-পত্র-সমূহেরশীর্ষ স্থান অধিকার করিবে, এরূপ আশা করা যায়।"

—সোমপ্রকাশ, ১৩০০ সাল, ১১ই পৌষ।

"The second issue of this monthly periodical is, in many respects, an improvement on the first. True to its name, the paper does a great deal to minister to the spiritual necessities of its constituents. Among the articles contributed to the issue before us, the one on religious training in Bengal is full of poetry and thoughts. In another paper, another writer shows how the true meaning of *tantric* rites has been perverted in the present times."—*Indian Mirror, April 13th, 1894.*
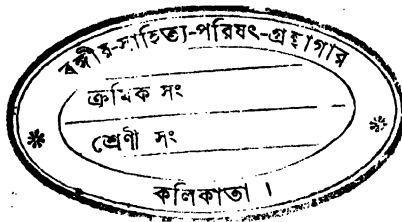
পুরোহিত

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ } ১৩০০ সাল, ফাল্গুন। { চতুর্থ সংখ্যা।

ধর্ম্ম-সঙ্কট।

রোগের সময় চিত্তের অস্থিরতাবশতঃ নিত্য নূতন চিকিৎসকের ঔষধ সেবন করিলে, রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগীর জীবন-সংশয়ের হেতুস্বরূপ এইরূপ চিকিৎসা-বিভ্রাটকে লোকে "বৈদ্য-সঙ্কট" বলে।

শারীরিক ব্যাধি-সম্বন্ধে বৈদ্য-সঙ্কট যেরূপ, আধ্যাত্মিক ব্যাধি-সম্বন্ধে ধর্ম্ম-সঙ্কটও ঠিক্ সেইরূপ। মনুষ্য, আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রোপদেশরূপ মহৌষধ-সেবনে যত্নবান্ না হইয়া আত্মজ্ঞানশূন্য স্থূলদর্শিগণের স্বকপোল-কল্পিত নূতন মত-সমূহের অথবা তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত শাস্ত্রের বিকৃতার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যাধির উপশম হওয়া দূরে থাকুক, তাহার বিনাশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। মনুষ্যের এইরূপ অবস্থাকে ধর্ম্ম-বিভ্রাট বা ধর্ম্ম-সঙ্কট বলা যাইতে পারে।

আমরা বহুদিন হইতে আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ চিকিৎসার দোষে ধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে, এক্ষণে আমাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা সমাজতত্ত্বজ্ঞ, যাঁহারা কিসে আমাদিগের কল্যাণ সাধিত হয় এবং কিসেই বা আমাদিগের অনিষ্ট

ঘটিয়া থাকে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন এবং যাঁহারা জাতীয় ইতিবৃত্ত ভালরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া কখনই বলিবেন না, আমরা উপস্থিত সঙ্কটাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আবার আধ্যাত্মিক নবজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব। আমরা এক্ষণে মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্ম-সঙ্কটই আমাদিগের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ।

আজি কালি আমাদিগের সমাজে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক কিংবা প্রয়োজনানুসারে মুখে আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যে প্রতিপদে অহিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করেন। ইহাঁরা হিন্দুসমাজে কোন প্রকারে থাকেন বটে, কিন্তু হিন্দু-সমাজের কোন সংবাদই রাখেন না। পান্থ-নিবাসে প্রবাসীর যেটুকু মমতা থাকে, হিন্দু-সমাজরূপ গৃহে বাস করিলেও ইহাঁদিগের ইহাতে সেটুকুও মমতা নাই বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু-সমাজ বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তাহা ইহাঁরা বুঝিতে বা জানিতে চেষ্টা করেন না। ইহাঁরা কেবল আহার-বিহার, আমোদ-প্রমোদ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। ইহাঁদিগকে হিন্দু নামে অভিহিত না করাই ভাল। আর উক্তনামে অভিহিত করিলেও, হিন্দু-সমাজের কুপোষ্য বলাই উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শ্রেণীর লোকই সমাজে অধিক। যাঁহারা এই শ্রেণীভুক্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকল রকম লোকই আছেন। তবে যুবকের সংখ্যা কিছু অধিক।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন। সমাজ-তত্ত্বানভিজ্ঞ তরলমতি যুবকগণ এই শ্রেণীর অঙ্গপুষ্টি করিয়া থাকেন। ইহাঁরা এখনও তাদৃশ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও, হিন্দু-সমাজের প্রতি যথেষ্ট মমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন; আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করেন এবং যাহাতে হিন্দু-সমাজের কল্যাণ হয়, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্যবহার দেখিলে, ইহাঁদিগকে হিন্দু বলা যাইতে পারে।

আরও এক শ্রেণীর লোক আছেন। পরিণত-বয়স্কগণই এই শ্রেণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা পরিপক্কবুদ্ধি ও সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ। ইহাঁরা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। হিন্দুশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ইহাঁরা সর্ব্বদাই

যত্নবান্। ইহাঁরা কায়মনোবাক্যে হিন্দু-সমাজের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন।

প্রথম শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস, হিন্দু-সমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম অনেক পরিমাণে সংস্কৃত হইয়াছে। বৈদিক-ধর্ম্ম, কূটবুদ্ধি স্বার্থপর লোকদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দু-সমাজের অসভ্যাবস্থায় বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। মূর্খতাপূর্ণ বৈদিক ধর্ম্ম হইতে অধিকতর মূর্খতাপূর্ণ পৌরাণিক ধর্ম্মের সৃষ্টি। অজ্ঞানান্ধ হিন্দু-সমাজে এই ধর্ম্ম বহুকাল সমাদৃত হইয়াছিল। ইহার পর তান্ত্রিক-ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। যখন তান্ত্রিক-ধর্ম্ম এ দেশে প্রচলিত, তখন হিন্দু-সমাজ ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন। পাশ্চাত্য ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানজ্যোতিঃই হিন্দু-সমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বকালের মূর্খতাপূর্ণ হিন্দু-ধর্ম্মের উপর লোকের বিশ্বাস নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন লোকে অধিক পরিমাণে নীতিপরায়ণ ও প্রকৃত ধর্ম্মভীরু হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিদ্যাই এ সকলের কারণ। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দু-সমাজের প্রাণস্বরূপ। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহাঁদিগের মতে হিন্দু-সমাজ রোগগ্রস্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস অন্যরূপ। ইহাঁরা বলেন, হিন্দু- সমাজ উন্নত ও সংস্কৃত হয় নাই বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অবনত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্ম এক্ষণে অনেক মলিন হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-সমাজে যে এক্ষণে আধ্যাত্মিক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ব্যাধি সংক্রামক নহে, সমস্ত সমাজে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। এ রোগ ক্রমে সারিয়া যাইবে। ইহার কোন বিশেষরূপ প্রতিকারের আবশ্যক নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত লোকের মধ্যে যে পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মানুরাগ পরিলক্ষিত হইত, এখন তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সেই অনুরাগ দেখা যায়। যাঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, তাঁহারা পূর্ব্ববৎই আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইংরাজি-শিক্ষতদলের মধ্যেই বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। সে বিকার, কালক্রমে অল্পে অল্পে অপনীত হইতেছে। পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণই ক্রমে এই সকল লোকের মতি গতি ফিরাইয়া দিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক যত্ন চেষ্টার আবশ্যক নাই। আর কিছু দিন পরে, হিন্দু সমাজের মলিনতা ও হীনাবস্থা দূর হইয়া যাইবে।

যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহিত সম্পূর্ণ ভিন্নমত। তাঁহারা হিন্দু-সমাজকে কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাধি-গ্রস্ত বলিয়া নিরস্ত নহেন; পরন্তু এ ব্যাধিকে মহাব্যাধি বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে এ রোগ বিষম রোগ, ধাতুত্রয়ের পূর্ণ বিকার! সত্বর প্রতিকার না হইলে, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ম্যালেরিয়া ও বিসূচিকা-সংক্রমণ অপেক্ষা এ রোগের সংক্রমণ ও পরিব্যাপ্তি অধিকতর প্রবল। বিদ্যুদ্বেগে এ রোগ, সমস্ত সমাজে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। সর্ব্ব-প্রথমে ইহা ইংরাজি-শিক্ষিত দলে প্রবেশ করিয়াছিল। এক্ষণে সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সহরে, পল্লীগ্রামে যেখানে যাও, সেইখানেই দেখিতে পাইবে, লোকে এ রোগে জর্জ্জরিত। এমন কি, ক্রমে অন্তঃপুরেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। শীঘ্র প্রতিকার আবশ্যক। তাহা না হইলে, হিন্দু-সমাজের সর্ব্বনাশ ঘটিবে—হিন্দু-সমাজ লোপপ্রাপ্ত হইবে।

আমরা উপরে যে তিন শ্রেণীর লোকের কথা বলিলাম, তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীকে ছাড়িয়া দাও; দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কথাই আমাদিগের বিবেচ্য। এতদুভয় শ্রেণীর লোকেই হিন্দু-সমাজের আধ্যাত্মিক রোগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন; কেবল রোগের গুরুত্ব লইয়াই মতভেদ। আমাদিগের মতে তৃতীয় শ্রেণীর লোকের কথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের বিশ্বাস, হিন্দু-সমাজ তো আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত বটেই, অধিকন্তু ধর্ম্ম-সঙ্কট নিবন্ধন ঘোর বিকারগ্রস্ত! ইহার আশু প্রতিকার নিতান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকে সমাজের ব্যাধির গুরুত্ব স্বীকার করেন না। ইহার কারণ আছে। বহুকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিলে, সুস্থাবস্থার সুখ, সাচ্ছন্দ্য ও আরাম এক প্রকার ভুলিয়া যাইতে হয়। অষ্ট প্রহর রোগের যাতনা ভোগ করিতে হইলে, মন ও বুদ্ধি একবারে নষ্ট হইয়া যায়। আরোগ্যাবস্থার সুখ তখন কেবল কল্পনার সামগ্রী হইয়া উঠে—অনেকের

কল্পনার অতীত হইয়া পড়ে। হিন্দু-সমাজ বহুকাল হইতে আধ্যাত্মিক রোগ ভোগ করিয়া এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন—আমাদিগের বুদ্ধি এতই বিকৃত হইয়া গিয়াছে—আমাদিগের মন এতই ক্ষুদ্রায়তন হইয়া পড়িয়াছে যে, এক্ষণে আমরা আমাদিগের পূর্ব্বাবস্থার—আরোগ্যাবস্থার সুখপ্রদ. লক্ষণ সমুদয়ের আর কল্পনাও করিতে পারি না। বিকৃতাবস্থাই আমাদিগের প্রকৃতাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থাকে বিকৃত অবস্থা—রোগের অবস্থা বলিয়া অনেক সময় মনে করি না, সুতরাং রোগের গুরুত্বের প্রকৃত পরিমাণ কিরূপে অনুভব করিব? যাহারা রোগের যাতনায় কষ্ট বোধ করে না, তাহাদিগের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা কোথায়? মৃত্যুই তাহাদিগের স্থির নিশ্চয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকসমূহ, রোগের যাতনায় কষ্ট বোধ করেন না বলিয়াই, রোগ যে কত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা যদি আমাদিগের সহজাবস্থা কি ছিল, একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, আমরা কিরূপ বিষমাবস্থায় উপনীত হইয়াছি—রোগ কত কঠিন—কত ভীষণ!

হিন্দুধর্ম্ম বলিতে কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মমত বুঝায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম বলিলে, বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্ম্মমত বুঝায়। খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্ম বলিলে, জিজস্ ক্রাইষ্ট্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত বুঝায়। মুসলমান ধর্ম্ম বলিলে, মহম্মদ্ যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বুঝায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বলিলে এরূপ কোন একটি ব্যক্তি-বিশেষের ধর্ম্মমত বুঝায় না। হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পৃথিবীতে আর এরূপ কোনও ধর্ম্ম নাই। অপরাপর জাতির ধর্ম্মমত লোকে অনায়াসে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে। একজন খৃষ্টিয়ান্ কোরাণ পড়িয়া অথবা একজন মুসলমান বাইবেল্ পড়িয়া অনায়াসে পরস্পরের ধর্ম্মমত বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন। ইহার জন্য খৃষ্টিয়ান্‌কে মক্কা অথবা মুসলমানকে জেরুজিলম্ যাইতে হয় না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কি, তাহা ভালরূপ জানিতে হইলে—শিক্ষা করিতে হইলে—অপরকে বুঝাইতে হইলে—বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, তন্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি রাশীকৃত শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে, ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুজাতির সহিত—হিন্দুর গৃহে—বাস করিতে হইবে, হিন্দুর আচার ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে,

হিন্দুগুরুর নিকট হিন্দুভাবে শিষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে আপনার জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, হিন্দু হইতে হইবে—হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ভিন্ন জাতীয় লোকের পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম ভালরূপ বোঝা অথবা বোঝান, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইখানেই অপরাপর ধর্ম্মমতের সহিত হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতিগত পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

হিন্দুধর্ম্ম কি, ইহা দুইচারি কথায় লোককে বুঝাইতে অথবা নিজে বুঝিতে না পারিলেও, লক্ষণ দেখিয়া ইহার স্থূল স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের স্থূল লক্ষণ কি? বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মই ইহার স্থূল লক্ষণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের অনুষ্ঠেয় শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম। অদ্য আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। সময়ান্তরে আমরা এই বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশদরূপ আলোচনা করিব। এস্থলে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, বর্ণধর্ম্মের ও আশ্রমধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারিব।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ লইয়া হিন্দু-সমাজ গঠিত হইয়াছে। কেবল হিন্দু-সমাজে কেন, প্রত্যেক সমাজে এই চারি বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন হিন্দুধর্ম্মের সহিত অপর কোন ধর্ম্মের সাদৃশ্য হয় না, তেমনই হিন্দুজাতির সহিত অপর কোন জাতির সাদৃশ্য হয় না। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির মধ্যে এমন একটু বিশেষত্ব আছে, যাহা অপর কোন ধর্ম্ম বা জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ, অপরাপর জাতির মধ্যেও আছে সত্য বটে, কিন্তু হিন্দুজাতির মধ্যে যে ভাবে আছে, সে ভাবে অন্য জাতির মধ্যে নাই। হিন্দুর জাতীয়তা ধর্ম্মমূলক; অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীর জাতীয়তা তাহা নয়। হিন্দুর জাতির বিস্তৃতি ইহলোক ও পরলোকে, অহিন্দুর জাতির বিস্তৃতি কেবল ইহলোকে। হিন্দুর জাতি আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সোপানশ্রেণী, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর জাতি কেবল বৈষয়িক ব্যাপারের—প্রবৃত্তিলীলার রঙ্গমঞ্চ। হিন্দুর জাতি ও অহিন্দুর জাতি এতই বিভিন্ন-প্রকৃতি।

ধর্ম্মগতপ্রাণ হিন্দুজাতির এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা ধর্ম্মের সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত নহে। অতি প্রাচীন কালে আমাদিগের পূজ্যপাদ পিতামহগণ যে সকল বিধি ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দু-সমাজকে সংগঠিত করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ধর্ম্মমূলক এবং ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণপ্রদ। হিন্দু-জীবনকে ক্রমোন্নতি দ্বারা দেবজীবনে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিগণ বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমরা তন্মধ্যে বর্ণধর্ম্মেরই প্রথমে আলোচনা করিতেছি।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে ভগবান্ মনুই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি জাতির নিম্নোল্লিখিত বৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ;—

(১) ব্রাহ্মণ ;—অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ।*

(২) ক্ষত্রিয় ;—প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অপ্রসক্তি (অনবরত সেবনে অপ্রবৃত্তি)।†

(৩) বৈশ্য ;—পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, ধনপ্রয়োগ ও কৃষিকর্ম্ম।‡

(৪) শূদ্র ;—অসূয়াবিহীন হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা করা।§

জীবসৃষ্টির মধ্যে তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথম অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন স্তর পশুত্ব ; দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্য স্তর মনুষ্যত্ব ; তৃতীয় অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ স্তর দেবত্ব। জীবকে সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ পশুত্ব হইতে দেবত্বে উঠিতে

* অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥—মনু সং, ১, ৮৮।

† প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥—মনু সং, ১, ৮৯।

‡ পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥—মনু সং, ১, ৯০।

§ একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃকর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥—মনু সং, ১, ৯১।

হইবে। প্রথম হইতে তৃতীয় স্তরে উপনীত হইতে কত সময় লাগে—কত যুগ যুগান্তর কাটিয়া যায়, কে কল্পনা করিতে সমর্থ হইবে? তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রথম স্তর অপেক্ষা দ্বিতীয় স্তর উত্তীর্ণ হইতে অধিক কাল লাগে। প্রথম স্তর অতি স্থূল। কত লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র স্তরে ইহা সংগঠিত হইয়াছে, বলা যায় না। এই প্রথম স্তরান্তর্গত প্রথম ক্ষুদ্র স্তরে জীবের উদ্ভব। তাহার পর কত লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র স্তর উত্তীর্ণ হইয়া তবে দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হইতে হয়। দ্বিতীয় স্তর ক্ষুদ্রাবয়ব। চারিটি ক্ষুদ্র স্তরে ইহা সংগঠিত হইয়াছে। এই চারিটি ক্ষুদ্র স্তরের নাম—শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ। পশুত্ব-স্তর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবকে মনুষ্যত্ব-স্তরের সর্ব্বনিম্ন ক্ষুদ্র স্তরে অর্থাৎ শূদ্রকুলে উপনীত হইতে হয়। তাহার পর কর্ম্মফলানুসারে ক্রমোন্নতি দ্বারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষুদ্র স্তর উত্তীর্ণ হইলে, তবে শেষ স্তরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে উপনীত হওয়া যায়। এই মধ্যস্তরে অর্থাৎ মনুষ্যত্ব স্তরেই যত গোল। ইহা উত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। জীব যখন নিম্নস্তরে অর্থাৎ পশুত্ব-স্তরে অবস্থিতি করে, তখন তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও ঈশ্বরবোধশক্তি নিতান্ত অপ্রস্ফুটিত থাকে। এই বোধশক্তির অভাবে তাহার গতিক্রিয়া অতি দ্রুত হয়। মনুষ্যত্ব-স্তরে আসিয়া যখন উপনীত, তখন তাহার সেই বোধশক্তি প্রস্ফুটিত। প্রস্ফুটিত বটে, কিন্তু সামান্যরূপ। এই মনুষ্যত্ব-স্তরের সর্ব্বনিম্ন স্তরে অর্থাৎ শূদ্রকুলে যখন সে প্রথমে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার বুদ্ধির জড়তা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। যত দিন না দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণের উপযোগী হয়, তত দিন তাহাকে সেই প্রথম স্তরে অর্থাৎ শূদ্রকুলেই অবস্থিতি করিতে হয়। এইখানেই হয় তো তাহার সহস্র সহস্র বৎসর কাটিয়া যাইতে পারে। যখন সে বৈশ্য-কুলে আসিয়া উপনীত হইল, তখনও তাহার বুদ্ধির কতকটা জড়তা আছে। তাহার জ্ঞান, শূদ্রকুলে অবস্থিতিকালে যেরূপ ছিল, তদপেক্ষা অনেক প্রশস্ত। এইবারে তাহার কর্ত্তব্য আরও বাড়িয়াছে। সেই জ্ঞানের প্রশস্ততা আরও বৃদ্ধি করাই তাহার কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা না করিতে পারিলে, ঊর্দ্ধগতি লাভ করা অসম্ভব। জ্ঞানের ক্রমবিকাশ দ্বারাই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া পশুত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আবার সেই জ্ঞানের অধিকতর বিকাশ দ্বারা মনুষ্যত্ব

স্তরের সর্ব্বনিম্ন স্তররূপ শূদ্রত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছে। এই বার যদি সেই জ্ঞানকে আরও অধিক পরিমাণে বিকশিত করিতে পারে, তাহা হইলে বৈশ্যত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বে উঠিতে পারিবে। এই বার সাধনার আবশ্যক। কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। যে তাহা করিতে পারিল, সে উচ্চ স্তরে (ক্ষত্রিয়ত্বে) উঠিয়া গেল। যে তাহা না পারিল, তাহাকে সেই খানেই (বৈশ্যত্বে) থাকিয়া যাইতে হইল। কত কাল থাকিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন অবস্থায় জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা দূরে থাকুক, বরং যাহা অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া গেল। তাহাকে হয় তো নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতে হইল। শূদ্রত্বে এমন কি পশুত্বে নামিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

যখন জীব, ক্ষত্রিয়ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার জ্ঞান অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এবার তাহাকে ব্রাহ্মণত্বে পহুঁছিতে হইবে—মনুষ্যত্ব-স্তরের চরম সীমায় যাইতে হইবে। বড় কঠিন সাধনার আবশ্যক। যে, সেই কঠিন সাধনা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব-স্তর উত্তীর্ণ হইতে পারিল, সে ধন্য হইল। অতি সাবধানে এখানে অবস্থিতি করিতে হয়। যাহার জ্ঞানের অধিকতর বিকাশ হইল না, তাহার আর ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইল না। আবার, যে পূর্ব্ব ও ইহ জন্মার্জ্জিত জ্ঞান নষ্ট করিয়া ফেলিল, তাহাকে নিম্ন দিকে ফিরিয়া যাইতে হইল। বৈশ্যত্ব—শূদ্রত্ব—এমন কি পশুত্ব-স্তরেও প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা।

এই বার সর্ব্বশেষ স্তরের কথা। জীব যখন ব্রাহ্মণত্ব-স্তরে উপনীত, তখন তাহার জ্ঞানের প্রায় পূর্ণবিকাশ। "প্রায়" বলিলাম এই জন্য যে, যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করিলে, তাহা সমাপ্ত হইয়া যায়। কত লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া, কত শত পুণ্য কর্ম্মের ফলে তবে জীব, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে। জীব, প্রত্যেক জন্মে তিল তিল করিয়া যে জ্ঞান সঞ্চয় করে, তাহারই ফলে ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণত্বে আসিয়া উপনীত হয়। ব্রাহ্মণত্ব, মানব-প্রকৃতির চরম সীমা—শেষ অঙ্ক। এক এক জন্ম, জীবের এক একটি সাধনক্ষেত্র। এই রূপ লক্ষ লক্ষ সাধনক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া তবে শেষ ক্ষেত্ররূপ ব্রাহ্মণত্বে আসা যায়। এই

শেষ ক্ষেত্র বড়ই কঠিন স্থান। এ স্থানের সাধনা বড় গুরুতর। এ সাধনা সমাধা করা সহজ নহে। এখানে জীব বিষম সমস্যার মধ্যে দণ্ডায়মান। সাধনা দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অপূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারিলে অর্থাৎ যে জ্ঞানটুকু অবশিষ্ট আছে, সেইটুকু লাভ করিতে পারিলে, তবে এ কঠিন সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। সম্মুখে পৌর্ণমাসী রজনীর সুখপ্রদ অমলকান্তি, পশ্চাতে অমানিশার গাঢ়তিমিরাবৃত প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি। ঊর্দ্ধে দেবলোক, নিম্নে ক্ষত্রিয়ত্ব—বৈশ্যত্ব—শূদ্রত্ব—পশুত্ব প্রভৃতি স্তরনিচয়। এই বার বিষম পরীক্ষা উপস্থিত। কর্ম্মানুসারে হয় দেবলোক, না হয় নিম্ন-লোকে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ, যদি জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে তাহার দেবলোকে ঊর্দ্ধগতি হইবে, নচেৎ হয় ব্রাহ্মণ-কুলেই থাকিয়া যাইতে হইবে, না হয় নীচগতি লাভ করিতে হইবে। দেবত্ব-লাভই ব্রাহ্মণজন্মের আকাঙ্ক্ষণীয়। কর্ম্ম দ্বারা পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানলাভ হইলে, জীব, দেবলোক প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান এবং জ্ঞান দ্বারা ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মই ঊর্দ্ধগতি-লাভের মূল কারণ। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ সকলেরই মুক্তি, কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। কর্ম্ম না করিলে মুক্তি হইতে পারে না। ভারতবর্ষ কর্ম্মক্ষেত্র। এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া সকলেই পূর্ব্বকালে কর্ম্মতৎপর হইতেন। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে আজি ঘোর বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। পাঠক! আর কি কর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিদ্যমান কালে আমাদিগের সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়? যদি কিছু থাকে, তাহার সংখ্যাই বা কত?

বর্ণ-চতুষ্টয়ের কথা বলিতে গিয়া, ক্ষত্রিয়-জাতির উল্লেখ করিয়া দারুণ মর্ম্মপীড়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছা হয় না। বিধাতার কঠোর বিধানে ভারতের অদৃষ্টপটে যে নিদারুণ বজ্রাঘাত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য এক কালে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতের শৌর্য্য-বীর্য্যের আশ্রয়স্থল মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতি, আজি কি জানি কোন্ পাপে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। কি জানি, কাহার অভিসম্পাতে সিংহ আজি শৃগাল-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। কি মনস্তাপ!

ব্রাহ্মণ এই শব্দটি উচ্চারণ করিলেই, তপোবলসম্পন্ন কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি নরদেব আর্য্য মহর্ষিগণের পবিত্র জীবনের পুণ্যকাহিনী স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হইয়া চিত্তকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া ফেলে ; কিন্তু পরক্ষণেই ভারতের অস্তমিত সৌভাগ্যসূর্য্যের সংযত-রশ্মিজালের মলিন ছায়া হৃদয়-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া মনকে বিষাদতামসে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। দেবলোক ও পিতৃলোকের হব্য কব্য বহনের জন্য যাঁহার সৃষ্টি এবং সংসারের রক্ষার জন্য যাঁহার উদ্ভব, * সেই ব্রাহ্মণের আজি শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া হৃদয় শোকাকুল হইয়া পড়ে। দেবতারা যাঁহার মুখে হবনীয় দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, পিতৃলোকেরা যাঁহার মুখে শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন †, আজি সেই ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশা ভাবিতে গেলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। যিনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেন ,§ আজি সেই মানব-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দূরে থাকুক, মরণকাল পর্য্যন্তও সেই শ্রেষ্টত্বের শতাংশের একাংশও লাভ করিতে সমর্থ হন্ না, একথা মনে উদয় হইলে দারুণ মর্ম্মব্যথা উপস্থিত হয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই বর্ণত্রয়ের ধর্ম্মরক্ষার জন্যই যাঁহার জন্ম এবং দেবত্বলাভের জন্য যাঁহার উৎপত্তি, তাঁহা অপেক্ষা সংসারে আর কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন ? যিনি মুক্তির দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে সেই শান্তিনিকেতনের সহজ পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিয়া অপার করুণার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহা অপেক্ষা সংসারে আর কে পূজ্য ও বরণীয় হইতে পারেন ? তাঁহা অপেক্ষা কে আর অধিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন ?

* তং হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদাস্যাত্তপস্তপ্ত্বাদিবোঽসৃজৎ।
হব্য কব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে ॥—মনু সং, ১,৯৪।

† যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ ॥—মনু সং, ১, ৯৫।

§ ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥—মনু সং, ১, ৯৯।

কিন্তু হায়! আজি সেই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? বঙ্গদেশ দূরে থাকুক, সমগ্র ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে কয় জন উক্ত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়? ব্রাহ্মণের অবস্থা আজি বড়ই শোচনীয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্মরক্ষা করিবেন কি, আজি ব্রাহ্মণ নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অসমর্থ। *

ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের নেতা, পরিচালক ও রক্ষক ছিলেন। ব্রাহ্মণের গুণেই হিন্দুসমাজ পূর্ব্বকালে নানা গুণে বিভূষিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুসমাজের রাজা ছিলেন। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ-গণের নিকট রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া পবিত্র জীবন লাভ করিয়াছিল। পুরুষানুক্রমে যাহাতে সকলে সেই পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের কর্তৃক উপদিষ্ট বিধি ব্যবস্থা ও অনুশাসন সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন নাই, পরন্তু কঠোর অনুষ্ঠান দ্বারা—তপস্যা দ্বারা আপনাদিগের জীবনকে বহুকাল হিন্দুসমাজের সমক্ষে পুণ্য ও পবিত্রতার আদর্শ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই আদর্শ দেখিয়াই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি আপনাদিগের চরিত্র গঠন করিত, জীবনকে নিয়মিত ও পরিচালিত করিত।

হিন্দুসমাজের মন্দভাগ্য বশতঃ বিধর্ম্মিগণের শস্ত্রাঘাতে সেই বরণীয় আদর্শালেখ্য শ্রীহীন হইয়া পড়িল। স্থানে স্থানে ইহার বর্ণবিচ্যুতি ঘটিল। ক্রমে লোকে আর সহসা ইহাকে সেই পুণ্য পবিত্রতার আদর্শালেখ্য বলিয়া চিনিতে পারিত না! অল্পে অল্পে হিন্দুসমাজের হৃদয়পট হইতে সেই মহতী আদর্শ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ আদর্শাভাবে আপনাদিগের জীবনকে যদৃচ্ছাক্রমে নিয়মিত করিতে আরম্ভ করিল। কাল-ক্রমে হিন্দুসমাজে—হিন্দু-জীবনে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সেই বিশৃঙ্খলার বিষময় ফল আজিও হিন্দুসমাজ ভোগ করিতেছে এবং আরও যে কতকাল করিবে, তাহা বিধাতাই জানেন।

* এস্থানে লেখকের বর্ণনা অতিরঞ্জিত। তাঁহার চিত্র বিশ্বস্ত নয় কেন, সময়ান্তরে প্রদর্শন করিব। সং।

ব্রাহ্মণের অবনতিতেই হিন্দুসমাজের অবনতি। ব্রাহ্মণই হিন্দুসমাজের জীবনী শক্তি। সেই শক্তির হ্রাস হওয়াতেই আজি হিন্দুসমাজরূপ প্রকাণ্ড দেহ নিস্পন্দ মৃতপ্রায়। ব্রাহ্মণ যেমন এক হিসাবে হিন্দুসমাজের রক্ষক, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তেমনই ব্রাহ্মণের রক্ষক ও প্রতিপালক। ভারতলক্ষ্মীর অতুলনীয় রত্নভাণ্ডার-লাভ-লালসায় অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া যে দিন দুর্দ্ধর্ষ যবনগণ আর্য্যাবর্ত্তে সমাগত হইয়াছিল, উত্তরকালে ক্ষত্রিয়গণ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিরাশ্রয় করিয়া ফেলিবে, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হইয়াছিল। বিজাতীয়গণের আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য, ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজগণ সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বহিঃ-শত্রুর গতিরোধ করা অথবা তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করাই হিন্দু রাজকুলের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। সেই চিন্তা দীর্ঘকালস্থায়িনী হওয়াতে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি তাঁহাদিগের আর দৃষ্টি রহিল না। ক্রমে হিন্দুরাজশক্তি বিজাতীয় রাজ-শক্তির সংঘর্ষণে লোপ হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। তাঁহাদিগের আশ্রিত ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বিশেষতঃ ধর্ম্মগত-প্রাণ ব্রাহ্মণগণের কিরূপ অবস্থা ঘটিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ধর্ম্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল। ধন, মান, প্রাণ লইয়া যখন সকলে ব্যতিব্যস্ত, ধর্ম্মানুষ্ঠান তখন আর সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মণগণ যে রত্নকে লক্ষ কোহিনূর অপেক্ষা মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া আবহমান কাল অতি যত্নে, হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে, প্রগাঢ় শ্রদ্ধারূপ সুদৃঢ় পেটিকায় রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, এবং যাহার অপার্থিব অত্যাশ্চর্য্য উজ্জ্বল প্রভা শত আবরণ ভেদ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের আকাশমণ্ডলকে উদ্ভা-সিত করিয়া পৃথিবীর তাৎকালিক যাবতীয় সভ্য ও অসভ্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই দেবদুর্ল্লভ ধর্ম্মরূপ মহারত্ন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। যে দিন ভারতবর্ষে আসুরিক-প্রকৃতি যবনগণ পদার্পণ করে, সেই দিনেই দেবস্বভাব আর্য্যগণের আবাসভূমি এই ভারতবর্ষের নৈসর্গিক ব্যাপার-সমূহের মধ্যে এক বিজাতীয় ভাবের ছায়া-পাত হয়, সেই বিজাতীয় ভাব ক্রমে ঘনীভূত হইয়া ভারতের জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতির

অভাবণীয় গুণবিপর্য্যয় সংঘটন করিতে লাগিল। জড় প্রকৃতির প্রবল বিপর্য্যয়ে হিন্দুগণের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রকৃতি বিকৃত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণগণের হৃদয়-মণি কাচে পরিণত হইল। ইহাতে যে কেবল ব্রাহ্মণগণেরই ক্ষতি হইল,তাহা নহে; পরন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজের ক্ষতি ও সর্ব্বনাশ করিল। সে ক্ষতি কি আর কখনও পূর্ণ হইবে?

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যগণেরও অধঃপতন হইল। স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভবে না। ব্যবসায় বাণিজ্যই বৈশ্যের জীবিকা। বিষয়বুদ্ধিপ্রবল লোকের জীবিকার্জ্জনের পথ সঙ্কটাপন্ন হইলে, তাহাকে জীবন্মৃতাবস্থায় উপনীত হইতে হয়। ধনাগমের উপায় চিন্তা করা দূরে থাকুক, বিজাতীয়গণের হস্ত হইতে সঞ্চিত ধন রক্ষা করিবার উপায়ই যাহাদিগের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল, তাহাদিগের আর উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? উন্নতি দূরে থাকুক, অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা উপস্থিত হইল। বিষয় ব্যাপারের অষ্টপ্রহর চিন্তায় ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের অবসর লোপ হইতে লাগিল। ক্রমে বৈশ্যজাতির অবনতি হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা শূদ্রগণ জীবিকা উপার্জ্জন করিত। উপরোক্ত বর্ণত্রয়ের সহবাসে শূদ্রগণ জ্ঞান লাভ করিত। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রগণের বৈষয়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিল।

এক কথায় বলিতে গেলে হিন্দুসমাজের ঘোর অবনতি হইল। ক্রমে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন হিন্দু-সমাজকে আর সেই সুপ্রাচীনকালের হিন্দুসমাজ বলিয়া চিনিতে পারা যাইত না। হিন্দুসমাজ বিজাতীয় প্রকৃতির সংস্রবে বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিজাতীয় শ্রী ধারণ করিল। হিন্দু-সমাজরূপ একটি প্রকাণ্ড জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের অংশ-বিশেষের যে অভাবনীয় ক্ষতি করিয়াছে, তাহা আর কখনও পূর্ণ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আর্য্য সমাজের ধ্বংস হওয়াতে অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী প্রকৃতি-দেবীর যেন এক প্রধান অঙ্গ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কথায় কথায় আমরা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে মনের এতই আবেগ উপস্থিত হয় যে, নানা কথার অবতারণায় ক্রমে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে উপনীত হইয়া বহুদূরে গিয়া পড়িতে হয়; মনস্তাপ উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তোলে।

আমরা নানা কারণে শব্দশাস্ত্রবিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বেদ-রচনার কাল নির্ণয় করিতে অথবা হিন্দুজাতির নষ্ট জন্মকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে প্রয়াসী নহি। কোন্ কালে বেদত্রয় রচিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কোন্ সময়েই বা হিন্দুজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, এ সকল কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের বিশ্বাস, বেদ অনন্তকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। "অনন্তকাল" বলি এই জন্য যে, মনুষ্যবুদ্ধি ইহার কাল নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই, হইবেও না। যত দিন বেদ, ততদিন হিন্দুজাতি। বেদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। অথবা হিন্দুজাতির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, এ কথাও বলা যাইতে পারে। বেদ লইয়া হিন্দুজাতি, হিন্দুজাতি লইয়া বেদ। বেদকে ছাড়িয়া দিলে, হিন্দুজাতির হিন্দুত্ব থাকে না। আবার হিন্দুজাতিকে ছাড়িয়া দিলে, বেদের বেদত্ব থাকে না—ইহা লোপ প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই দুইটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব।

এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বারান্তরে আলোচিত হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুরাজার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা।

মহাত্মা হিন্দু-বীরগণের পবিত্র জীবন-কাহিনী আমরা যতই আলোচনা করি, তাঁহাদের অতুলনীয় গুণরাশি দেখিয়া ততই বিমুগ্ধ হই। কখনও দেখিতে পাই, স্বদেশ-রক্ষার জন্য তাঁহারা ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শত্রুকুলকে বিত্রাসিত ও বিমর্দ্দিত করিতেছেন; কখনও দেখিতে পাই, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যা-ভগিনীগণের সম্মান রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন; আবার কখনও দেখিতে পাই, প্রজা-বৃন্দের সন্তোষ বিধানের জন্য—দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁহারা আপনা-দেরই উপর কঠোর শাস্তি বিধান করিতেছেন। প্রজাগণের সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য—সমস্তই প্রজার রাজভক্তির উপর নির্ভর করে; প্রজাপীড়ন করিলে ঈশ্বর, রাজাকে অচিরে ধ্বংস করেন; তাই সেই প্রাতঃস্মরণ্য মহামান্য নরপতিরা ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, প্রজাগণের সুখ দুঃখ লক্ষ্য করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। তাঁহাদের অবিনশ্বর কীর্ত্তি-কথা, ইতিহাসের পত্রে পত্রে জলদক্ষরে লিখিত আছে।

রাঠোর-রাজ গজসিংহের অমর-সিংহ ও যশোবন্ত-সিংহ নামে দুই পুত্র ছিল; অমর জ্যেষ্ঠ, যশোবন্ত কনিষ্ঠ। হিন্দুর উত্তরাধিকার-নিয়মানুসারে অগ্রজ অমরসিংহই মারবার-সিংহাসনের অধিকারী এবং যশোবন্তসিংহ, সামন্ত নৃপতিরূপে ভূমি সম্পত্তি ভোগ করিয়া চিরদিন অগ্রজের অধীন থাকিবেন। কিন্তু রাঠোর-রাজ গজসিংহ, জ্যেষ্ঠ অমরকে মারবার-সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠ যশোবন্তকে তাহা অর্পণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ অমর সিংহ তাঁহার আজ্ঞানুসারে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন।

কেন এমন হইল? চিরন্তনী হিন্দুনীতির কেন এরূপ অভাবনীয় ব্যভিচার ঘটিল? যে রাজপুতগণ স্বভাবতঃ প্রাচীন সংস্কারের পক্ষপাতী, যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের অনুষ্ঠিত একটী সামান্যমাত্র আচারের তিলমাত্র ব্যতিক্রম

করেন না, তাঁহারা কেন এমন পরিবর্ত্তন করিলেন? ইহার কারণ আছে। অমরসিংহ বাল্যকাল হইতে প্রচণ্ড ও উদ্ধত-স্বভাব ছিলেন। প্রজাবর্গের উপর তিনি বড়ই অত্যাচার করিতেন। দূরদর্শী গভীর রাজনীতিকুশল মহারাজ গজসিংহ, অমরের উদ্ধত স্বভাব দেখিয়া আশঙ্কিত হইতেন। তিনি ভাবিতেন, অমরের এই দুর্দ্ধর্ষ চরিত্রই বুঝি ইহার কালস্বরূপ হইবে। তিনি বালকের গতি মতি প্রকৃতি দেখিতেন আর সুদৃঢ় মারবার রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেন। অমরের বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহার সহিত প্রচণ্ড প্রকৃতিও প্রচণ্ডতর হইতে লাগিল। তখন মহারাজ ভাবিতেন—ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অমর, আমার সিংহাসনাধিকারী বটে, কিন্তু ইহাতে বসিবার যোগ্য কি না? আজ আমি পুত্র-স্নেহের বশীভূত হইয়া তাহাকে এই সিংহাসনে বসাইব, কিন্তু সে কোন্ গুণে এই পঞ্চাশৎ সহস্র রাঠোরের হৃদয়-সিংহাসন লাভ করিবে? প্রজার হৃদয়-সিংহাসন লাভ করিতে না পারিলে, কেবল এ সিংহাসনে বসিয়া উপকার কি? অমরের এমন কি গুণ আছে, যাহাতে সে অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে পারে? সত্য বটে, সে নিস্তেজ বা নির্ব্বীর্য্য নহে; সত্য বটে, তাহার তেজস্বিতা ও বীর্য্যমত্তার সম্মুখে অতি প্রবল শত্রুও মুহূর্ত্তে বিদগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তেজস্বিতা ও বীর্য্যমত্তায় রাজ্য অর্জ্জিত হয়, রক্ষিত হয় না তো! অসি-বলে রাজ্য রক্ষা হয় না। পাশব-বলে দেশ শাসিত হয় না! রাজ্য সুশাসিত ও সুরক্ষিত করিতে হইলে, প্রজাবৃন্দকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিতে হইবে। কিন্তু অমর, তাহাদিগকে পালন করা দূরে থাকুক, অতি পাশব ব্যবহারে তাহাদিগকে দেশত্যাগী করিবার উপক্রম করিয়াছে! সুতরাং আমি বুঝিয়া সুঝিয়া কিরূপে এরূপ এক জন অবিমৃষ্যকারী উদ্ধত-স্বভাব যুবার হস্তে এ বিশাল সাম্রাজ্য অর্পণ করি! মারবারের আয়তন বৃদ্ধি করিতে, নানা সুখ-সমৃদ্ধিতে মারবারকে পূর্ণ করিতে আমার স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কত শোণিত ব্যয় হইয়াছে! কত পুণ্যবান্ পুরুষের অমূল্য প্রাণ-বিনিময়ে এ রাজ্য অর্জ্জিত হইয়াছে। আজ যদি আমি অমরের মুখের পানে চাহিয়া এ রাজ্য তাহার হস্তে তুলিয়া দিয়া যাই, এই নৃশংস-প্রকৃতি সন্তানের কঠোর ব্যবহারে প্রজারা বিপক্ষ হইবে, দেশের শান্তিভঙ্গ

হইবে, গৃহে শত্রু প্রবেশ করিবে, তাহাদের সংস্পর্শে মারবার অপবিত্র হইবে, পবিত্র দেবালয়, যবনের লীলাস্থল হইবে এবং পিতৃপুরুষগণের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আমাকে সবংশে নিরয়গামী হইতে হইবে। পরিণামদর্শী মহারাজ গজসিংহ, সর্ব্বদা এই সব আশঙ্কা করিতেন। কিন্তু আশা, মধ্যে মধ্যে তাঁহার কর্ণে প্রবোধ-বাণী শুনাইত! তিনি কখন কখনও আশার মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেন—"বয়সে অমরের এ সব দোষ সারিয়া যাইবে—জ্যেষ্ঠ অমরই সিংহাসনে বসিবে।"

বৃদ্ধ রাজা যতই আশা করুন, অমরের প্রকৃতি, দিন দিন সকলকে মহা আতঙ্কিত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। রাজ্যের যত দুরাত্মা অমরের সহিত যোগ দিল; অমরসিংহ তাহাদের দলপতি হইয়া অকারণে বিনা উত্তেজনায় যাহার তাহার বিরুদ্ধে অসি চালনা করিতে লাগিলেন; যাহাকে তাহাকে অবমানিত করিতে লাগিলেন। রাজ্যের প্রজাবর্গ একান্ত প্রপীড়িত হইয়া দলে দলে আসিয়া মহারাজের সমীপে অমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিল। মহারাজের যত আশা, নিরাশার প্রখর উত্তাপে বিশুষ্ক হইল। তিনি তখন রাজ্যের ভাবী মঙ্গল ও প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ দুঃখ ভাবিয়া পুত্র-স্নেহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাজার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে সচেষ্ট হইলেন।

সংবৎ ১৬৯০ অব্দের বৈশাখমাসে একদা মারবাররাজ গজসিংহ অধীনস্থ সর্দ্দার ও সামন্তগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা এরূপ সহসা আহ্বানের কিছুই কারণ জানিতে পারিলেন না; তাঁহারা ভাবিলেন, বুঝি কোন বহিঃ-শত্রু মারবার-রাজধানী আক্রমণ করিবে, অথবা বীরকুলর্ষভ রাজনীতিজ্ঞ মহারাজ গজসিংহ, কোন নূতন রাজ্য আক্রমণ করিবেন। যাহাই হউক, সামন্ত-নৃপতিগণ স্ব স্ব পাত্র-মিত্র ও সেনাদল সমভিব্যাহারে মারবার রাজ-ধানীতে সমাগত হইলেন। সকলেই বিবিধ উপঢৌকনে মহারাজের বন্দনা করিলেন, কিন্তু আগমনের প্রকৃত কারণ কেহই জানিতে পারিলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিনে মহারাজ গজসিংহ, সামন্ত-রাজগণের সহিত রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। সভা প্রবেশ করিয়া সামন্ত-নৃপতিগণ যুগপৎ বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সভাক্ষেত্রে বিবাসন-বিধি ও তদানুষঙ্গিক ক্রিয়াপদ্ধতি সকল অনুষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে—অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ন্যায় সকল সাজ

সজ্জা সভাতলে সজ্জিত রহিয়াছে। সভাক্ষেত্রে এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার, রাজপুত্রগণ কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকেন।

সম্মুখে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে মহারাজ গজসিংহ উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে রাজ্যের সামন্তগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদা অনুসারে সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। সকলে উপবেশন করিলে, মহারাজ গজসিংহের আদেশক্রমে অমরসিংহ, সভাক্ষেত্রে আহূত হইয়া সম্মুখে ঈষৎ দক্ষিণে সিংহাসনে বসিতে উপদিষ্ট হইলেন। সভাস্থ সকলে নীরব—নিস্তব্ধ—গম্ভীর; কেহই কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না—তাঁহাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্র মহারাজ গজসিংহের তেজঃপূর্ণ গম্ভীর বদনে সংযত; তাঁহাদের হৃদয়, আজ বিষম উদ্বেগে পরিপূর্ণ; মহারাজ গজসিংহ মুহূর্ত্ত পরে কি আদেশ প্রচার করিবেন, সে আদেশের সহিত কাহার অদৃষ্ট কোন্ পথে ধাবিত হইবে, এই ভাবনায় তখন তাঁহাদের হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সহসা সেই স্থির নিঃশব্দ সভার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীরস্বরে এই আদেশ প্রচারিত হইল— "উদ্ধত-স্বভাব, নিষ্ঠুর-হৃদয় দুরাত্মা অমরসিংহ প্রতিনিয়ত মারবার রাজ্যের প্রজার উপর অত্যাচারের একশেষ করিয়া থাকে; প্রজাবর্গের কাতরোক্তি আর শোনা যায় না; ন্যায় ও ধর্ম্ম পালনের জন্য, দেশের বর্ত্তমান শান্তি ও ভাবী মঙ্গলের জন্য অমরসিংহকে অগ্রজ-স্বত্বে বঞ্চিত করা গেল; বর্ত্তমানে তিনি আর এ রাজ্যের কেহ নহেন; ভবিষ্যতেও মারবার-রাজসিংহাসনে তাঁহার অধিকার নাই; মারবারের ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যশোবন্ত সিংহের উপর অর্পিত হইল; অমরসিংহ নির্ব্বাসিত—এক্ষণে তিনি দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউন।"

নীরব নিস্তব্ধ প্রান্তরে সহসা বজ্রপতন হইলে, পথিক যেমন ভীত ও স্তম্ভিত হয়, সভাস্থ সকলে সেইরূপ উপরোক্ত আদেশ শুনিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু উদ্ধত-স্বভাব তেজস্বী অমরসিংহ তিলমাত্র কম্পিত হইলেন না। আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র নির্ভীক রাজপুত-যুবক, সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাসনের বসন ভূষণ তাঁহাকে দেওয়া হইল। অমরসিংহ সেই সব কৃষ্ণবর্ণের বসনে সজ্জিত হইলেন,—কাল পায়-জামা, কাল আঙ্‌রাখা, মাথায় কাল টুপি, কটিদেশে কাল তরবারি,

হস্তে কাল ঢাল। সেই সব অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইলে, কৃষ্ণবর্ণের অশ্ব আনীত হইল। অশ্ব দেখিবামাত্র তেজস্বী যুবক, বেগে সভাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া উল্লম্ফনে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং তীব্র কষাঘাত করিলেন। তেজ-গর্ব্বিত অশ্ব, অমনই হ্রেষাধ্বনি করিয়া অমরকে পৃষ্ঠে লইয়া নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় অমরসিংহ কাহারও মুখের দিকে একটী বার তাকাইয়া দেখিলেন না—কাহাকেও অনুগামী হইতে বলিলেন না।

তখনও মহারাজ গজসিংহ সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তিনি আপন সামন্ত নৃপতিগণ-সমক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অগ্রজ-স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলেন, অবশেষে তাহাকে চিরনির্ব্বাসিত করিলেন, তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হইলেন না—কেহ তাঁহার মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র কাতর ভাব দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য, প্রজাবর্গের ভাবী কল্যাণের জন্য, আত্মজকে বিসর্জ্জন দিলেন! ইহাপেক্ষা প্রজাবাৎসল্যের ও রাজার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার আর অধিক উজ্জ্বল চিত্র কি হইতে পারে?

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মহারাজ গজসিংহ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ অসাধারণ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও প্রজাবাৎসল্যের কথা এখনও রাজস্থানের প্রত্যেক নর-নারীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অতীতের সাক্ষী ইতিহাস এ অদ্ভুত কাহিনী, অনল অক্ষরে লিখিয়া উচ্চ কণ্ঠে জগন্ময় বিঘোষিত করিতেছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

"কৃষ্ণকান্তের উইল"-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।*

"কৃষ্ণকান্তের উইলের" দ্বিতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে :—

"অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন। রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে—

"এই খানে।"

"গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে, রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই খানে কি ?"

"যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে—

"এমনি সময়ে।"

"গোবিন্দলাল কলে বলিলেন—"এই খানে, এমনি সময়ে কি রোহিণী ?"

"মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল,—

"এই খানে, এমনি সময়ে ঐ জলে আমি ডুবিয়াছিলাম !"

"গোবিন্দলাল আপন মানসোদ্ভূত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন"—

"আমি ডুবিব ?"

"আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিলেন,—

"হাঁ আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাঁহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত্ত কর ! মর !!"

---

* বঙ্কিমচন্দ্র বাবুর প্রতি আমাদের অনুরাগ যথেষ্ট। কেবল সাধারণের আলোচনার জন্য ইহা পত্রস্থ করা গেল। পু-সং।

"গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।"

"পর দিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেই খানে তাঁহার মৃত দেহ পাওয়া গেল।"

"কৃষ্ণকান্তের উইলের" চতুর্থ সংস্করণে সেই সবই আছে, কিন্তু—"প্রায়শ্চিত্ত কর! মর!!" এই কথার পর শেষ ভাগটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

"গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া সোপান শিলার উপরে পতিত হইলেন।"

"মুগ্ধাবস্থায়, মানস চক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীমূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমর-মূর্ত্তি সম্মুখে উদিত হইল।"

"ভ্রমরমূর্ত্তি বলিল—মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন; বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে"।

"গোবিন্দলাল, সে রাত্রে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেই খানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন, যে তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।"

"সাত বৎসর পর, তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।"

তার পর পরিশিষ্ট বা শেষ অধ্যায়ে প্রথমাংশে সামান্ত দুই একটী কথার পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছু বদ্‌লান হয় নাই। তবে, গ্রন্থকার চতুর্থ সংস্করণে, দ্বিতীয় সংস্করণের মৃত গোবিন্দলালকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন বলিয়া,

শেষাংশটুকু একটু বাড়াইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের সেটুকু এই :—

"যে সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান হইবে, আমি তাহাকে এই স্বর্ণ প্রতিমা দান করিব।"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই গ্রন্থকার পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এবারে অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণে, আরও খানিকটা লিখিয়া তবে পুস্তক খানি সমাপ্ত করা হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সে শেষাংশটুকু এই :—

"ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীকান্ত সেই খানেই ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন —"এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।"

শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল—"এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

"শচীকান্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে, বিস্ময় দূর হইলে, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আজ আমার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাত-বাস সমাপন পূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিল—"বিষয় আপনার, আপনি ভোগ করুন্।"

গোবিন্দলাল বলিলেন—"বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমিই ইহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীত ভাবে বলিল—"সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?"

গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন—"কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদ-পদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনি আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।

এই পর্য্যন্ত তো গেল পুস্তকের কথা। এখন আমাদের কথা বলি।

"সীতারাম" "দেবী চৌধুরাণী" ইত্যাদি লিখিয়া গ্রন্থকারের মন ফিরিয়া যাওয়াতে, "দ্বিতীয় সংস্করণের" মৃত গোবিন্দলালকে "চতুর্থ সংস্করণে" পুনর্জীবিত করিয়া, দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর ভ্রমরমূর্ত্তি সন্দর্শনহেতু, হরিদ্রাগ্রামে সন্ন্যাসিবেশে আনিয়া ফেলিয়াছেন,—এ একটা নূতন কাণ্ড বটে। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, এ ঘটনা গ্রন্থকার কেন ঘটাইলেন? কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোবিন্দলাল পুনর্জীবিত হইল? যদি গ্রন্থকারের গোবিন্দলালকে বাঁচাইবার বিশেষ কোন কারণ ছিল, তবে তাঁহার কার্য্যকলাপের আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণ দিলে ভাল হইত না কি?

শুধু "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।" "এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়" "ভগবৎ-পাদ-পদ্মে মনঃ স্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর" এই কয়টী কথা বলিবার জন্যই কি তিনি গোবিন্দলালকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন? না, আর কোন কারণ আছে?

অথবা এই গোবিন্দলাল একদিন বলিয়াছিলেন "সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি—আপনার আপনার কসেই'া করিয়া মরিব কেন?" "পাপে কাহারও অধিকার নাই—আত্মহত্যা ৺গৃহেলাপ।" সেই জন্যই কি গ্রন্থকার গোবিন্দলালকে বাঁচাইলেন?

কেন বঙ্কিমচন্দ্র বাবু গোবিন্দলালকে পুনর্জীবিত করিলেন, তাহার কিছু নিশ্চয় নাই। তবে, আমরা গ্রন্থকারের নিকট এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি না, যে, যদি তিনি গোবিন্দলালের মৃতদেহটীকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে "বারুণীর" জল-তল হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া, "সোপান শিলার উপর" মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখাইতে পারিলেন, যদি তিনি দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর "বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি" "এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর" এমন কথাও গোবিন্দলালের

মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলেন, তবে কেন ভ্রমর দর্শন আশায় “ভগবৎ-পাদ-পদ্মে”-মনঃস্থাপিত ব্যক্তিকে, পুনরায় হরিদ্রাগ্রামে আনয়ন করিলেন? এতদূর যদি করিলেন, তবে ভ্রমরের জীবনদান করিতে কি ক্ষতি ছিল?

গোবিন্দলাল স্বহস্তে রোহিণীকে হত্যা করিয়াও বিচারকগণের হস্তে মুক্তি পাইলেন, এটা কিছু অসম্ভব নয়—এরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিয়া থাকে—কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহাকে কি সুখভোগের জন্য বাঁচাইলেন? বাঁচাইলেন তো ভ্রমরের সহিত মিলন করানতে কি দোষ ছিল? এ মিলনে—ভ্রমর, বোধ হয়, মরিত না। যে গোবিন্দলাল একদিন বলিয়াছিলেন—“ভ্রমর তোমার দানগ্রহণ করিয়া আমার জীবন ধারণ করিতে হইবে?” “এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।” “আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।” সেই গোবিন্দলাল আর একদিন ভ্রমরকে অনেক মিনতি করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন—“আমি এখন নিঃস্ব, তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। আমায় আশ্রয় দিবে কি?” ইত্যাদি—

পূর্ব্বে, গোবিন্দলালের অভিমান ছিল,—ভাবিবার রোহিণী ছিল,—মজিবার রূপ মোহ ছিল। ভ্রমরের দোষে ও আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের তুলনায়, ভ্রমর তাঁহাকে বিনা কারণে অবিশ্বাস করিয়াছে বলিয়া—গোবিন্দলালের অভিমান করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বারে তো তাঁহার সে সব দোষ কিছুই ছিলনা। সে রূপ-তৃষ্ণা ছিল না, সে আত্মাভিমান ছিল না, সে ঐশ্বর্য্যমত্ততা ছিল না, সে রোহিণী-প্রসক্তি ছিল না—পাপের চরম সীমা পর্য্যন্ত দেখিয়া গোবিন্দলাল পুনরায় ভ্রমরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িবার জন্য কাতরভাবে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় ভ্রমরকে অত কঠোর না করিলে, গোবিন্দলাল পুনরায় হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিতেন, ভ্রমরও মরিত না। ভ্রমর তো মরিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে নাই বা তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয়। তবে ভ্রমরকে পুনর্জ্জীবিত করিতে ক্ষতি ছি[illegible]?

“ভ্র[illegible]তীয় সংস্করণ” হইতে “চতুর্থ সংস্করণে” যদি গোবিন্দলাল পুনর্জ্জীবিত

হইতে পারে, তাহা হইলে, আমার বোধ হয়, তাঁহার "ষষ্ঠ সংস্করণে" ভ্রমরকে পুনর্জীবিত দেখিতে পাইব, এরূপ আশা করিতে পারি।

"আলুলায়িত-কুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, সপ্তদশবর্ষীয়া ভ্রমর, গোবিন্দলালের পদতলে বিলুণ্ঠিতা হইয়া একদিন বলিয়াছিল— "তাহাতেই (আমার দান গ্রহণ করিতে) বা ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই।" "আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎ সংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে,—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার খেলিবার পুতুল—আমার কি অপরাধ হইল।" "অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত সহস্র অপরাধ হইয়াছে, আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।"

আর একদিন ভ্রমর স্বামীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিল—"দেখ তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?" "তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমায় ত্যাগ করিতে চাও, কর; কিন্তু মনে রাখিও—উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয় বল, যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার "ভ্রমর" বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি একথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

গোবিন্দলাল অত্যন্ত হীনাবস্থায় পড়িয়া যখন ভ্রমরকে পত্র লিখিয়াছিলেন—"ভ্রমর! ছয় বৎসরের পর এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে।

প্রবৃত্তি হয় পড়িও ; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও। আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। * * আমি এখন নিঃস্ব * * অন্নাভাবে মারা যাইতেছি * * তাই, আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে, এ কালা মুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া পরদার নিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল * * তাহাকে তুমি স্থান দিবে কি ?"

এ পত্রের উত্তরে ভ্রমর লিখিল—"আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা আর নাই। ইহাতে আমিও সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

এরূপ মিলিটারি ওয়াইফ্‌বৎ (military wife) পত্র * কি ভ্রমরের লেখা উচিত ছিল ? এরূপ পত্র না লিখিলে, গোবিন্দলালও আসিতেন—ভ্রমরও বাঁচিত—সকল দিকই বজায় থাকিত। অথচ "কৃষ্ণকান্তের উইলের" সৌন্দর্য্য সেই সমভাবেই অক্ষুণ্ণ থাকিত।

এখন বঙ্গীয় উন্নতিশীল লেখক ও সমালোচকগণ অনুগ্রহ করিয়া, সাধারণ পাঠকবৃন্দকে এ কথা বুঝাইয়া দিবেন কি ? বুঝিতে পারিলেই আর কেহ দ্বিরুক্তি করিবে না। নহিলে এইরূপ লেখা-লেখির পর "মৃণ্ময়ীর" ন্যায়, "কৃষ্ণকান্তের উইলের" উপসংহার স্বরূপ "ভ্রমর" না হয় "গোবিন্দলাল" নামে আর একখানি পুস্তক বাহির হওয়াই বা আশ্চর্য্য কি ?

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

* "ভ্রমর" যেরূপ আন্তরিক জ্বালাতন হইয়াছিলেন, তাহাতে ওরূপ উক্তি অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়। পু-সং।

সঙ্গীতশাস্ত্র।

"গানাৎ পরতরং নহি"

সঙ্গীত, ভগবৎ-আরাধনার প্রধান অঙ্গ ; সাধনার অন্যতম দ্বার। আধুনিক সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উপাসনা প্রণালীতে সঙ্গীত প্রচলিত। হরি-সভায়, ব্রাহ্মসমাজে, খ্রীষ্টানের গির্জ্জায় জগদীশ্বরের স্তুতিগান সুললিত সুর-লয়ে গীত হইয়া ভাবুক ভক্ত-হৃদয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তিরসের উদ্রেক করিয়া প্রাণকে মত্ত করিয়া তোলে। ভগবৎ-সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া নারদাদি দেবর্ষিগণ, সাংসারিক ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরাৎপরের প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম-মুখ-নিঃসৃত বেদ-গান আজিও হিন্দুর পরম পবিত্র ধন *। চিত্তবৃত্তির সম্যক্ পরিস্ফুরণ এই সঙ্গীত-বিদ্যারই কার্য্য। চিত্তকে গলাইতে, মর্ম্মগ্রন্থী শিথিল করিতে, আত্মহারা করিতে, পুত্রশোকের কালানল নির্ব্বাণ করিতে জগতে যদি কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহা সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের সুমধুর লহরীতে পাষাণ দ্রবীভূত হয় ; ইহার মোহিনী শক্তিতে পশু-পক্ষীও স্তম্ভিত—আত্মহারা হয়, ইহারই মোহিনী সঞ্জীবনী শক্তিতে নির্জীবও সজীব হইয়া উঠে। এই সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়াই বৃন্দাবনে "যমুনা উজান বহিয়াছিল।" ফণিগণ ফণিভূষণের শিরোভূষণ হইয়াছিল এবং স্বয়ং ভগবান্ গলিয়া গিয়াছিলেন, তাই বিষ্ণুপাদ-নিঃসৃতা দ্রবময়ী সুরধুনীর উৎপত্তি। সঙ্গীতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই সাধক বঙ্গীয় কবি রামপ্রসাদ, ভক্তবৎসলা বিশ্বজননীকে কন্যারূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। বিশ্ব-প্রেমিক চৈতন্যদেবের হরি-সংকীর্ত্তনে পাপীর পাষাণ হৃদয়ও ভক্তিরসে গলিয়া গিয়াছিল, হরিনামামৃতে সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল ; আজিও হরিনাম-সংকীর্ত্তনে হৃদয় উদ্বেল হয় কি না? হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে কি না? সর্ব্বত্যাগী হইয়া হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইতে হয় কি না? তাহা আর সহৃদয় পাঠকগণকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

* বেদ-গান, নানা ঋষির কণ্ঠ-নিঃসৃত। পু-সং।

সঙ্গীত-সিদ্ধ মহাকবি জয়দেবের গৃহে ভগবান্ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাধক কবির মনের ভ্রম দূর করিবার জন্য, পরম পুরুষ ও পরমা শক্তির অভেদত্ব বুঝাইবার জন্য শ্রীহস্তে লিখিয়াছিলেন,—

"দেহি পদপল্লবমুদারম্"।

ভক্ত কবির মনের অন্ধকার বিদূরিত করিতে তিনি ভক্তিগদগদস্বরে গাইলেন,—

"স্মরগরলখণ্ডনম্,
মম শিরসি মণ্ডনম্,
দেহি পদপল্লবমুদারম্"।

যে সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে ত্রিলোক মুগ্ধ, যে সঙ্গীত দেবাদিদেব মহাদেবের মুখ-প্রসূত, বাগীশ্বরী বীণাপাণির বীণায় ঝঙ্কারিত, সেই পরম পবিত্র স্বর্গীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্যই আজ এই প্রস্তাবের অবতারণা।

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটী সমবায়ে তৌর্য্যত্রিক নামে অভিহিত, এই তৌর্য্যত্রিক লইয়াই সঙ্গীতশাস্ত্র। আদিতে আকাশ হইতে নাদ উৎপন্ন হয়। নদ ধাতুর অর্থ ধ্বনি সুতরাং নাদ শব্দে ধ্বনি-বিশেষকেই বুঝায়। এই নাদ বা ধ্বনিই সঙ্গীতের মূল ভিত্তি। নাদ দ্বিবিধ, বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। কণ্ঠ-তালুর সাহায্যে উচ্চারিত নাদই বর্ণাত্মক, আর দ্বিবিধ বস্তুর আঘাতোৎপন্ন শব্দবিশেষের নাম ধ্বন্যাত্মক। এই বর্ণাত্মক অথচ স্নিগ্ধ ও রঞ্জন-গুণ-বিশিষ্ট ধ্বনিকেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে স্বর বলে; স্বরের অপর ভাষাই সুর। "স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ স্বর ইত্যভিধীয়তে"—ইতি সঙ্গীতশাস্ত্রম্। সুরের সূক্ষ্মাংশই শ্রুতি অর্থাৎ উভয় সুরের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম সুরাংশগুলি অনুভূত হয়, তাহাকেই সুরের শ্রুতি বলে। সঙ্গীতশাস্ত্রে সুরের শ্রুতি বাইশটী।

যেমন প্রথম নয়টী অঙ্ক ও শূন্যই অঙ্কশাস্ত্রের মূল; সেইরূপ ষড়জ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ বা নিখাদ, এই সপ্তসুর গীতের মূল; ইহাদের সাঙ্কেতিক নাম যথাক্রমে—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। সঙ্গীতশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এই সপ্ত স্বর সপ্ত প্রাণীর স্বর হইতে গৃহীত;—ময়ূর হইতে ষড়জ, বৃষভ হইতে ঋষভ, ছাগ হইতে গান্ধার, শৃগাল হইতে মধ্যম, কোকিল

হইতে পঞ্চম, অশ্ব হইতে ধৈবত ও হস্তী হইতে নিষাদ। সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত এই প্রসিদ্ধি অধুনাতন গায়কেরা বিশ্বাস করিতে চাহেন না; বাস্তবিক ঐ সকল স্বর ঐ সকল জন্তু হইতে গৃহীত কি না, সে বিষয়ের বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

এই স্বর-সপ্তক আবার দুই ভাগে বিভক্ত—শুদ্ধ ও বিকৃত। যে স্বর অবিকৃত, তাহাই শুদ্ধ; আর যাহা কোমল বা তীব্রভাবে বিকৃত, তাহাই বিকৃত স্বর। সুরের ঊর্দ্ধগতির নাম অনুলোম ও নিম্নগতির নাম বিলোম। মনুষ্য-কণ্ঠ হইতে ত্রিসপ্তকের অধিক উচ্চারিত হয় না। নাভি হইতে যে সুরসপ্তক উচ্চারিত হয়, তাহার নাম অনুদাত্ত বা উদারা; বক্ষঃ হইতে যে সপ্তক উচ্চারিত হয়, তাহার নাম স্বরিৎ বা মুদারা, আর মস্তক হইতে উচ্চারিত সপ্তকের নাম উদাত্ত বা তারা। যাহার আশ্রয়ে অন্য ছয়টী সুরের জ্ঞান হয়, তাহাকেই স্বরগ্রাম কহে। সচরাচর ষড়্জ বা "সা" স্বরগ্রাম হইয়া থাকে। স্বর-কম্পনের নাম মূর্চ্ছনা ও গমক।

সুর, তাল-সংযুক্ত হইয়া কণ্ঠে বা যন্ত্রে উচ্চারিত হইলে গীত হয়। "ধাতু মাত্রা সমাযোগঃ গীত ইত্যভিধীয়তে"—ইতি ভরতঃ। গীতের চারিটী পাদ আছে, যথা—অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। গীত দুই প্রকার—কণ্ঠ্য ও যান্ত্রিক। যে গীত, মনুষ্যকণ্ঠে উচ্চারিত, তাহাই কণ্ঠ্য; আর যাহা বীণাদি যন্ত্রে গীত হয়, তাহাই যান্ত্রিক। অনুলোম ও বিলোম দ্বারা রাগাদির সম্যক্ বিস্তার করার নাম তান এবং গীতে নানা সুরের কৌশল প্রদর্শন করার নাম কর্ত্তব্। কর্ত্তব্ কথাটী কর্ত্তব্য কথার অপভ্রংশ-মাত্র।

প্রসিদ্ধ-সঙ্গীত-গ্রন্থকর্ত্তা ভরতের মতে "রঞ্জয়তীতি রাগঃ" অর্থাৎ যে সুর-বিশেষে চিত্তরঞ্জন করা যায়, তাহাকে রাগ বলে। রাগ ছয়টী, যথা—শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত, মেঘ এবং বৃহন্নট বা নট-নারায়ণ। আমাদের শাস্ত্রমতে মহাদেবের পঞ্চ মুখ হইতে প্রথমোক্ত পাঁচটী এবং ভগবতীর মুখ হইতে শেষোক্তটী উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক রাগের ছয়টী ভার্য্যা কথিত আছে, সুতরাং সর্ব্বসমেত ছত্রিশটী রাগিণী। এক্ষণে এই মূল ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সংমিশ্রণে অনেক নূতন নূতন রাগ রাগিণী সৃষ্টি হইতেছে। রাগ তিন ভাগে বিভক্ত—শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সঙ্কীর্ণ। যে রাগের সহিত অন্য রাগ

মিশ্রিত না থাকে তাহাই শুদ্ধ; যাহা রাগদ্বয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা সালঙ্ক, আর যাহা বহুরাগ-মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই সঙ্কীর্ণ। রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি সঙ্গীতশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

পূর্ব্বকালে উক্ত ছয় রাগের আলাপ করিবার বিভিন্ন ঋতু নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিখ্যাত-সঙ্গীত-গ্রন্থ-প্রণেতা সোমেশ্বরের মতে,—গ্রীষ্মে ভৈরব, বর্ষায় মেঘ, শরতে পঞ্চম, হেমন্তে নটনারায়ণ, শীতে শ্রী এবং বসন্তে বসন্তরাগ আলাপ করিবার উপযুক্ত কাল।

অধুনাতন গায়কেরা এক এক রাগ বা রাগিণীকে নানা অংশে বিভক্ত করিয়া নূতন নূতন নাম প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বৃহন্নট্ হইতে নয় প্রকার নট্, মল্লার হইতে দ্বাদশ প্রকার মল্লার, কানাড়া হইতে অষ্টাদশ প্রকার কানাড়া, সারঙ্গ হইতে সপ্ত প্রকার সারঙ্গ ও টোড়ী হইতে দ্বাদশ প্রকার টোড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল রাগ-রাগিণীতে অষ্টবিধ রসের ব্যব-হার অনুভূত হয়। ভৈরবী, বিভাষ, আলাহিয়া, দেবগিরি, কুকুভা, যোগীঞা ও গান্ধার, ইহারা করুণ-রসাত্মক; সিন্ধুড়া, নট, মালব, শঙ্করা, পুরিয়া, বীর-রসাত্মক; কলিঙ্গড়া, পরজ, কেদারা, ললিত, খট্, সোহিনী এবং বাহার শৃঙ্গার-রসাত্মক, এবং ভৈরব, কল্যাণ, ভূপালী, শ্যাম, হাম্বীর, আড়ানা ও সাহানা হাস্য-রসাত্মক এবং মাঙ্গলিক কর্ম্মে গেয়। দীপক নামে একটী রাগ, প্রাচীনকালে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু এখন তাহার প্রচলন নাই। "তোপ্তেতেল্ হিন্দ্" নামক পারসীক সঙ্গীত-গ্রন্থ-মতে অধুনাতন পঞ্চম রাগই দীপকের স্থান অধিকার করিয়াছে।

প্রত্যেক রাগ-রাগিণী গান করিবার উপযুক্ত সময়ও সঙ্গীতশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। রামকেলী, ভৈরবী, যোগীঞার উপযুক্ত সময় দিবা একদণ্ড হইতে পাঁচ দণ্ড পর্য্যন্ত; ছয় দণ্ড হইতে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত বিভাস, বেলাবলী, পটমঞ্জরী ইত্যাদি; মধ্যাহ্নে সিন্ধু, টোড়ী, সারঙ্গ প্রভৃতি; অপরাহ্নে মুলতানী, পিলু, পুরিয়া, পুরবী ইত্যাদি; সন্ধ্যায় শ্রীরাগ, গৌরী প্রভৃতি; নিশার প্রথম প্রহরে হাম্বির, কেদারী, ছায়ানট, পুরিয়া, ভূপালী; নিশীথে কানাড়া, পরজ, খাম্বাজ ও বিহাগ প্রভৃতি; শেষ রাত্রিতে মালকোষ, হিন্দোল, সোহিনী এবং উষায় ললিত রাগিণী গান করিবার উপযুক্ত সময়।

পুরাণে উক্ত হইয়াছে, "মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত নৃত্য করিতে থাকেন, সেই সময় তাঁহার বামদেব, ঈশান, অঘোর ও তৎপুরুষ এই চতুর্মুখ হইতে যথাক্রমে চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক ও উদঘট্ট নামক চারিটী মার্গ তালের সৃষ্টি হয়। আবার ইহাও শাস্ত্রে কথিত আছে ;—

"তা, দিৎ, থু, ন্না, চতুঃশব্দা বিধিবক্ত্রাদ্বিনির্গতা।
হেরম্বেন গৃহীতা স্যুরুপদিষ্টা স্বয়ম্ভুবা॥"

অর্থাৎ—প্রথমে ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে তা, দিৎ, থু, ন্না, এইচারিটী তালের বোল বাহির হয়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গজানন মৃদঙ্গে তাহাই বাদন করিয়াছিলেন। এই চারি প্রকার তাল হইতে এক্ষণে চৌতাল, খট্‌তাল, ধামাল, কাওয়ালী, মধ্যমান প্রভৃতি নানা প্রকার তালের সৃষ্টি হইয়াছে। গীতের তাল দিবার সময় অনেকেই উভয়-করতলোৎপন্ন ধ্বনি ব্যবহার করিয়া থাকেন; বোধ হয় সেই জন্যই তল্‌ ধাতু অল্‌ প্রত্যয় করিয়া "তাল" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অনেকের এরূপই ধারণা আছে ; কিন্তু সঙ্গীতার্ণব-গ্রন্থকর্ত্তার মতে "তাণ্ডব" (অর্থাৎ পুংনৃত্য) শব্দের 'তা' এবং 'লাস্য' (অর্থাৎ স্ত্রীনৃত্য) শব্দের 'ল' লইয়াই "তাল" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যাহাই হউক, গীতের ছন্দানুযায়ী কাল বিভাগের নামই "তাল"। গীতের যে যতি, তাহাই "লয়" পদবাচ্য। "লয়ঃ প্রবৃত্তিনিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে"। গীতের সময় যেখানে তালের সংগতি হয়, তাহাকেই সম কহে।

"গীতোচ্চারণ-কালে তু যদা তালস্য সংগতিঃ।
তদা সম ইতি প্রোক্তঃ সমকাল সমুদ্ভবাৎ॥—সঙ্গীতার্ণবম্‌।

যাহাই হউক, তাল-মাত্রেরই লয় ও সম এই দুইটী সম্পত্তি আছে ; যেখান হইতে তাল আরম্ভ হয়, তাহাকেই "ফাঁক" বলে। অধিকাংশ স্থলেই এই তালের প্রারম্ভ বা ফাঁক হইতে গীত ধরিতে হয়।

বাদ্য যেমন গীতের অনুগামী, নৃত্য আবার সেইরূপ বাদ্যের অনুগামী। তালানুযায়ী হাব-ভাব-কটাক্ষাদির সহিত পাদবিক্ষেপ করাকেই "নৃত্য" বলে। দেব-সভায় অপ্সরীগণ নৃত্য করিয়া থাকেন। মর্ত্তে অধুনা বারাঙ্গনারাই সে স্থান অধিকার করিয়াছে।

সকল শাস্ত্রের ন্যায় সঙ্গীত-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগেরও উপাধি-প্রথা প্রচলিত ছিল। সঙ্গীত-শাস্ত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় ;—

নায়ক—মার্গ ও স্বদেশীয় সঙ্গীতে বিলক্ষণ পটু। গীত, বাদ্য, নৃত্য ও যন্ত্রাদি প্রকরণ শিক্ষা দিতে পারেন এবং অভিনয়বিৎ ও রসজ্ঞ ব্যক্তিকেও নায়ক বলে।

পণ্ডিত—কেবল গীতে সুনিপুণ।

গায়ক—গীত-নিপুণ অথচ অনুকরণ-ক্ষম, সুরসিক ও ভাবুক।

উপাধ্যায়—গীত, বাদ্য ও নৃত্য-প্রকরণ স্বয়ং জানেন এবং শিক্ষার্থীকে উত্তমরূপে শিখাইতে পারেন।

গন্ধর্ব্ব—সঙ্গীতে নিপুণ, কিন্তু সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাদৃশ জ্ঞান-সম্পন্ন নহেন।

গুণী বা গুণকার—কেবল স্বদেশীয় মতানুযায়ী সঙ্গীত জানেন।

কালাবৎ বা কালোয়াৎ—ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের গান করিতে জানেন, কিন্তু যন্ত্রাদিতে তাঁহাদের নিপুণতা থাকে না।

মার্দ্দঙ্গী—ধীর, মিষ্টভাষী, অথচ বাদ্যে সুনিপুণ। যাঁহার সুন্দর তাল-জ্ঞান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে মার্দ্দঙ্গী কহে।

উপসংহারে এদেশীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ গায়কের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

মিঞা তান্‌সেন—মোগল সম্রাট আকবরের সভায় প্রধান গায়ক ছিলেন *। কথিত আছে, ইনি রাগিণীর আলাপ করিয়া রাগিণী মূর্ত্তিমতী করিতে পারিতেন। ইনি হরিদাস স্বামীর শিষ্য। ইহাঁর সম্বন্ধে অনেকানেক অলৌকিক ঘটনার কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে, ইনি দীপক রাগিণী আলাপ করিতেছিলেন ; এই দীপক অগ্নিময়রূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করে, তাহাতেই তিনি পঞ্চত্ব পান।

রাজবাহাদুর—বাজখাঁই নামক সুরের প্রণেতা। ইনি রাজপুত্র ছিলেন। ইহার সহধর্ম্মিণী নৃত্যে সাতিশয় পটু ছিলেন। রাজবাহাদুর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হন।

* তাঁহার প্রকৃত নাম ত্রিলোচন দাস।—পুঃ-সং।

সুরদাস—আকবরের সম-সাময়িক। ইনি অতি সুকবি ছিলেন। সুরদাস-প্রণীত অনেক পদাবলী আছে। বারাণসীর নিকট শিবপুর গ্রামে ইহার সমাধি হয়।

মীরাবাই—আকবর বাদসাহের সময়ে তানসেন কর্ত্তৃক সম্রাট-সভায় আনীত হন; উদয়পুরের রাজার সহিত ইহার বিবাহ হয়। †

তুলসীদাস—ইহাঁর বিস্তর পদাবলী আছে। তাহাকে "দোঁহা" বলে। ইনি জাহাঙ্গীর বাদসাহের সম-সাময়িক। †

আমির খশরু—আলাউদ্দিন খিলিজীর সভার গায়ক ছিলেন। ইনি আমাদের ত্রিতন্ত্রী নামক যন্ত্র হইতে সেতার সৃষ্টি করেন।

গোপাল—এক জন প্রসিদ্ধ গায়ক। তিনি সঙ্গীতে সমস্ত ভারতবর্ষ পরাজয় করিয়া অবশেষে এই খশরু কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

জয়দেব—বীরভূম জেলায় কেঁন্দুলী গ্রামে ইহার জন্ম। ইনিই "গীত গোবিন্দ"-নামক সংস্কৃত-গীতি-কাব্য-প্রণেতা। গীত-গোবিন্দ আজিও সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। ইনি গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভায় পঞ্চরত্নের একজন ছিলেন। †

আজ কা'ল আমাদের দেশে কিয়ৎপরিমাণে সঙ্গীত-চর্চ্চা আরম্ভ হইতেছে। এই মহানগরীতে একটী সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই স্বর্গীয় বিদ্যার উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

---

† বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের" প্রথম ভাগে তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।—পুঃ-সং।

পত্র-স্তোত্র।

প্রবন্ধারম্ভে প্রথমেই হে পত্র! তোমায় ধন্যবাদ দিই। পরোপকার করিবার জন্য তুমি অবনীতে অবতীর্ণ; পরোপকার তোমার জীবনের প্রধান ব্রত। তুমি সর্ব্বময়, সর্ব্বত্র তোমার অপ্রতিহত গতি। জীবের ভাগ্যে সুখ-শান্তি বিধান করা তোমারই কার্য্য, তাই সকল জাতিই তোমার ভজনা করে, আর তুমিও সকলের মনস্কাম সিদ্ধ কর। তুমিই প্রাচীন কালে তরুত্বক্—বৃক্ষপত্র। তাই এখন তোমার সংজ্ঞা "পত্র"।

পত্র! তুমি বড় দয়ালু। অতএব হে দয়াময়! তোমার কৃপায় সকলে সংসারে সুখে কালাতিপাত করে। অর্থলাভের প্রত্যাশাপন্ন হইয়া প্রিয়তমা সতীর নিকট বিদায় লইয়া দূরদেশে যাহারা বাস করিতেছে, তুমিই তাহাদের সান্ত্বনা-স্থল। বিদেশবাসী পুত্রের সংবাদ দিয়া, তুমিই স্নেহময়ী জননীর চিন্তা দূর কর। বন্ধুর বিয়োগ-বিধুর হইয়া যখন লোকে কাতর হয়, তখন তুমিই তাহার সে ভাবনা নিবারণ করিতে পার। তোমার কৃপায় বহু যোজন দূরবর্ত্তী অপার-সাগর-পারে উপনীত বণিক্ বাণিজ্য করিতেছে, তোমারই অনুগ্রহে তাহাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

তোমারই অনুগ্রহে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা সীমন্তিনী নিঃশঙ্কে সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু ধারণ করিতে পায়। কর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ জীব, তোমারই কৃপায় হাস্য-বদনে দিনযাপন করে। তোমার এ অসাধারণ গুণ, এ মহান্ উপকার, এ অমানুষী দয়া, জগতে চিরকালই তোমার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। তোমার যশোভাতি, রবি-শশীর ন্যায় অনন্তকাল দীপ্তিমতী।

তুমি নাকি পত্র, তাই তোমায় জড় বলি। জড়ের সাধারণ গুণ, তোমাতে বর্ত্তমান। জড়ের আকর্ষণ-শক্তি তোমাতে মূর্ত্তিমতী। যাহার পরমাণু-পরিমাণ বেশী, তাহার আকর্ষণ-শক্তি তত বেশী। এ দিকে দেখি, যে পত্র যত বড়, মন আকর্ষণ করিবার শক্তি, তার তত অধিক। বিজ্ঞান-বলে দূরত্বের বর্গানুসারে মধ্যাকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এখানে দেখিতে পাই, প্রিয়তম, প্রিয়তমার যত দূরে,—তাহাদের আকর্ষণও তত বেশী। সাধারণ নিয়ম এখানে তোমাতে বিপরীত দেখি। জড় পদার্থের ঘাত-প্রতিঘাত আছে।

তোমারও ঘাত-প্রতিঘাত আছে! আঘাত-ব্যাঘাত, তোমাতে বেশীর ভাগ বরং। তুমি মানবের মনে আঘাত দাও। কার্য্য-গতিকে যথাসময় পঁহুছিতে না পারিলে, তোমা দ্বারা কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। এই তোমার ব্যাঘাত গুণ। ইহাকে তোমার গুণ, না দোষ বলিব? গুণ-পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম বলিতে পারি না কি? 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ অনেক। তবে এটা তোমার গুণ নয়—ধর্ম্ম নয়—স্বভাব। জড়ের গুণ, স্থানাবরোধকতা। তোমার গুণ, মনাবরোধকতা। তুমি মনাধিকার করিলে অন্য চিন্তা, অন্য কার্য্য—আমাদের মনে কি স্থান পায়? তুমি মন অবরোধ করিয়া আছ, তাই অনেক যুবকের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সরস্বতীকে ফিরিয়া যাইতে হয়। তুমি মন অধিকার কর বলিয়াই তো কত ললনাও ব্যঞ্জনে লবণ দিতে ভুলিয়া যায়।

তুমি পতি-বিরহ-কাতরা পতিমাত্র-শরণা ললনার আশাস্থল। তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তুমিই আবার পর-পুরুষাকাঙ্ক্ষিণী দুশ্চারিণী রমণীদিগের পর-পুরুষ সংযোগ করিয়া দিবার মূলাধার। তুমি কখন সদয়, কখন নির্দ্দয়। তোমার অন্ত বোঝা ভার। তোমার অন্ত বড়ই বড়—ভারি বোঝার মত বোঝা। তোমার গঠন-প্রণালীর ইতিহাস লিখিয়া জগতীতলে কেহ বা অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিল, আর কেহ বা আবার সেই প্রণালীর অনুকরণ করিতে অক্ষম হইয়া পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিয়া অধঃপাতে গেল।

উত্তরোত্তর তোমার গৌরব বর্দ্ধমান। বুঝি বা তোমার গৌরব-রবি কখনও অস্তাচল অবলম্বন করিবে না। কাজেই জগৎ, বিষাদ-তিমিরে আবৃত হইবে না। পূর্ব্বে রাজার নিকটে তোমার বড়ই মান ছিল। বাহকগণ তোমার গুরুত্ব বুঝিয়া তোমাকে শিরে ধরিয়া রাজন্য-নিকটে—অমাত্যসমীপে গমন করিত। এখন তোমার সে গৌরব নাই। তোমার পূর্ব্ব সম্মান না থাকুক, তুমি মানবের উপকারে বিরত নও। মানবের মত তুমি যশের খাতিরে, সম্মানের প্রত্যাশায় পরোপকার জন্য অবতীর্ণ হও নাই। তুমি নিষ্কাম-হিতব্রত, তুমি ধন্য। তুমি প্রত্যুপকার-প্রত্যাশী মানবকে নিষ্কাম কার্য্য করিতে শিক্ষা দাও।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কোম্পানীর জমিদারী।

পলাশীর রণাভিনয় শেষ হইল। ক্লাইভের সহিত সন্ধির সর্ত্তানুসারে মিরজাফর, বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন। নূতন নবাব ক্লাইভের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলী। ক্লাইভ্ই তাঁহাকে মস্নদে বসাইয়াছেন, আবার তিনিই ইচ্ছা করিলে পুনরায় তাঁহাকে পূর্ব্বাবস্থায় আনিতে পারেন, ইহা মুখে প্রকাশ না করিলেও, মনে মনে তিনি বিশেষ অনুভব করিতেন। অযোধ্যার নবাবের সহিত যুদ্ধে ক্লাইভ্, নবাবের যথেষ্ট সহায়তা করেন। ক্লাইভ্ যত দিন বাঙ্গলায় ছিলেন, তত দিন মিরজাফরের কোন বিপদ হয় নাই।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ্ বাঙ্গালা ত্যাগ করেন। তাঁহার পরে যাঁহারা মীরজাফরের সহিত জুটিলেন, তাঁহারা সকলে কোম্পানীর স্বার্থে এক প্রকার উদাসীন ছিলেন। বিশেষতঃ মীরজাফরের সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনরূপ সমানুভূতি ছিল না। অগত্যা কোন উপায় না পাইয়া "প্রজাবর্গ তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট, রাজ্যমধ্যে প্রজা-বিদ্রোহ বাড়িতেছে, রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে" এই সমস্ত ধুয়া ধরিয়া তাঁহারা বৃদ্ধ নবাবকে পদচ্যুত করিয়া তদীয় জামাতা কাশেম আলিখাঁকে তৎপদে উন্নীত করিলেন।

কাশেম আলি মস্নদে বসিয়া, সন্ধির সর্ত্তানুসারে, কুড়ি লক্ষ টাকা এবং বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের জমিদারীগুলি ইংরাজ কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। কাশেম আলি জমিদারানুরাগী ছিলেন—তাঁহার অনুরোধে কোম্পানী উল্লিখিত প্রাপ্ত সম্পত্তির সাবেক জমিদারদিগকে বাহাল রাখিলেন।

দিল্লী-সরকারের সনন্দ না লইয়া মস্নদে বসিয়াছেন, এই সূত্র ধরিয়া, তৎকালীন দিল্লীর বাদসাহ, কাশেম আলি খাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ইংরাজের সহায়তায় নবাব সেই যুদ্ধে জয়ী হন এবং দিল্লীর বাদসাহ বাৎসরিক

২৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা ত্যাগ করেন এবং কাশেম আলি খাঁকে এই সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা স্বীকার করেন।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে, বর্দ্ধমান ও বীরভূমের জমীদারেরা নবাবের ক্ষমতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, স্বয়ং দিল্লীশ্বর সেই জমীদারদিগকে মীরকাশেমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান তখন ইংরাজের সম্পত্তি। সম্পত্তি-রক্ষার জন্য এবং অন্য পক্ষে নবাবের ক্ষমতা অক্ষত করিবার জন্য, ইংরাজ কোম্পানী মেজর ইয়র্ক নামক জনৈক সেনানীকে নবাবের সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন। মীরকাশেম ইহার সহায়তায় দুই জন জমীদারকেই বশ্যতা স্বীকার করাইতে সমর্থ হন। কাশেম আলির সহিত কলিকাতা কৌন্সিলের বড় বেশী দিন বনিল না। কাশেম আলি, মীরজাফর নহেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উগ্রপ্রকৃতি ও স্বাধীনচেতা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইংরাজেরা তখন বড় বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। তখন, বড় হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী সাহেবেরা পর্য্যন্ত দেশ জুড়িয়া বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা অনেক বিষয়ে একচেটিয়া স্বত্ব লাভ করিয়া বড়ই যথেচ্ছাচার করিতেছিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁহাদের শুল্ক দিতে হইত না। তাঁহাদের অপেক্ষা আবার তাঁহাদের অধীনস্থ এ দেশীয় কর্ম্মচারীরা সাধারণ প্রজার উপর আরও অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রজাগণ বাণিজ্য দ্রব্য অপর কাহাকেও বিক্রয় করিতে গেলে, তাঁহারা জোর-জবরদস্তি করিয়া তাহাদিগকে আটক করিতেন। প্রকৃত এবং উপযুক্ত মূল্যের পরিবর্ত্তে নিজেদের ইচ্ছামত মূল্য দিয়া সুবিধা দরে সমস্ত জিনিস পত্র কিনিয়া লইতেন। পঙ্গপালের ন্যায় তাঁহারা এবং তাঁহাদের নিয়োগকর্ত্তা ইংরাজ প্রভুরা, দেশের অবাধ বাণিজ্যের আশা নিঃসার করিয়া ফেলিতেছিলেন। এই সকল বিশেষ অত্যাচার, কাশেম আলির চক্ষে অসহ্য হইল। ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহার সহিত কলিকাতা কৌন্সিলের বিবাদ বাধিয়া উঠিল। কি কি কারণে এই বিবাদ বিশেষ পরিপক্ক ভাব ধারণ করে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক ! ইতিহাসে তাহা বিশদরূপে দেখিতে পাইবেন।

কাশেম আলি খাঁর সহিত ইংরাজের বিবাদের শেষ পরিণাম "পাটনার

হত্যাকাণ্ড"। ইতিহাস-পাঠকদের নিকট ইহার ভীষণ পরিণাম অবিদিত নাই। এই হত্যাকাণ্ড সমাধা করিয়া, কাশেম আলি খাঁ—বাঙ্গালার শেষ মুসলমান নবাব—বাঙ্গালা ছাড়িয়া অযোধ্যায় পালাইলেন। কলিকাতা কৌন্সিল আবার মীরজাফারকে মসনদে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার সহিত, একচেটিয়া-বাণিজ্য-সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধাকর বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ক্রীড়া-পুত্তলীরূপে সিংহাসনে বসাইলেন। নূতন সন্ধির দ্বিতীয় ধারার সর্ত্তানুসারে মীরজাফর, কলিকাতা কৌন্সিলের হাতে, ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্ব-প্রদত্ত চাকলেগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন। এবারে যে, ইংরাজ কোম্পানী এই নূতন সন্ধিতে বিশেষ কোন স্বত্ব লাভ করিলেন, তাহা নহে। মীর-কাশেমের আমলের সমস্ত স্বত্বই আবার নূতনরূপে জঁাকাইয়া লইলেন। *

মীরকাশেম যে সময়ে অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দোলার দরবারে উপস্থিত হন, ঠিক সেই সময়ে দিল্লীর ক্ষীণপ্রতাপ বাদসাহ, দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইয়া সুজার নিকট আশ্রয় লন। সুজা উদ্দৌলাকে তিনি, মোগল সাম্রাজ্যের "শ্রেষ্ঠ উজীর" উপাধিতে সম্মানিত করিয়া পরিতুষ্ট করেন। সুজা উদ্দোলা, মীরকাশেমের সহায়তা-করণার্থে অসংখ্য বাহিনী লইয়া বক্সারে উপস্থিত হন। তিনি, বর্ষাকাল সমাগম দেখিয়া ঐ স্থানে শিবির সমাবেশ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মেজর মন্‌রো, ইংরাজ বাহিনী লইয়া গিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের সহিত কাশেম আলির আশা-ভরসা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হয়।

মীরজাফর আলি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহলোক হইতে অপসৃত হন। কলি-কাতা কৌন্সিল—দশ লক্ষ টাকা লইয়া তাঁহার জারজ-পুত্র নাজিম উদ্দৌলাকে বাঙ্গালার সিংহাসন বিক্রয় করেন।

নাজিম উদ্দৌলার সহিত আবার নূতন সন্ধি হইল। এই সন্ধির সর্ত্তে তাঁহারা আবার বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম চাকলের বন্দোবস্ত, সৈন্য ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য পাকা করিয়া লইলেন। প্রতি নবাব-পরিবর্ত্তনেই এই

---

* Treaties and Grants &c—p. 114.

† Marshman's India—p. 305 and James' British in India—p. 42.

স্বত্বগুলি পাকা করিয়া লওয়া হইত। ইহা ব্যতীত, রাজ্যশাসনের সুশৃঙ্খলার্থে তাঁহারা নবাবকে বাধ্য করিয়া তাঁহার এক জন সহকারী শাসনকর্ত্তার পদ সৃষ্টি করাইলেন। এই স্বত্বে সুপ্রসিদ্ধ মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম "নায়েব সুবা" বা সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতা কৌন্সিলের সম্মতি ব্যতীত ইহাকে পদচ্যুত বা স্থানান্তরিত করা যাইবে না, এ কথাটাও এই সঙ্গে স্থির করিয়া লওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে, অনেক নূতনবিধ স্বত্ব কলিকাতা কৌন্সিল, নূতন নবাবের নিকট হইতে পাকা করিয়া লইলেন। দেশের মধ্যে প্রজাগণের উপর ইংরাজের অত্যাচার-স্রোত এই সময়ে পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল।*

বাঙ্গালায়, একচেটিয়া ও শুল্ক-রহিত গুপ্ত বাণিজ্যে ও সন্ধি-সম্বন্ধে নানাবিধ অযথা স্বত্ব লাভে, পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এবং কলিকাতা কৌন্সিল, প্রজাবর্গের উপর কিরূপ ভীষণ অত্যাচার ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কিরূপে নিজেদের উদর পরিপূর্ণ করিতেছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে ডাইরেক্টরদের নিকট পহুঁছিল। তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবশেষে ক্লাইভ্‌কে বাঙ্গালায় পুনঃপ্রেরণ করিলেন। এখন ক্লাইভ্ সুধু "ক্লাইভ্" নহেন, তিনি "লর্ড" শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ক্লাইভ্ সাহেব, বাঙ্গালায় উপস্থিত হন। তাঁহার পুনরাগমনে সকল কর্ম্মচারীর মনে এক ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হইল। ক্লাইভ্ আসিয়া প্রকৃত অবস্থা দেখিলেন এবং সমস্ত সিভিল ও সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য সম্বন্ধে নূতন পরিবর্ত্তন ও সংস্করণ করিয়া অরাজকতা ও অত্যাচারের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন।

ক্লাইভ্, বেনারসে গিয়া অযোধ্যার নবাব উজীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধি করিলেন। সাহ আলম্‌কে বাৎসরিক সার্দ্ধ দুই কোটী টাকা রাজস্ব-প্রদানের বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট করিলেন। তাঁহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাটরূপে স্বীকার করিয়া বিশেষ কৌশলের ও বুদ্ধিমত্তার সহিত

* Treaties & Grants &c—p. 127.

কতকগুলি ফারমান্ বাহির করিয়া লইলেন। এই ফারমনের স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলেন। *

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে মহাপার্থক্য। জীবন সচল—মৃত্যু অচল, জীবন গতিময়, মৃত্যু নিশ্চেষ্টতাময়। জীবন উদয়; মৃত্যু অস্ত। জীবন মহাকার্য্য—মৃত্যু—বিশ্রাম। জন্মিলেই সঙ্গে সব জন্মে, মরিলেই সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরাইয়া যায়; তথাপি মরিলেও মানবের নিস্তার নাই। তাহার প্রাণহীন মেদ-মাংস অস্থি শোণিতময় দেহের উপর তখনও মানবের কার্য্য থাকে। সে কার্য্য সমাধি বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। মহাগতিশীল জীবন, অন্ত্যেষ্টির কক্ষে পড়িলেই কার্য্যহীনতার মহাগর্ত্তে বিলীন হয়।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মূলে "ধর্ম্ম" এই কথাটা না থাকিলেও, ইহা একটী সামাজিক আচরণ। দেশ-ভেদে, কাল-ভেদে, সমাজ-ভেদে, বর্ণ-ভেদে, জাতি-ভেদে ও জ্ঞানি ভেদে জগতে সকল জাতের মধ্যে এই প্রকার একাবস্থা দেখা

---

* James' British in India.—p. 45.

যে দরবারে ক্লাইভ্‌কে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী দেওয়া হয়, সেই দরবার সম্বন্ধে একটী রহস্যময় ঘটনার উল্লেখ আছে। পূর্ব্বতন মোগল বাদসাহগণের যে প্রকার ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমক ছিল, সাহ আলমের সময় তাহা অনেক কমিয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ সাহ আলম যখন বেনারসে, তাঁহার সঙ্গে সিংহাসনাদি রাজচিহ্ন কিছুই ছিল না। একটী খানা খাইবার টেবিলকে (dining table) বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, সেই সময়ের মত, সিংহাসনের কার্য্য সারিয়া লওয়া হয়। ক্লাইভ্ এই ক্ষমতাহীন বাদসাহের প্রতি পদোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া কৌশলে কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইলেন।

যায় না। প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক পর্য্যন্ত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সকল দেশে না হউক, অন্ততঃ অনেক স্থলে যে হইয়াছে, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

জগতের প্রাচীন সমাজের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কি প্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার আলোচনায় অনেক অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার হইয়া পড়ে। উদাহরণ-স্বরূপ সর্ব্ব-প্রথমে আমরা প্রাচীন মিশরীয়দিগের তৎকাল-প্রচলিত প্রথার বৃত্তান্ত প্রদান করিব। ভবিষ্যতে অন্যান্য জাতিদিগের এই প্রথার সম্বন্ধে বলা যাইবে।

প্রাচীন ইজিপ্তের বা মিশরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনেক চিহ্ন, প্রকৃতির সহিত অনেক যুঝিয়া আজও অটলভাবে দণ্ডায়মান। যাঁহারা প্রাচীন মিশরীয় পিরামিডগুলির তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, জগতের প্রাচীন আধুনিক কোন জাতিই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় এ প্রকার বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিয়া যাইতে পারে নাই। প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে একটী প্রথার প্রচলন ছিল—তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, অবশিষ্টেরা সেই বাড়ী ছাড়িয়া, নূন্যাধিক দুই মাস কাল ধরিয়া স্থানান্তরে থাকিত। মৃতদেহের রক্ষাভার একপ্রকার কার্য্যকারী দাস-সম্প্রদায়ের হস্তে পড়িত। পরিত্যক্ত দেহ—এই ভৃত্যের হস্তে পড়িলে সে কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমশও তাহার রক্ষণোপযোগী অনেক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। তাহার প্রথম কার্য্য, এই দেহটীকে সম্পূর্ণ-রূপে অন্ত্রাদিহীন করিয়া তাহা বিকৃত হইবার বা পচিবার পথ বন্ধ করা। একখানি সূচ্যগ্র প্রস্তর-খণ্ড ধীরে ধীরে সেই শব-দেহের উদরের উপর রাখিয়া, অল্প শক্তি প্রয়োগ করিলেই, তাহাতে একটী রন্ধ্র বিস্তারিত করিয়া তাহার মধ্যস্থ অন্ত্রাদি বাহির করিয়া লওয়া হয়। নাসিকা-গহ্বর-মধ্য হইতে এক প্রকার অস্ত্র দ্বারা মস্তিষ্ক প্রভৃতি বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই প্রকারে, অন্ত্র-উদ্ধার ও মস্তিষ্ক-নিষ্কাষণের পরে উদরের ও মস্তিষ্কের গহ্বর মধ্যে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য, ও তীব্র-গন্ধ মসলাদি প্রয়োগ করা হয়।

উল্লিখিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য এক জন ক্রীতদাস নিযুক্ত হয়। আবার অনেক স্থলে এক শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট লোক আছে, যাহারা এই কার্য্য

দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। যে ব্যক্তি এই সমস্ত কার্য্য করে, সে মিশরীয়দের নিকটে অপাংক্তেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যখন এই প্রকারে শবোদর ছেদ হইয়া থাকে, তখন মৃতদেহীর আত্মীয়েরা, এই কার্য্য তাহাদের চক্ষের উপর পড়িলে, তখনই ক্রীতদাসকে প্রহার করিবার চেষ্টা করে; কার্য্যকারকের উপর সমান ভক্তি প্রদর্শন করে, অথচ কার্য্য সময়ে শবচ্ছেদ করিতে দেখিলে, তাহাকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করে, ইহা এক অদ্ভুত সংস্কার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্ত্র উদ্ধার করিবার পর, উদরের মধ্যে নানাজাতীয় মসলা ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে, গঁদে সিক্ত, এক থানি কাপড় শবদেহে উত্তমরূপ আচ্ছাদন করিয়া আত্মীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করে। পরে একটী কাষ্ঠময় শবাধারে সেই শবদেহ রক্ষা করিয়া, গৃহমধ্যে কোন কোলঙ্গায়, দাঁড় করাইয়া রাখে। মৃত ব্যক্তির শবদেহ, মিশরীয়দের পক্ষে অতি পবিত্র জিনিষ। মৃত ব্যক্তির সহিত, পরিবার-বর্গের সম্পর্কানুসারে, তাহার প্রতি তদনুচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখান হয়।

তারপর মৃত ব্যক্তির দোষ গুণের বিচার। সে বিচার এক অদ্ভুত প্রকারের। সে ব্যক্তি জীবনে ভাল মন্দ যাহা কিছু করিয়াছে, এক শ্রেণীর বিচারক আছেন, তাহাদের দ্বারাই তাহারা বিচারিত হইয়া থাকে।

মিশরে অনেক হ্রদ আছে। বিচারকগণ, হ্রদের বিপরীতদিকে এক থানি নৌকায় করিয়া গমন করেন। বিচারকের পর-পারে মিলিত হইলে, মৃত ব্যক্তির যে যে দোষ গুণ আছে, তাহার প্রতিবাসীরা তাহার সমালোচনা করিয়া থাকে। এই সমালোচনার মুখে যে সকল মৃত ব্যক্তি উত্তীর্ণ হইয়া যান, তাঁহারাই চির সম্মান লাভ করেন। অন্যান্য বা সাধারণের সমীপে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির এই প্রকার চরিত্র সমালোচনার এক বিশেষ ফল আছে। সেই ফল এই যে, ভবিষ্যতে তাহারই দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্য লোকে বিশুদ্ধ ও পবিত্রভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত হয়। এই প্রকার বিচার-প্রথা হইতে—রাজাদিগেরও নিস্তার নাই। তাঁহারাও সাধারণ প্রজাদের ন্যায় এই সমালোচনার ভয়ে অস্থির হইয়া পড়েন।

পূর্ব্বে যে প্রকার উপায়ে, অন্ত্রচ্ছেদ ও মস্তিষ্ক উত্তোলন-প্রথায় অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে—তাহার খরচ পত্রও বড় কম নহে। এক এক সময়ে, এই কার্য্যের জন্য সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া থাকে। ধনী লোকের মৃত-দেহ পরিষ্কার-করণ কার্য্যে সময়ে সময়ে ১০।১২ জন লোকে ক্রমাগত পরি-শ্রম করিয়া থাকে।

এই সমস্ত মৃতদেহ, তাহার আত্মীয়গণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ানুসারে গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে, অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া থাকে। মিশরে যে সমস্ত প্রকাণ্ড পিরামিড আজিও বর্ত্তমান, তাহার নিম্নে কত লোক রাজগণের শব-দেহ চির বিশ্রাম লাভ করিতেছে, তাহা বলা দুরূহ।

শ্রীনৃত্যহরি মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

১। একটি চিত্র—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। এখানি এক-খানি ক্ষুদ্র গল্প-পুস্তক। পুস্তকের আকার অতিশয় ক্ষুদ্র (৮ আট পৃষ্ঠা পরি-মিত) হইলেও, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। গল্পের সারাংশ ভাগ এই :—"একজন মদ্যপায়ীর পূর্ব্বে ধন সম্পত্তি ছিল ; কিন্তু সুরার মোহিনী মায়ায়, অল্পদিনের মধ্যেই তাহা অপব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল। যখন তাহার অত্যন্ত দুরবস্থা, তখনও তাহার চৈতন্য হয় নাই। তাহার স্ত্রী, পুত্র অন্ন বিনা নিরাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তথাপি তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে সচ্ছন্দ মনে একজন ধনীর পারিষদরূপে অহোরাত্র মদ্যপানে মাতোয়ারা। একদিন তাহার শিশু পুত্র-কন্যাগুলিন অনাহারে ছট ফট করিতেছে—তাহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন

সময়ে একজন ভিখারিণী ভিক্ষা লইতে আসিয়া, তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া, ভিক্ষালব্ধ চাউলগুলি তাহাদিগকে দিয়া চলিয়া গেল। দশ বৎসর বয়স্ক বালক অনিল, পিতার বিষম অত্যাচার ও আপনাদের অনাহারে দারুণ ক্লেশ এবং শেষে ভিখারিণীর অন্নে জীবন ধারণ পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়া, মাতার নিষেধ সত্বেও, একাকী পারিষদবর্গ-পরিবেষ্টিত সেই ধনী মদ্যপায়ীর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় পিতাকে কত অনুনয় বিনয় করিল—শেষে বলিল "বাবা! তবে কি আমরা না খেয়ে মর্‌বো?" শিশুপুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়াও সেই মদ্যপায়ী পিতার পাষাণ চিত্তে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। বরং নিজের দুরবস্থার কথা পাঁচ জনের কাছে, তাঁহার নিজ পুত্র দ্বারা প্রকাশিত হওয়াতে, কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া নির্ম্মম হৃদয়ে, তাহার বক্ষঃস্থলে কঠোর পদাঘাত করিল। আঘাত গুরুতর; বালকের তাহা সহ্য হওয়া সম্ভব নহে তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল। তার পর সেই জমিদার বাবু, বালককে একটী টাকা দিয়া বাটী পাঠাইয়া দিলেন। বালকের নাম অনিল। মাতার নাম অশোকা। অনিল, বাটীতে আসিয়া মার কোলে শুইয়া, দুই একবার "মা মা" বলিতে বলিতে সকলের মায়া কাটাইয়া স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিল। অভাগিনী অশোকাও মৃত পুত্রের মুখখানি দেখিতে দেখিতে ধরাধাম ত্যাগ করিল।"

পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বড় মধুর—বড় মর্ম্মস্পর্শী! এত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে এমন মধুর গল্প পাঠ করিয়াছি, এমন গল্প আমাদের স্মরণ নাই। তবে এ কথা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, দস্যু পিতা হইলেও ঔরসজাত দশবর্ষমাত্র বয়স্ক পুত্রের বক্ষে এরূপ ভাবে পদাঘাত করিয়া, তাহার মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হওয়াতেও, সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না—এ আশ্চর্য্য কথা কি না? আর এক কথা অশোকার মৃত্যু, নিখুঁত স্বাভাবিক কি না। এই দুইটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, "একটী চিত্র" যথার্থই বিষম মর্ম্মভেদী গল্প এবং ইহা পাঠ করিয়া আমাদের আশা হয়—গ্রন্থকার, যদি এইরূপ ছোট গল্প একটু বড় করিয়া লেখেন, তাহা হইলে আরও অধিক ক্ষমতা দেখাইতে পারেন। ভাষায় সামান্য সামান্য ত্রুটি শোধিত হয়—ইহা আমরা ইচ্ছা করি।

২। "দুই ভাই"—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। গ্রন্থকার এই পুস্তকখানির "আর একটী চিত্র" নাম দিলে ভাল করিতেন। তাঁহার "একটী চিত্র" অতি মনোহর গল্প, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। "দুই ভাই" তদপেক্ষা উত্তম না হইলেও, মন্দ নহে। সবিতা ও সুপ্রভাতের বাল্যকালের চিত্র নিখুঁত প্রশংসাযোগ্য। দুই ভ্রাতার চরিত্রের ক্রম-বিকাশ বেশ সুখপাঠ্য ও মনোরম। কিন্তু দুই ভ্রাতার বিচ্ছেদ মনোমুগ্ধকর ও স্বাভাবিক নহে। যদিও সমাজে এরূপ চিত্র বিরল নহে; তথাপি গ্রন্থকারের বর্ণনায় বিচ্ছেদ ঘটনাটা যেন কিছু তাড়াতাড়ি বলিয়া বিবেচিত হয়। পুস্তকখানি বাড়াইয়া লিখিলে, বোধ হয় এ দোষ থাকিত না। আমাদের বিশ্বাস, গল্পাংশে এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিও, শ্রেষ্ঠ না হইলেও, উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য। দুই ভ্রাতার দুই স্ত্রীর চরিত্র, একেবারেই ফোটে নাই—সুতরাং কতকটা অঙ্গহীন বলিয়া বোধ হয়। আবার সুদীর্ঘ করিয়া লিখিতে গেলে, হয়তো সুপ্রসিদ্ধ "স্বর্ণলতার" ছায়া আসিয়া পড়িত। যাহাহউক, ২৪ পাতার এ ক্ষুদ্র গল্পটী পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

৩। বীণাপাণি—মাসিক পত্রিকা। প্রথম হইতে পঞ্চম সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। এই পাঁচ সংখ্যাতেই বেশ সুন্দর সুখপাঠ্য প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকার আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহার উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র নহে। "বীণাপাণিতে" বীণাপাণির বরপুত্র, দুই একজন কৃতী লেখকের নামও দেখিতেছি এবং তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ গুলিও "বীণাপাণির" উন্নতিকল্পে অনেক সহায়তা করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, ইহার দৈনন্দিন উন্নতি হউক।

৪। "প্রেমের পরীক্ষা"—(একাঙ্ক গদ্য-নাট্য) শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু এম,এ, প্রণীত। প্রথমে অনুরাগী, তার পর বিরাগী, তার পর পুনরনুরাগী, এইরূপ একব্যক্তির একটী চিত্র গ্রন্থকার অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—"একজন যুবক সুহৃদ্, গ্রন্থকারের নিকট নিজ জীবনের যে রহস্য বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র "মনোড্রামা" বিরচিত হইল।" পুস্তক খানির ভাষা সরল ও নূতন ছাঁচে ঢালা। চন্দ্রশেখর বাবুর "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" এত দিন যে উচ্ছ্বাসময়ী ভাষার গৌরবে সকলের

নিকট আদৃত হইত, আমাদিগের বিশ্বাস, বর্ত্তমান গ্রন্থকারের ভাষা, যেন তাঁহা অপেক্ষাও নবীনা অথচ ভাবময়ী। গদ্যে লিখিত বটে, পুস্তকখানি কিন্তু বরাবরই পদ্য। ইহার "প্রথমাংশ" হইতে "তৃতীয়াংশের" শেষ পঙ্‌ক্তিটী পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র বাঁধাইয়া রাখিলে, প্রত্যেক নব বিবাহিত যুবক দশ দশ মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়া নিজ প্রণয়িণীকে উপহার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। সকলের জীবন নাটকে "প্রেমের পরীক্ষা" এতদূর গড়ায় না। সকলেই তো আর বৈজ্ঞনিক বা দার্শনিক নহে; সুতরাং তাঁহাদিগের "প্রেমের পরীক্ষা" তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত অবিবাদে চলিতে পারে—আমরাও তাহা অনুমোদন করি। তার পরের কথায়, অর্থাৎ "চতুর্থাংশ" হইতে "ষষ্ঠাংশ" পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরমহংসের শিষ্যগণের হস্তে দিলে, তাঁহারা অতি সানন্দচিত্তে ইহা গ্রহণ করিবেন।

গ্রন্থকার এই পুস্তক খানিতে সুললিত ভাষার ছটা যাহা দেখাইয়াছেন, আমরা সানন্দান্তঃকরণে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, তাহা এক প্রকার নূতন সৃষ্টি বটে। কচিৎ অতি অকিঞ্চিৎকর ভ্রম, আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। নিত্যকৃষ্ণ বাবুর লেখনী সাধারণতঃ উদ্দাম-গতি। সে লেখনী কোন বাধা বিপত্তি মানে না। তবে স্থানে স্থানে তিনি যেন নিজের ভাব সংযত করিয়াছেন বোধ হয়।

এতদিনে বোধ হয় গ্রন্থকারের বৈরাগ্যের ঘোর কাটিয়াছে। এইরূপ তেজস্বিনী রসময়ী ভাষায় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতে ক্ষতি কি? বাঙ্গালীর কোমল প্রাণে এ ক্রন্দনের রাগিণীগুলো মিঠে হইলেও, কড়া লাগে। গ্রন্থকারকে সুহৃদ্ মনে করি। সুহৃদ্বর গ্রন্থকার, বর্ত্তমান সমালোচকের এ অনুরোধ প্রতিপালনে অগ্রসর না পশ্চাদপদ হইবেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা রহিল।

৫। চিত্রদ্বয়—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত প্রণীত।—"হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ" ও "ভ্রাতৃদ্বয়" নামক দুইটী পদ্য এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গ্রন্থকার রাজস্থানের ইতিহাস পাঠে এই ক্ষুদ্র পত্তিকা খানি রচনা করিয়াছেন। যেরূপ বিষয়, তাহাতে ভাল না হইবার কোন কারণ নাই। তবে বালকের লেখায় এরূপ সতেজ ভাষার বাঁধুনি ও ছন্দোবন্ধ

দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। আশা করি, শুভাশীর্ব্বাদ করি, গ্রন্থকার ভবিষ্যতে একজন উচ্চশ্রেণীর কাব্যকার হইবেন।

৬। রাবণবধ কাব্য—শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর-বিরচিত। মেঘনাদ বধ কাব্যের পরবর্ত্তী ঘটনাবলম্বনে এই পুস্তকখানি লিখিত। গ্রন্থকার, পুস্তকখানিতে বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার শব্দ-যোজনা করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। স্থানে স্থানে এত দুরূহ ও দুর্ব্বোধ যে কষ্টে ভাব সংগ্রহ করিতে হয়। পুস্তকখানি বাঙ্গালায় না লিখিয়া, যদি সংস্কৃতে লিখিতে হইত, তাহা হইলে, ইহার অধিকতর সম্মান বর্দ্ধিত হইত। যাহাই হউক, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক আজি কাল বড়ই বিরল। ছন্দোবন্ধ প্রায় একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আজ-কালের কবিগণ, ছন্দের দিকে আর বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না। সুতরাং ছন্দোবন্ধ-পরিপূর্ণ "রাবণবধ-কাব্য"খানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

৭। প্রদীপ—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। আমরা এ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। বারান্তরে ইহার সবিস্তার সমালোচনা করিব।

পুরোহিত

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ }	১৩০০ সাল, চৈত্র।	{ পঞ্চম সংখ্যা।

ওঁ

তারা মা।

(বলিদানম্)
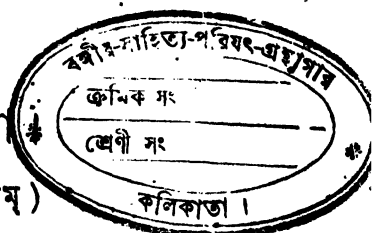
ভূতেন্দ্রিয়াখ্যাঃ পশবোঽত্র দেহে
যজ্ঞায় নূনং বিহিতা বিধাত্রা।
পূজামখে তান্ জগদম্বিকায়াঃ
তৎপ্রীতিকামোঽদ্য বলিং দদানি ॥ ১ ॥

জগদ্ধাত্রী, মানবদেহস্থ পঞ্চ-ভূত-রূপী ও একাদশ-ইন্দ্রিয়-রূপী পশুগণকে যজ্ঞের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। আজি জগদম্বার পূজা—মহাযজ্ঞ। অতএব, তাঁহারই প্রীতিকামনায় উহাদিগকে বলিদান করিতেছি। ১।

সর্ব্বভূতেশ্বরী ত্বং হি সর্ব্বভূতাভয়প্রদা।
'রক্ষ মাং নিজভূতেভ্যো বলিং ভুঙ্ক্ষ্ব নমোঽস্তু তে' ॥২॥

তারা মা! তুমিই সর্ব্বভূতের অধীশ্বরী, সমস্ত ভূত হইতে তুমিই অভয় দান করিয়া থাক; এই সকল ভূত হইতে আমাকে রক্ষা কর; তুমি এই বলি উপভোগ কর; তোমাকে নমস্কার। ২।

যথা সমুদ্রং সমবাপ্য নদ্যঃ
প্রশান্তকল্লোলরয়া ভবন্তি।
ভূতেন্দ্রিয়াণ্যেত্য তথেশ্বরি! ত্বাং
বিকারমুক্তানি ভজন্তু শান্তিম্ ॥ ৩ ॥

যেমন মহাসাগরে মিলিত হইলে, নদীগণ, তরঙ্গ ও কোলাহল হইতে মুক্ত হয়, তেমনই, হে সর্ব্বেশ্বরি! তোমাতে মিলিত হইয়া আমার পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, (জন্ম, জরা, মরণ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি) বিকার হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত শান্তি লাভ করুক। ৩।

(ইতি ভূতবলিঃ)

দেবি! মাহিষরক্তেন প্রীয়সে জগদম্বিকে!।
প্রদদানি বলিং তুভ্যং মে মোহমহিষাসুরম্ ॥ ৪ ॥

মা জগদম্বা! তুমি মহিষের রক্ত পাইলে বড়ই তুষ্ট হও; তাই আমার মোহরূপী মহিষকে ছেদন করিয়া তোমার পদে বলিদান করিলাম। ৪।

(ইতি মহিষবলিঃ)

দেহাভিমাননিগড়েন দৃঢ়ং নিবদ্ধঃ
ত্রাহীতি রৌতি করুণং মম জীব আত্মা।
তস্মাদ্য বন্ধনদশাক্ষয়মুক্তিকামঃ
তং তারিণীপদতলে বলিমর্পয়ামি ॥ ৫ ॥

এই ভৌতিক দেহে অভিমানরূপ* সুদৃঢ় পাশে নিবদ্ধ হইয়া আমার জীবাত্মা কাতর স্বরে 'পরিত্রাহি' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। আজি সেই জীবাত্মার বন্ধনদশা হইতে অক্ষয়-মুক্তি-কামনায় তাহাকে তারা মার চরণে বলিদান করিলাম। ৫।

* 'অভিমান'—অহং-বুদ্ধি, অর্থাৎ দেহে 'আমি' এই জ্ঞান।

যজ্ঞেশ্বরীযজ্ঞবলিপ্রদানাৎ
মুক্তোঽস্তু জীবো ভবদুঃখবন্ধাৎ।
পশুস্বভাবং পরিহৃত্য সদ্যঃ
শিবত্বমানন্দময়ং প্রয়াতু ॥ ৬ ॥

যজ্ঞেশ্বরীর যজ্ঞে জীবাত্মাকে বলিদান করায়, জীবাত্মা ভবদুঃখরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হউক, এবং পশুভাব পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দময় শিবভাব লাভ করুক। ৬।

(ইতি জীববলিঃ)

(যজ্ঞে প্রাণিহিংসানিষেধঃ)

বিশ্বৈকমাতা করুণাময়ী সা
সর্ব্বে সুতা এব বয়ং তদীয়াঃ।
মা জীবহিংসাং কুরু দেবযজ্ঞে
মাতা প্রসীদেৎ সুতঘাতকে কিম্ ॥ ৭ ॥

করুণাময়ী তারা মা সর্ব্বজীবের একমাত্র জননী; আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান। সেই বিশ্বজননীর পূজায় কেহ জীবহিংসা করিও না। মা কি পুত্রহন্তার উপর প্রসন্ন হন ? ৭।

সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং বসন্ত্যৈ
ভূতেন্দ্রিয়াণামধিদেবতায়ৈ।
তৎপ্রীতয়ে মানব! তদ্গতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়গ্রামবলিং প্রযচ্ছ ॥ ৮ ॥

হে মানব! যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে বাস করিতেছেন, যিনি সমস্ত ভূত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহারই প্রীতিকামনায় তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহারই চরণে তোমার পঞ্চ ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলকে বলিদান কর। ৮।

উদ্দামকামাদিপশূন্ নিহত্য
জ্ঞানাসিনা দেহি পদে ভবান্যাঃ।
দয়াময়ীযজ্ঞমতীবপুণ্যং
কলঙ্কিতং মা কুরু শোণিতেন॥ ৯॥

জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা দুরন্ত কামাদি পশুকে ছেদন করিয়া ভবানীর পদে অর্পণ কর। সেই দয়াময়ীর পূজার ন্যায় পবিত্র যজ্ঞ আর নাই; সে যজ্ঞ জীবহিংসার রক্তে কলঙ্কিত করিও না। ৯।

দেব্যাঃ পুরস্তাৎ কৃতজীবহত্যাঃ
কাঙ্ক্ষন্তি কল্যাণকরীং গতিং যে।
সুধাভ্রমাৎ তে গরলং পিবন্তঃ।
স্বমেব মৃত্যুং স্বয়মাহ্বয়ন্তি॥ ১০॥

যে ব্যক্তি দেবতার পূজায় জীবহত্যা করিয়া সদ্গতি কামনা করে, সেই হতভাগ্য সুধা বলিয়া বিষ পান করিয়া আপনার মৃত্যু আপনিই ডাকিয়া আনে। ১০।

স্মৃত্বৈব যজ্ঞে বত জীবঘাতং
মন্যে মদীয়ে হৃদি খড়্গপাতম্।
প্রাণা বমন্তীব চ শোণিতং মে
বিরৌতি চাত্মা স্ফুটতীব চিত্তম্॥ ১১॥

দেবতার পূজায় জীবহত্যার কথা মনে করিলেই আমার হৃদয়ে যেন খড়্গাঘাত হয়! আত্মা-পুরুষ হাহাকার করে! আমার প্রাণ যেন রক্ত বমন করিতে থাকে!। ১১।

দূরেঽস্তু পূজা তব দেবি দুর্গে!
নাম্নৈব চেতো দ্রবতামুপৈতি।
ত্বন্নাম গৃহ্নন্ পরমূর্দ্ধ্নি লোকঃ
খড়্গং কথং পাতয়তে ন জানে॥ ১২॥

মা দুর্গা! তোমার পূজা দূরে থাক্, তোমার নাম করিলেই চিত্ত দয়ারসে গলিয়া যায়। জানি না মা! তোমার নাম করিতে করিতে লোকে কিরূপে অন্যের মাথায় খড়্গাঘাত করে!। ১২।

কিং নির্দ্দয়া ব্রহ্মময়ি! ত্বমীদৃক্
যৎ প্রীয়সে প্রাণিবধেন মাতঃ!।
শান্তং নু পাপং করুণাময়ী ত্বং
দয়ৈব নান্যৎ ত্বয়ি কিঞ্চিদস্তি ॥ ১৩ ॥

হাঁ মা! ব্রহ্মময়ি! তুমি কি এতই নির্দ্দয়া যে, প্রাণিহত্যায় সন্তুষ্ট হও? না—না, ও কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়; তুমি দয়াময়ী; তোমাতে দয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

হিন্দুর পর্ব্বাহ

এই প্রবন্ধে আমরা হিন্দুর কয়েকটী পর্ব্বাহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিব। জন্মাষ্টমী, ষট্পঞ্চমী, শীতলষষ্ঠী, শিবরাত্রি ইত্যাদি সমুদয় পর্ব্বাহ প্রচলিত আছে। তদ্ভিন্ন নারায়ণের নিম্নলিখিতরূপ দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ যাত্রা হইয়া থাকে। যথা,—

১। বৈশাখে—চন্দন যাত্রা।
২। জ্যৈষ্ঠে—স্নান যাত্রা।
৩। আষাঢ়ে—রথযাত্রা।
৪। শ্রাবণে—শয়ন যাত্রা।
৫। ভাদ্রে—দক্ষিণপার্শ্বীয় যাত্রা।
৬। আশ্বিনে—বামপার্শ্বীয় যাত্রা।
৭। কার্ত্তিকে—উত্থান যাত্রা।
৮। অগ্রহায়ণে—ছাদনী যাত্রা।
৯। পৌষে—পুষ্যাভিষেক যাত্রা।
১০। মাঘে—শল্যোদনী যাত্রা।
১১। ফাল্গুনে—দোলযাত্রা।
১২। চৈত্রে—মদনভঞ্জিকা যাত্রা।

অদ্য তন্মধ্যে দোলযাত্রার স্বরূপ বর্ণন করা যাইতেছে। সুলেখক বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু, "বসন্তে" নামক প্রস্তাবে ষট্পঞ্চমী বা বাসন্তী পঞ্চমীর কবিত্বপূর্ণ

ব্যাখ্যান দিয়াছেন। সুতরাং এখানে আমরা তদ্বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব না। সংক্ষেপে প্রসঙ্গক্রমে তাহার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কিছু কিছু বলিতেছি *।

বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গেই এই পঞ্চমীর সূত্রপাত, তাই ইহাকে বাসন্তী পঞ্চমী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সরস্বতী পূজার নামান্তর ষট্‌পঞ্চমীও বটে। "ষট্‌পঞ্চমী" শব্দেই উহার আধ্যাত্মিকতা বিরাজমান। কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুই এখানকার উদ্দিষ্ট "ষট্‌"। ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের সমবায়ে "পঞ্চমী"। এই ব্রতে ষড়রিপু ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংযম আবশ্যক। দেবী বাগ্‌বাদিনীর শ্রীপাদকমলে আবীর, অভ্র, চুয়া, চন্দন, পুষ্প, যব-শীর্ষ ইত্যাদি সমর্পণ করিয়া চিত্ততোষ লাভ করি,—সেই সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক পথেও, আমরা অগ্রসর হইতে থাকি। এই পূজাতেই আমাদের বাহ্যভাব তিরোহিত হয়। বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাবের নিমিত্ত সাধক, রজস্তমঃ পরিহার করুন—দিব্য জ্ঞান জন্মিবে। "ষট্‌ পঞ্চমী" ব্রতের পর "ভৈমী একাদশী"। এই একাদশী—মহাব্রত। হিন্দুর যে যে অবশ্যপ্রতিপাল্য নিতান্ত-কর্ত্তব্য ব্রত আছে, ভৈমী একাদশী, তাহার অন্যতম এবং প্রধান ব্রত †। এই একাদশীতে জলস্পর্শ করিতে নাই—ইহাতে নিরম্বু

* আমাদের এক শ্রেণীর পাঠক, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় অপরিতৃপ্ত। ঋষি-বাক্যই, তাঁহাদের শিরোধার্য্য। শাস্ত্র, তাঁহাদের নিকট আপ্ত-বাক্য। তাঁহাদের মতি-গতির বিপর্য্যয় বা বিশ্বাস-ভঙ্গ করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। যাঁহারা অবিশ্বাসী বা অল্প-বিশ্বাসী, তাঁহাদের জন্যই ঐ সকলের অবতারণা।—পুরোহিত-সম্পাদক।

† কয়েকটী বাছা বাছা ব্রতের মধ্যেই ভীম একাদশীর প্রসঙ্গ ঐই দেখুন,—

"উঠা, পড়া, পাশ-মোড়া।
তার অর্দ্ধেক ভীমে ছোঁড়া॥
ক্ষেপার চৌদ্দ, ক্ষেপীর আট।
এই নিয়ে কাল কাট॥
তা যদি না করতে পার।
ভগার খালে ডুবে মর॥"

উঠা—উত্থান একাদশী, পড়া—শয়নৈকাদশী, পাশমোড়া—পার্শ্বপরিবর্ত্তনৈকাদশী, ভীমে ছোঁড়া—ভৈমী একাদশী, ক্ষেপার চৌদ্দ—শিব চতুর্দ্দশী অর্থাৎ শিবরাত্রি, ক্ষেপীর আট—মহাষ্টমী, ভগার খাল—গঙ্গাস্নান। শয়নৈকাদশী, পার্শ্বপরিবর্ত্তনৈকাদশী ও উত্থানৈকাদশীর উপবাসে মহাপুণ্য। যদি কেহ ঐ সকল কার্য্যে অশক্ত হন, তবে ভীম একাদশীতে উপবাস করিলেও, ঐ সকলের অর্দ্ধেক পুণ্যভাগী হন। শিবরাত্রি ও মহাষ্টমী হিন্দুর পালনীয়। এই সকল, যাঁহার দুরূহ বা দুঃসাধ্য বোধগম্য হইবে, তিনি গঙ্গাস্নানেও মুক্তি লাভ করিবেন।

উপবাস। মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর, নিতান্ত ঔদরিক বলিয়া সর্ব্বত্রই খ্যাত। তিনিও ঐ দিন অনাহারে ছিলেন। দেবানুগ্রহে অসাধ্যও প্রথমতঃ কষ্টসাধ্য, পরে সাধ্য—সর্ব্বশেষে সুসাধ্য হয়। ভীমের উপবাসেও কি তাহা প্রমাণীকৃত হইল না? তদ্দ্বারা আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে। অন্যান্য ব্রতে যেমন দম হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিরোধ ঘটে, ইহাতেও তাহার অভাব হয় না। ইহাতে সাধক, পবিত্রতর গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। অতঃপর শিব-চতুর্দ্দশী। ইহার প্রচলিত নাম "শিবরাত্রি"। ইহাতে রুদ্র দেবতার অর্চ্চনা করিতে হয়। রুদ্রদেব ভীষণ-মূর্ত্তি, কালরূপধারী। কালের অন্য নাম মৃত্যু। সকলকেই যম-সদনে গমন করিতে হইবে। এই তত্ত্ব-জ্ঞান, মনে উদিত হইলেই মানব, ধর্ম্ম-মার্গে প্রধাবিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। এতদ্দ্বারা চৈতন্য, বৈরাগ্য মোক্ষ ক্রমশঃ মানবহৃদয়ে জাগরূক হয়। ইহার পর "দোল-যাত্রা"। দোল-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বেই "বহ্ন্যুৎসব"। চলিত কথায়, উহা "মেড়া পোড়া" নামে পরিচিত। "মেঢ্রাসুর" নামে এক অসুর ছিল। 'মেঢ্রাসুর' ছাগজাতীয়। সেই অসুর, কামবৃত্তি চরিতার্থ করিতে, বৃন্দাবনস্থ কামিনীগণের উপর দৌরাত্ম্য না করিয়া থাকিতে পারিত না,—তাহার উহাতেই প্রবৃত্তি ছিল শ্রীকৃষ্ণ, শিক্ষা দিবার উদ্দেশে মেঢ্রাসুরের বধসাধন করিয়া নিশ্চিন্ত হন। সেই অসুরের শবদাহের স্মৃতিই, বহ্ন্যুৎসব, মেড়াপোড়া বা চাঁচর নামে খ্যাত। বসন্ত ঋতুতে কামবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়। তাহাকে মেঢ্রাসুরের স্থানীয় অর্থাৎ প্রতিনিধিস্বরূপ মনে করিয়া এখন ঐ উৎসব চলিয়া আসিতেছে। এইবার সংক্ষেপে দোলযাত্রার কথা বলিব।

মানবের অন্তরাত্মা যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে তাহাকে "দোলা" বলা যায়। বসন্ত পঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয়া দোল-যাত্রার পূর্ব্বাবধি যত অনুষ্ঠান, যত আয়োজন, যত উদ্যোগ—তাহা বসন্ত-বয়স্য কন্দর্পের ও তদুপাসকের দমন জন্য চেষ্টা। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলের উৎপত্তি। তৎপরে রামনবমী পর্য্যন্ত ঐ উৎসব চলে। প্রতিপদের দোল, পঞ্চম দোল, নবম দোল ইত্যাদি নানাবিধ দোলই, বঙ্গদেশে হিন্দুর গৃহে কৌলিকী প্রথানুসারে প্রবর্ত্তিত। যাঁহাদের মনশ্চাঞ্চল্য, অন্তর্দৌর্ব্বল্য উহাতেও নিবৃত্ত না হইবে, তাঁহারা

"বাসন্তী পূজা"-নিমিত্ত উদ্যোগী থাকিবেন। বাসন্তী পূজা, নবমী তিথিতে "রাম-নবমীতে" হয়, তখনও দোল চলে। এই দোলের সহিত দুর্গোৎসব অতি নিকট-সম্বন্ধ। দোল-মাহাত্ম্য অতি মহান্। কেবল দোল কেন, রাস-যাত্রা ও রথযাত্রাও অতি-প্রচুর-ফলপ্রদা। শাস্ত্রে আছে—

দোলায়মান-গোবিন্দং মঞ্চস্থ-মধুসূদনং।
রথস্থ-বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

ইহার তাৎপর্য্য এই,—

দোলে গোবিন্দ-মূর্ত্তি, রাসমঞ্চে মধুসূদন-মূর্ত্তি ও রথে বামন-মূর্ত্তি দেখিলে দর্শক, ভব-বন্ধন-মুক্ত হন।

আবীর মাখিলে 'বসন্ত রোগ' 'ওলাউঠা' ইত্যাদি বাসন্তী পীড়ার তিরো-ভাব হয়, অনেকের এই মত। যাঁহারা তাহাতেও আস্থাবান্ নহেন, তাঁহারা হিন্দুরীতি বলিয়াও উহার রক্ষণে প্রয়াসী ও অগ্রসর হইবেন না? ইংরেজগণের দৃষ্টান্ত দেখ না—উঁহারা কত কালের কত প্রাচীন কত অসভ্য অভদ্র প্রথা পর্য্যন্ত এখনও সযত্নে বক্ষে ধারণ করিতেছেন!

এই প্রবন্ধ-পাঠে হিন্দুধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন সমদর্শী উদার মতের অবতারণা করিয়া দেখাইলাম, কেবল বৈষ্ণব, কেবল শাক্ত, কেবল শৈব মত ভাল নয়। সকল-মতেরই সামঞ্জস্য-বিধান হওয়া একান্ত বিধেয়। "দোল-দুর্গোৎসব" এই প্রচলিত বাক্যেও তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

আষাঢ়ে বৈদ্যের হাঁসাড়ে কাণ্ড।

প্রথম দৃশ্য।—জঙ্গল।

কালু কাঠুরিয়া ও তৎপত্নী সুন্দরী।

কালু। শোন্ বলি। আমি তোর্ কথায় চল্‌ব না। আমি যা বল্‌ব, তুই তা শুন্‌বি; আমি যা হুকুম কর্‌ব, তুই তা তামিল কর্‌বি। বস্।

সুন্দরী। আমিও বলি শোন্। আমি যা বল্‌ব, তোকে তাই কর্‌তে হবে। আমি তোর মুখনাড়া সইব না, সইব না। আমি কি তোকে এই জন্য বিয়ে করেছি।

কালু। আরে বিয়ে করেই ত আমি গোল্লায় গেলেম। নইলে আজ্ আমায় পায় কে? মহাকবি কালিদাস বলেচেন্ "বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ" বিবাহ কর্‌লেই ঠক্‌তে হয়।

সুন্দরী। তুই হলি কাঠুরে। আরে মহাকালী কবিদাস্ কি বলেছে, না বলেছে, তুই জান্‌বি কি ক'রে। তুই কি বামন পণ্ডিত না কিরে?

কালু। আরে থাম্ থাম্। আমার যে বিদ্যা আছে, আমি মনে কর্‌লে একখানা টোল্ খুল্‌তে পারি। কাঠুরেদের মধ্যে কোন্ শালা আমার মত পণ্ডিত আছে। আমার ন্যায়শাস্ত্র পড়া আছে—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" পর্ব্বতে আগুন লেগেছে, তাই ধূঁয়া উঠ্‌ছে।

সুন্দরী। তোমার মুখে আগুন লাগ্‌বে কবে?

কালু। আরে শোন্। আমি যখন বেলেঘাটায় লেবুর আড়তে থাকি, তখন আমি নাইট্ স্কুলে পড়ি। তার্ পর আমি প্রাইমারি পড়ি। তার পরে ছাত্রবৃত্তি পড়ি। আমি মেঘনাদ বধ পড়েছি। শোন্—

"সম্মুখ সমরে পড়ি" বীর বীরবাহু
চলি'যবে গেলা যমপুরে"

সুন্দরী। তুমি কবে যমপুরে যাবে। এমন হতচ্ছেড়ে বাঁদরমুখো হাড়-জ্বালানে লোকও ত কোথাও দেখি নাই।

কালু। আঃ মর্ মাগী। যত বড় মুখ, তত বড় কথা। ঢের ঢের মাগ্ দেখেছি, এমন পেঁচামুখী চিরুণদাঁতী উঁচকপালী হাড়্‌হাবাতে আলক্ষ্মী মাগ্ বাপের জন্মে দেখিনি।

সুন্দরী। তোর বাপ্ দাদার বহুভাগ্যি, আর তোর অনেক তপিস্যা যে, তুই আমার মত মাগ্ পেয়েছিস্।

কালু। তপিস্যাই বটে রে শালী! তপিস্যাই বটে। হা ভগবান্! তোর্ মনে এতও ছিল।

সুন্দরী। শোন্ বলিরে তোরে।
আমায় মাগ পেয়েছিস্ কপাল-জোরে.
(খালি) কপালের জোরে।
(শুধু) ঐ কপালের জোরে।

রূপে গুণে কুলে শীলে, আমার মতন কোথায় মিলে,
কত বড় মানুষের ছেলে, আমার লেগে ঘোরে ॥
সুখ যদি তোর ভাগ্যে থাকে, পায়ে ধ'রে সাধ আমাকে
হাঁটু গেড়ে খত দে নাকে দাঁতে কুটো ক'রে ॥
সেবা কর্‌বি দিনে রেতে, সঙ্গে থাক্‌বি শুতে খেতে
আদর কর্‌বি বিধিমতে নইলে যাব সরে' ॥

কালু। প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—"অহহ মহাপঙ্কে নিমগ্নোস্মি" অর্থাৎ শ্যামচাঁদে রাই ঠেলিস না দুপায়, শ্যামধনে কি যে পায়, সে পায়।

সুন্দরী। হতভাগা মিন্সে আমার যথাসর্ব্বস্ব খেলে গা, যথাসর্ব্বস্ব খেলে।

কালু। আমি কি সুধু খাই প্রিয়ে! হামারা থোড়া খানা, লেকেন্ বহুত পীনা।

সুন্দরী। আমাকে বিছানা গুলা পর্য্যন্ত পেটের দায়ে বিক্রী কর্‌তে হ'ল।

কালু। সে ত ভালই হয়েছে প্রিয়ে। মহাকবি কালিদাস বল্‌ছেন্—"বহুনিদ্রা হি অনর্থমুলা" বহুনিদ্রাই সর্ব্বনাশের গোড়া। বিছানা কম্ হলেই, নিদ্রাও কম হবে।

সুন্দরী। আর পোড়ার মুখো দিবারাত্রি খোলাভাঁটীতে না হয় শুঁড়ির বাড়ীতে পড়ে' আছে, আর গু গিল্‌ছে।

কালু। প্রিয়ে! সেখানে যে সব লোক যায়, আর থাকে, তুমি যদি তাদের কাছে থাক বা যাও, তা হলে তুমিও পণ্ডিত হয়ে যাও। ন্যায়ালঙ্কার তর্কালঙ্কার, বি,এ, এম,এ, উকীল, ডাক্তার, পণ্ডিত, মাষ্টার, প্রোফেসার, প্রিন্সিপাল সব একেবারে যেন চাঁদের হাট। আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে—তোমাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে কিছু তরিবৎ শেখাই।

সুন্দরী। তরিবৃৎ শিখ্‌ব পরে। কিন্তু এখন ছেলে পিলে নিয়ে কি করি বল দেখি।

কালু। যা ইচ্ছা।

সুন্দরী। তারা যে খাই খাই করে' আমার মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে তার কি?

কালু। বেদম মার। মারের তুল্য ঔষধ নাই। মহাকবি কালিদাস

বলেছেন—"প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" প্রহার দ্বারা সকলকেই জয় করা যায়। মহাকবি কালিদাস আরও বল্‌ছেন—"লালনে বহবো দোষাঃ তাড়নে বহবো গুণাঃ"। খাওয়ানর সকলই দোষ; মারার সকলই গুণ।

সুন্দরী। আরে এ আঁটকুড়ীর ব্যাটার জ্বালায় যে জ্বলে মলুম গা। সাধ ক'রে কি আমাকে মুখ খুল্‌তে হয়?

কালু। সুন্দরী! মুখ বেসি খুলো না। কেননা তোমার বদন-সুধাকর হতে যে মুহূর্ত্তে বচন-সুধা ক্ষরিত হবে, সে মুহূর্ত্তেই আমার এই হস্ত-রাহু তাহাকে গ্রাস কর্‌বে। (গাল টিপে দেওয়া)।

সুন্দরী। আঁটকুড়ীর ব্যাটা অলোপ্‌পেয়ে তুমি যমের বাড়ী যাও। আমি তোমার ঘাটে উঠি। তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্।

কালু। এতক্ষণ তুলি নাই, কিন্তু এখন তুলিতে হইল। (চুলের ঝুঁটী ধরিয়া প্রহার)।

সুন্দরী। মাগো মলেম গো, আঁটকুড়ীর ব্যাটা মেরে ফেল্লে গো (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ক্রন্দন শুনিয়া কালীকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রবেশ।

কালী। এখানে কিসের কোলাহল হে। আরে ছিঃ, আরে ছিঃ! সরলা অবলার অঙ্গে হস্তোত্তোলন! আরে ছিঃ, আরে ছিঃ।

সুন্দরী। আমার ইচ্ছা, আমি মার খাব। তুমি কে ঠাকুর? এখানে নাক সিট্‌কে ছিঁ ছিঁ কর্‌তে এসেছ।

কালী। বৎসে চারুভাষিণী! তুমি যথেচ্ছ প্রহার ভোজন কর। আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সদিচ্ছার অনুমোদন করিতেছি।

সুন্দরী। আমি মার খাই, না খাই,—সে আমার ইচ্ছা, আমার খুসি। বলে—গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। আমাদের কথায় তোমার কাজ কি ঠাকুর?

কালী। ঠিক বলেছ বাছা। আমার কোন কথায় কাজ কি? তুমি যত ইচ্ছা, মার খাও—আমি দ্বিরুক্তি করিব না।

সুন্দরী। দেখুন ত মজার বিটলে বামনের অত্যাচার। ওঁর জন্যে সোয়ামী, আপনার স্ত্রীকে মার্‌তে পারছে না। এই সব বিটকেলে বামন গুলা হতেই দেশ টা ছার খারে গেল।

ঠাকুর ভাল যদি চাও।
ঘরে ফিরে যাও।
পরের কথায় মাথা দিয়ে কেন গোল বাধাও।
প্রেমের পাথারে
আমরা মাগ্-ভাতারে,
হাঁসি খুসী ঘুষা ঘুষী করি প্রাণ ভ'রে।
তুমি কেনে টিকি নেড়ে সুখে বাধা দাও॥
যখন কান্ত আমারে
দু হাতে মারে
তখন লাগে কি হে তোমার গায়ে সুধাই তোমারে।
এখন তুমিও গিয়ে ঘরে মাগ্‌কে মেরে মনের খেদ মিটাও॥
তুমি অরসিক বামন।
জান না পীরিতের ধরণ।
এতে কভু হাসি, কভু কাঁদি, বিরস বদন।
কভু বা স্বর্গেতে উঠি, কভু ধরায় পতন।
তুমি তাই এ সব জঞ্জাল ছেড়ে ছুড়ে আপন চর্‌কায় তেল দাও॥

কালী। (কালুকে সম্বোধন করিয়া) ওহে ভাই! আমার ঘাট হয়েছে। তুমি সচ্ছন্দে তোমার পত্নীকে প্রহার কর। যেমন মার মারা উচিত; তুমি তেমনই ক'রে মার।

কালু। না ঠাকুর! আমি আমার মাগ্‌কে মার্‌ব না।

কালী। সে আরও ভাল।

কালু। আমার যখন ইচ্ছা হবে, তখন আমি ওকে মারব, যখন ইচ্ছা না হবে, তখন মার্‌ব না। ও আমার স্ত্রী, তোমার নয়।

কালী। বালাই, ও আমার শত্রু দুষমনের স্ত্রী হোক, আমার হবে কেন?

সুন্দরী। প্রাণনাথ! তোমার ছড়ি গাছটা আমাকে দাও।

কালী। (স্বগত) ও বাবা, এ ছড়ি নেয় কেন? মার্‌বে নাকি! স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। আমি এখন সরে' পড়ি।

তৃতীয় দৃশ্য।

কালু। প্রিয়ে! এস আমরা এখন ভাব করি।

সুন্দরী। এত মারের পর।

কালু। প্রিয়ে! আমি তোমার সঙ্গে কৌতুক কর্‌ছিলেম।

সুন্দরী। এবার থেকে যখন তোমার কৌতুক কর্‌বার ইচ্ছা হবে, নিজের শরীরে কর।

কালু। অয়ি চারুশীলে মানময়ী! তুমি কি জান না—তোমার আর আমার শরীরে কোন ভেদ নাই। আমি যখন তোমাকে প্রহার করি, তখন আমি আপনাকেই প্রহার করি। কেন না তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গ। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—"অর্দ্ধাঙ্গিনী পতিব্রতা"। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ।

সুন্দরী। প্রহারের সময় যে অর্দ্ধাঙ্গটা তোমার, এবার থেকে তারই উপর প্রহার ক'রো।

কালু। প্রিয়ে, এবার আমায় ক্ষমা কর। (সুন্দরীর চরণ ধরিয়া) (কীর্ত্তনের সুরে)

ক্ষমা কর রাই গরবিণী
পদে লুটায় তোর নীলমণি।
মানে ক্ষমা দে, ক্ষমা দে,।
আর মান করো না।
তোমার চরণ ছুঁইয়া, শপথ করিয়া,
বলিহে তোমায় জোড় করে।
আমি যাবৎ বাঁচিব, তোমা আদরিব।
আর না মারিব তোরে।

সুন্দরী। এবার তোমায় মাপ কর্‌লাম। কিন্তু এর শাস্তি তোমায় দিব।

কালু। শাস্তি! আর শাস্তি কি দিবে!

অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি
ভুজ পাশে বাঁধি' কর দণ্ড।

দেখ "প্রেমসাগরে উঠে নানা তরঙ্গ"। এ সাগর মন্থন করিলে কখন বা হলাহল উত্থিত হয়। তাতে কি রাগ করতে হয়। আর কি জান—

"ইক্ষু কি রস দেয় দয়া করিলে।"

দু এক ঘা মারামারি না হলে প্রণয়ের পঙ্কোদ্ধার হয় না। সে যা হোক, আমি এখন কাঠ কাটিগে। দেখ্‌বে দু এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার ঘর কাঠে বোঝাই হয়ে যাবে। (কালুর প্রস্থান)

সুন্দরী। যদি আমি এ মারের শোধ না তুলি, তবে আমার নাম সুন্দরী নয়। কিন্তু কি উপায় করি? ঐ না দুজন লোক এই দিকে আস্‌ছে। দেখি, যদি ওদের দ্বারা কোন সুবিধা হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি)।

চতুর্থ দৃশ্য।

ফিকির উল্লা ও আতা উল্লার প্রবেশ।

ফিকির। হ্যা দ্যাখ আতা উল্লা! তুই যেমন নিরেট বোকা, তেমনই আস্ত গাধা। বোবা কবিরাজ ব'লে গলি গলি খুঁজে বেড়ালে কি কোন ফল হয়।

আতা। আমি বোকা, না তুই বোকা। তুই কবিরাজের নামটা মনে ক'রে রাখ্‌তে পার্‌লি না। আমি ত কবিরাজ না নিয়ে ফিচ্ছি না। কবিরাজ না নিয়ে গেলে নবাব সাহেব আমাদের আস্ত রাখবে না।

ফিকির। আঃ এমন বিষম দায়েও কি মান্‌ষে পড়ে। আগে ত চিঠি খানি হারাল। তার পর তার নামটা বেমালুম ভুলে যাওয়া গেল।

সুন্দরী। (স্বগত) এরা দেখছি, একজন কবিরাজ খুঁজছে। দেখি দেখি, এতে আমার কিছু সুবিধা হয় কি না? (বাহির হইয়া পাদচারণ)

ফিকির। (সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া) ওগো বাছা! এখানে কবিরাজ আঁ—আঁ কোথায় থাকেন বল্‌তে পার?

সুন্দরী। কোন্ কবিরাজ?

ফিকির। ঐ যে ভাল, কি কবিরাজ তার নামটা মনে হচ্ছে না।

সুন্দরী। আর বুঝি পরিহাস করবার জায়গা পাও নাই। তোমার মা বোন্ নাই। তাদের গে জিজ্ঞাসা কর না। গেরস্তের মেয়ের সঙ্গে রঙ্গরস।

আতা। ওগো বাছা পরিহাস নয়, পরিহাস নয়। এখানে না একজন কবিরাজ আছেন, যিনি বোবা মানুষকে কথা কওয়ান।

সুন্দরী। আ মরণ আর কি? ভগবান্ আগে তোমায় বোবা করুন, তার পর বোবার কবিরাজ খুঁজবে।

আতা। কেন বাছা অকারণে গালি দিচ্ছ। আমরা তোমার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছি না। আমরা নবাব সাহেবের চাকর। নবাব সাহেবের মেয়ে হঠাৎ বোবা হয়েছেন। তাই আমরা একজন বোবা কবিরাজের অনুসন্ধান করছি।

সুন্দরী। এখানে একজন কবিরাজ আছেন বটে। তাঁর নাম কালাচাঁদ কবিরাজ। তিনি এখন কবিরাজী ছেড়ে দিয়েছেন। হাজার রোগী এলেও তিনি কোথাও যান না।

আনা। তাঁহার বাড়ীটা আমাদিগে দেখিয়ে দাও। আমরা যেমন ক'রে পারি, তাঁকে নবাব সাহেবের কাছে নিয়ে যাব।

সুন্দরী। তাঁকে যদি একবার রোগীর কাছে নিয়ে যাতে পার, তা হলে যেমন তেমন রোগ হোক না কেন, ভাল হতেই হবে। তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

ফিকির। বস্ বস্! আর বল্‌তে হবে না। এখন তাঁর বাড়ীটা আমাদের একবার দেখিয়ে দেও।

সুন্দরী। সে তো বাড়ীতে বড় থাকে না। আর বাড়ী থেকে তাকে বের করাও বড় মুস্কিল। তোমরা যদি এখানে নিকটা নিকটি তল্লাস কর, তা হ'লেই তাকে দেখ্‌তে পাবে। সে কখন কখন ঐ বনটায় গিয়ে কাঠ কাটে।

আতা। সে কি গো। কবিরাজ মশায় কাঠ কাটে কি গো।

ফিকির। আরে কবিরাজ মশায় পাঁচনের জন্য গাছ গাছড়া কাটে। ও স্ত্রীলোক তাইতে ভেবেছে—কবিরাজ মশায় কাঠ কাটে।

সুন্দরী। না গো না, তা নয়। পাছে কেউ কবিরাজ ব'লে তাকে ডাক্‌তে আসে, এজন্যে সে মিছে একটা ভাণ করে কাঠ কাটে। আবার সে ঠিক চাষার মত পোষাক পরে। তার ভয়, পাছে কেউ তাকে কবিরাজ বলে চিন্‌তে পারে।

ফিকির। তা বড় লোকের অনেক রকম খামখেয়ালি থাকে। সে সব কথায় আমাদের দরকার কি ?

সুন্দরী। আগে ত সে কোন মতেই স্বীকার কর্‌বে না যে, সে কবিরাজ। তার পর তাঁকে খুব কসে ঠেঙ্গাতে হয়। আমাদের যখন ছেলে পিলের অসুখ হয়, আমরা তাই করি। মেরে হোক, ধরে হোক; একবার তাঁকে বাড়ী এনে ফেল্‌তে পার্‌লেই রোগ আরাম।

ফিকির। এ ত বড় মজার কবিরাজ।

সুন্দরী। কিন্তু এমন হাত-যশ কারুর নাই। প্রায় ছ মাস হ'ল, আমার ননদটী মারা যায়। কবিরাজ ডাক্তার সবাই এসে বল্লে যে, মরে গেছে। তার পর আমরা মার্‌তে মার্‌তে কবিরাজকে ত বাড়ী নিয়ে এলেম। কবিরাজ এসেই তাকে কি একটা আরক খাওয়াইয়ে দিলে। আর অমনই আমার ননদ বিছানা থেকে উঠে বেস হেঁটে হুঁটে বেড়াতে লাগ্‌ল। যেন কার অসুখ হয়েছিল !

আতা। কি আশ্চর্য্য! বলিহারি যাই।

সুন্দরী। আজ দিন কুড়িক হ'ল, একটা ছেলে ঘুঁড়ি উড়ুতে উড়ুতে ছাত থেকে পড়ে যায়। তার মাথার খুলি খানা ভেঙে গেছ্‌ল। আর হাত পা ত একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। তার পর ঐ ছেলের বাপ মা, কবিরাজকে মার্‌তে মার্‌তে বাড়ী নিয়ে গেল। কবিরাজ যেমন ঐ ছেলেটীকে একটু তেল মাখিয়ে মালিস ক'রে দিলে, অমনই সে তড়াক ক'রে উঠে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেড়াতে চলে গেল।

আতা ও ফিকির। বাঃ বাঃ, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য !

আতা। এমন কবিরাজকে ছাড়া হবে না। যেমন ক'রে হোক, মেরে হোক, ধ'রে হোক, ওকে বাড়ী নিয়ে যেতেই হবে।

ফিকির। কিন্তু কবিরাজ কি বোবাকে কথা কওয়াতে পার্‌বে ?

সুন্দরী। হুঁঃ। ওগো বোবা, কালা, খোঁড়া, কানা সবই কবিরাজের বাহাদুরীতে আরাম হয়ে যায়। ও পাড়ার ছোট গিন্নী জন্ম-বোবা। বিয়ে হয় না। বর আসে, আর ফিরে যায়। শেষে কবিরাজ গিয়ে তার জিবে একটা কি গুঁড়ো মাখিয়া দিলে, আর ছোট গিন্নী ফড় ফড় ক'রে বক্‌তে লেগে গেল। এখন ছোটগিন্নীর বক্‌বকানির জ্বালায় পাড়ায় টেঁকা ভার।

আতা। হাঁ গো! হাঁ আর বল্‌তে হবে না। এখন কবিরাজকে এক বার দেখ্‌তে পেলে হয়।

সুন্দরী। সে তো জঙ্গলে কাঠ কাটে। এস দেখি, একটু এগিয়ে দেখি। (কিয়দ্দূর যাইয়া) ঐ দেখ, কবিরাজ কাঠ কাট্‌ছে।

ফিকির। ঐ কাল মজুরটার মতন লোকটা কবিরাজ?

সুন্দরী। ঐ কবিরাজ। আমাদিগে দেখে ও আরও জোর করে' করে' কাঠ কাট্‌ছে। মিন্সের কুড়ুল ফেলার রকমটা দেখ। এত ঢঙ্‌ও জানে।

আতা। ওরে ফিকির আর দেরি কি? (সুন্দরীর প্রতি) ওগো বাছা তুমি আমাদের অনেক উপকার কর্‌লে। খোদা তোমায় সুখী করুন।

সুন্দরী। ওকে খুব বেদম মার্‌বে। নইলে ওকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

ফিকির। তাতে কিছু ত্রুটি হবে না। আশী সিক্কার উপর আমরা বিরিশি সিক্কে চালাব।

পঞ্চম দৃশ্য।—ফিকির উল্লা, আতা উল্লা ও কালু।

কালু। বাপ্‌রে—এমন গরম ত দেখি নি। একটু বিশ্রাম করি। (কুড়ুল ফেলিয়া বিশ্রাম) (সম্মুখে দেখিয়া) এরা আবার কারা গো?

ফিকির। সেলাম্ আলেখাম্—মেজাজ্ সরিফ।

কালু। সেলাম্ আলেখাম্, সেলাম্ আলেখাম্।

ফিকির। আপনার নাগাল পেয়ে আমরা যে কি পর্য্যন্ত খুসী হয়েছি—

কালু। তা ত হতেই পার। হবার কথাই বটে।

ফিকির। মশায়! আমাদের একটা উপকার আপনাকে কর্‌তে হবে। আপনার অনুগ্রহ লাভ কর্‌বার আশায় আমরা আপনার নিকট এসেছি।

কালু। আমা দ্বারা আপনাদের যা উপকার হতে পারে, তা কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

ফিকির। মশায়! আমরা বাধিত ও অনুগৃহীত হ্‌লেম। মশাই! বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

কালু। (স্বগত) এরা ত পেয়াদা। এদের আদব কায়দা ভদ্রলোকের মত।

ফিকির। আমরা অনেক দূর থেকে আপনার সন্ধানে এসেছি। আপনার সুনাম জগদ্বিখ্যাত।

কালু। অবশ্য অবশ্য। আপনার বড়াই আপনাকে কর্‌তে নাই। কিন্তু কাঠ কাটাতে কালুর মত আর একটী লোক খুঁজে পাওয়া ভার।

ফিকির। কাঠ কাটা! সে কি আজ্ঞা কর্‌ছেন মশাই।

কালু। অন্য জায়গার কথা বলি না। কিন্তু এ সহরে আমা চেয়ে সস্তায় যদি আপনাদিগে কেউ কাঠ বিক্রী কর্‌তে পারে, তা হলে আমি কাঠের দাম নেব না। যাক, আর বেশী বকাবকির দরকার কি? এই যে রলা দেখছেন, এর হাজার করা আমি পাঁচ টাকার হিসাবে নেব।

ফিকির। মশায়! এ সব কি বল্‌ছেন। কাঠ পাঁচ টাকা হাজার করা—

কালু। মশায়! আমার বাপ যদি স্বর্গ থেকে নেবে এসে এর পাই পয়সা কম দেন, তা হ'লে আমি তাঁকে দিই না। অন্যে পরে কা কথা।

ফিকির। মশায়! আমরা আপনাকে চিনি। কেন আমাদের ভাঁড়াচ্ছেন।

কালু। মশাই! খোসামুদিই করুন, আর বরামুদিই করুন, কালুর এক-কথা। রোকা কড়ি চোকা মাল—নিতে হয় নাও, নয় রাস্তা দেখ।

ফিকির। মশাই! আর কেন কথা বাড়ান? আপনার ন্যায় লোকের কি এসব নীচ কাজ শোভা পায়? আপনি মহাজ্ঞানী মহাযশস্বী, আপনার কি এ ছদ্মবেশ শোভা পায়? আপনার বুদ্ধিবিদ্যে কি বনে এলে লুকান থাক্‌বে। আগুন কি কখন পাঁশ ঢাকা থাকে?

কালু। আঃ ম'ল—(স্বগত) এ বেটা পাগল নাকি?

ফিকির। আমরা করযোড়ে মিনতি করে' আপনাকে বল্‌ছি, আপনি আমাদিগে আর বঞ্চনা কর্‌বেন না।

আতা। আর দেখুন, বঞ্চনা করায় তো কোন লাভ নাই। আপনি যে কে, তা আমাদের আর জান্‌তে বাকী নাই।

কালু। কেন—আমি কে? তোমরা আমার কথা কি জান?

ফিকির। আপনি মহাযশস্বী কবিরাজ। কেমন এখন হয়েছে।

কালু। কবিরাজ তোমার বাবা! আমি কবিরাজ!

ফিকির। ঐ রে রোগে ধরেছে! মশাই কেন আমাদিগে আর কষ্টে ফেলেন? আর বঞ্চনা কর্‌বেন না। আপনার রোগ কিসে সারে, তা ত আপনি বেস জানেন!

কালু। যে জানে, তার বাপের মুখে শুয়ারের গু। আমি কেবল এই জানি, আমি কবিরাজ নই।

ফিকির। ওহে আতা উল্লা! কবিরাজের রোগ ত সহজে সার্‌ছে না। তা এস, উচিত ব্যবস্থা করা যাক্। তবে এক বার শেষ নেড়ে চেড়ে দেখা যাক্। তবে কবিরাজ মশায়! আপনি কবিরাজ নন্।

কালু। না রে বাপু না। কত বার ঐ এক কথা বল্‌তে থাক্‌ব।

ফিকির। ওহে আতা! আর বিলম্ব কেন? শুভস্য শীঘ্রং। (উভয়ের কালুকে প্রহার)।

কালু। আ রে কর কি কর কি। তোমরা কর্‌ছ কি। আমি—আমি—তোমরা যা বল্‌বে, আমি তাই—

ফিকির। কেন মশাই, আপনি আমাদিগে এ সব গর্হিত কাজ কর্‌তে বাধ্য করান।

আতা। আপনার গায়ে হাত তুল্‌তে হ'ল, এতে আমাদের বড় কষ্ট।

কালু। আর (গায়ে হাত বুলাইয়া) আমারও বড় হচ্ছে। কিন্তু আপনারা যে জোর করে' আমাকে কবিরাজ বানাতে চান, এর মতলবটা কি?

ফিকির। আপনি আবার অস্বীকার কর্‌ছেন, আপনি কবিরাজ নন?

কালু। এর আবার স্বীকার অস্বীকার কি? আমার বাপ চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনও কবিরাজী করে নাই।

ফিকির। আপনি কবিরাজ ন'ন। ওহে আতা! আর বিলম্বে কাজ কি? শুভস্য শীঘ্রং। (উভয়ের কালুকে পুনঃপ্রহার)।

কালু। আর মের না গো, আর মের না। আমি কবিরাজ, ডাক্তার, হকিম, মান্দ্রাজী অর্শ আর ভগন্দ। আমি এলেয়াপেতী, হুমোপেতি, ইলেক্ট্রোপেতি, স্প্রাপেতি। আমি দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যে, আমি মহেন্দ্র সরকার, আমি জগবন্ধু বসু, আমি স্যুয্যি সর্ব্বাধিকারী। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—আত্মানং সততং রক্ষেৎ। চাচা আপন বাঁচা।

ফিকির। তাই বলুন মশায়, পথে আসুন। আপনি যে আমাদিগে একেবারে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

কালু। কে কাকে বসিয়ে দিয়েছে, তা ভগবান্ জানেন। তা আমার বোধ হয়, ভুল হয়েছিল। আমি জানি না বটে, কিন্তু হয় ত আমি আমার অজ্ঞাতে এক জন কবিরাজ হয়েছি। যারা পাগল, তারা কি কখন ভাবে যে, তারা পাগল। কিন্তু তবু তারা পাগল। যারা স্ত্রীর ভেড়ো, তারা যে ভেড়ো, তা কি তারা জানে? কিন্তু তবু তারা ভেড়ো। তা বাবু! আমি তোমাদের একান্ত করে' জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—আমি কি সত্যি সত্যি কবিরাজ।

ফিকির। আপনি কবিরাজিতে ভারত-ভূমিতে অদ্বিতীয়।

কালু। (বিস্ময়ে) হাঁ!

ফিকির। আপনি সকল প্রকার দুঃসাধ্য রোগ আরাম কর্‌তে পারেন—করে থাকেন।

কালু। (বিস্ময়ে) হাঁ—আ!

ফিকির। একটা মেয়ে মানুষ ছ ঘণ্টা কাল মরে পড়ে' ছিল। আপনি তাকে ভাল করেছেন।

কালু। হাঁ—আ—আ!

ফিকির। একটা ছেলের মাথার খুলি ভেঙে গেল, হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে গেল। আপনি তাকেও ভাল কর্‌লেন।

কালু। হাঁ—আ—আ—আঁ!

ফিকির। ও পাড়ার ছোট গিন্নী জন্ম-বোবা। আপনি তাকে কথা কইয়েছেন।

কালু। হাঁ—আ—আ—আ—আ!

আতা। দেখুন মশাই! নবাব সাহেব আপনাকে সন্তুষ্ট কর্‌বেন। আপনি যা চান্, তাই দেবেন্।

কালু। যা চাব, তাই দেবেন?

ফিকির। তার কোন সন্দেহ নাই।

কালু। তবে আমি যে কবিরাজ, তারও কোন সন্দেহ নাই। আমি যে কবিরাজ, তা আমি ভুলে গেছ্‌লেম। কিন্তু এখন আমার একটু একটু মনে হচ্ছে, আমি কবিরাজই বটে। কিন্তু আমাকে কি রোগের চিকিৎসা কর্‌তে হবে?

ফিকির। আমাদের নবাব সাহেবের কন্যাটী বোবা হয়েছেন। তাঁকে কথা কওয়াতে হবে।

কালু। মেয়ে মানুষকে কথা কওয়ান কি সহজ কাজ? যখন শ্রীরাধিকা মান করেছিলেন, তখন স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্ তাঁকে কথা কহাতে পারেন নি।

আহা বাম-কর-তলে রাখিয়া কপোল মহাযোগিনীর পারা

ও দুটি নয়নে বহিছে সঘনে শ্রাবণ মাসেরই ধারা (ধনি! কথা কয় না গো)

ফিকির। কিন্তু কৃষ্ণ ঠাকুর ত কবিরাজ ছিলেন না।

কালু। ছিলেন বৈ কি। "হরি বৈদ্য আম হরিবারে দুখ ভ্রমণ করি ভুবনে। ধনি! আমি কেবল নিদানে"

তবে কৃষ্ণ কাঠুরিয়া কবিরাজ ছিলেন এই ভরসা। কিন্তু এ বেশে ত কবিরাজী করা হয় না। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—

আগে দাও দর্শন-ডালি
পরে তোর গুণ বিচারি।

তোমরা এগোও। আমি যথাযোগ্য বেশ টেস্ করে' তোমাদের সঙ্গে জুটছি।

ফিকির। দেখুন, ভুল্‌বেন না শুভস্য শীঘ্রং।

কালু। দুবার শুভস্য শীঘ্রং হয়ে গেছে। আবার কেন? শুভস্য শীঘ্রং আমি জন্মেও ভুল্‌ব না।

ষষ্ঠ দৃশ্য।—নবাব সাহেবের বাড়ী।

নবাব। কৈ কবিরাজ কৈ? কৈ কবিরাজ কৈ?

ফিকির। পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে কবিরাজ একটু বিশ্রাম করবেন। আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। আপনার কন্যা মরে' কেন যাক না, কবিরাজ মশাই থাক্‌তে কোন চিন্তা নাই।

নবাব। এত বড় লোকটার এত দূর খামখেয়ালি?

ফিকির। বেশী আর কি। দু এক ঘা লাঠী ঝাড়লেই সব ঠিক হয়ে যায়। ঐ দেখুন, কবিরাজ মশাই আস্‌ছেন।

(আতা উল্লা ও কালুর কবিরাজী বেশে প্রবেশ)।

আতা। ইনিই সেই বোবার কবিরাজ।

নবাব সাহেব। আসুন মশাই! আসুন। আজ আমি আপনার আগমনে ধন্য হলাম। বসুন বসুন।

কালু। মহাকবি কালিদাস বস্‌তে নিষেধ করেছেন। "নাস্তি শান্তি তদা বিপ্র কবিরাজো বসেদ্ যদি" যেখানে কবিরাজ বসেন, সেখানে শান্তি নাই। আপনি ও আমি আমাদের উভয়কেই দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে।

নবাব সাহেব। মহাকবি কালিদাস একথা বলেছেন, তবে ত এর অন্যথা কিছুতেই করা যায় না।

কালু। (নবাব সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া) কবিরাজ অভ্রভেদী ব্যোমস্পর্শী বিন্ধ্যাচল-শিখরে আরোহণ—

নঃ সাঃ। কবিরাজ মশাই কি আমাকে কবিরাজ ঠাওরায়েছেন?

কালু। তার আর ভুল কি?

নঃ সাঃ। সে কি আমি যে সেখ সৈয়দ মোগল পাঠান নবাব আকবর আলি সাহেব। সম্প্রতি মহারাণী আমাকে K.G., A.B.C.D.E.F. প্রভৃতি বড় বড় খেতাব দিয়েছেন। আমি কবিরাজ! হাঃ হাঃ হাঃ।

কালু। কি আপনি কবিরাজ ন'ন!

নঃ সাঃ। না না, আমি কেন কবিরাজ হব?

কালু। আপনি কবিরাজ ন'ন?

নঃ সাঃ। না হে না। আমি কবিরাজ! তুমি কি বল্‌ছ?

কালু। আচ্ছা তবে এই বার আপনি কবিরাজ হলেন (যষ্টি দ্বারা প্রহার)

নঃ সাঃ। আ রে এ কি? এ বেটা কোথাকার পাগল?

কালু। কেমন আপনি এখন কবিরাজ হলেন কি না? যদি না হয়ে থাকেন, তবে আবার শুভস্য শীঘ্রং করি। আমি ত ঐ রূপ শিক্ষার বলেই কবিরাজ হয়ে পড়েছি।

নঃ সাঃ। এ কোথাকার চোয়াড় বেটাকে তোমরা কবিরাজ বলে' আমার কাছে ধরে' নিয়ে এসেছ।

ফিকির। মশাই! আমরা ত পূর্ব্বেই বলেছিলাম, কবিরাজের অনেক রকম খাম্‌খেয়ালী আছে।

নঃ সাঃ। এ সব খামখেয়ালী আমার কাছে টিক্‌বে না।

কালু। আপনি নবাব সাহেব। তবে আমার ঘা'ট হয়েছে।

নঃ সাঃ। যা হবার তা হ'য়ে গেছে। এখন আমার কন্তার পীড়ার বিবরণটা শুমুন। আমার কন্যার দুঃসাধ্য পীড়া হয়েছে।

কালু। আমি জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আপনার ও আপনার পরিবারস্থ সকলের দুঃসাধ্য পীড়া হউক, যেন আমি আমার কবিরাজীর বাহাদুরী দেখাই। আপনার কন্যার দুঃসাধ্য পীড়া হয়েছে শুনে' আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হলেম, তা আর কি বল্‌ব।

নঃ সাঃ। আপনার অনুকম্পায় আমি চিরবাধিত হলেম।

কালু। আপনার কন্যার নাম কি?

নঃ সাঃ। আমার কন্যার নাম নুরজাহান।

কালু। পাঁচ অক্ষরে নাম হ'লে, রোগ আরাম হবে না। আপনি বলুন— আপনার কন্যার নাম দিলজান, কি কুলজান, কি বেলজান, কি মিয়াজান।

নঃ সাঃ। আচ্ছা তাই ভাল। আমার কন্যার নাম দিলজান। ঐ যে আমার কন্যা আস্‌ছে।

সপ্তম দৃশ্য।—কবিরাজ, নঃ সাহেব, নুরজাহান ও পরিচারিকা।

নঃ সাঃ। এইটী আমার কন্যা।

কালু। এইটি আমার রোগী। এর মুখে ত রোগের কোন লক্ষণ দেখ্‌ছি না। তবে এঁর বিচ্ছেদ-ব্যথা বা বিরহ-বিকারের কিছু কিছু লক্ষণ দেখ্‌ছি বটে। এ রোগ অতি সহজেই সার্‌বে।

নঃ সাঃ। দেখুন, আপনাকে দেখে আমার কন্যা মৃদু মৃদু হাস্‌ছে।

কালু। হাসাটা বড় সুলক্ষণ। হাস্‌লেই বোঝা গেল, রোগটা জমাট বেঁধেছিল, ক্রমশঃ তরল হ'তে আরম্ভ হয়েছে। (নবাব পুত্রীর প্রতি) ওগো মেয়ে! তোমার কি হয়েছে? তোমার কি অসুখ?

নুরজাহন। হাঁউ, মাউ, চাউ, নাউ।

কালু। (মুখের কাছে কান লইয়া গিয়া) কি বল্‌লে?

নুরজাহান। হাঁউ, মাউ, চাউ, নাউ।

কালু। কি বল্‌লে? আবার বল তো।

নুরজাহান। হাঁউ, মাউ, চাউ, নাউ।

কালু। হাঁউ, মাউ, চাউ, নাউ। এ কোন্ ভাষা? এ কি ইংরাজী, না বাঙ্লা, না পার্সী, না উর্দ্দু?

নঃ সাঃ। মশায়! ঐ ত ওর রোগ। ও যে কেন বোবা হ'ল, তা কেউ নির্দ্ধারণ কর্‌তে পার্‌ছে না। ঐ রোগের জন্যই ত ওর বিয়ে বন্ধ হয়েছে।

কালু। বিবাহ বন্ধ হয়ে রয়েছে! সে কি?

নঃ সাঃ। ওর সঙ্গে যাঁর সমন্ধ স্থির করে' রেখেছি, তিনি রুগ্ন নারীকে বিয়ে কর্‌তে রাজী হচ্ছেন না।

কালু। অ্যাঁ এমন মূর্খও কি থাকে। মেয়ে মানুষ বোবা হ'লে, সোনায় সোহাগা হয়। যার প্রতি জগদীশ্বরের অত্যন্ত অনুগ্রহ, তার পত্নীই বোবা হয়। আমার স্ত্রী যদি বোবা হত, আমি কখনই তাকে আরাম কর্‌বার চেষ্টা পেতেম না। যাক্, হাঁউ মাউ চাউ নাউ বল্‌লে কি এঁর কষ্ট হয়?

নঃ সাঃ। হয় বৈ কি।

কালু। সে একটা সুলক্ষণ বটে। ওঁর শরীরে কি কোন বেদনা আছে?

নঃ সাঃ। হঁ ভারি বেদনা।

কালু। আরও ভাল। আমি তাই চাই। ওঁগো মেয়ে! তোমার হাত দাও ত, নাড়ীর গতিক কিরূপ দেখি। (নাড়ী না পাইয়া) এ যে দেখ্‌ছি ইহার নাড়ী টা পর্য্যন্ত বোবা হয়ে গিয়েছে।

নঃ সাঃ। আপনি ঠিক ধরেছেন। নাড়ী পর্য্যন্ত বোবা হয়ে গেছে।

কালু। মশাই! রোগীর নাকের অগ্র ভাগ দেখ্‌লেই লক্ষণ বুঝি। খনা বলেছেন,—চন্দ্র নেত্র সমুদ্র বাণ। পেটের রোগ টেনে আন।

অন্য কবিরাজে ডাক্তারে বল্‌বে, আপনার কন্যার মৃগতৃষ্ণিকা হয়েছে। কেউ বা বলবে, ওঁর মণিমুর হয়েছে। কেউ বা বল্‌বে, ওঁর জ্যোতিরিঙ্গন হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি, উনি বোবা হয়েছেন। ওঁর বোবাত্ব টুকু সেরে গেলেই উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন।

নঃ সাঃ। কিন্তু উনি যে বোবা হ'লেন, তার কারণটা কি? আমার জান্‌তে বড় কৌতূহল হচ্ছে।

কালু। কারণটা আমি বেস করে' বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাক্যকথন-শক্তি নষ্ট হওয়াতেই আপনার কন্যা বোবা হয়ে পড়েছে।

নঃ সাঃ। কিন্তু কি কারণে বাক্যকথন-শক্তি নষ্ট হ'ল ?

কালু। চরক, সুশ্রুত, নিদান, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি পুস্তকে বলে,—জিহ্বার ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হওয়াতেই ঐ শক্তিটী নষ্ট হয়।

নঃ সাঃ। কিন্তু ঐ প্রতিবন্ধকের কারণ কি ?

কালু। মহাকবি কালিদাস অতি সুন্দররূপে উহার কারণ নির্দ্দেশ করেছেন। মহাকবি কালিদাস অতি প্রধান লোক ছিলেন। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে এত বড় লোক খুব কমই জন্মেছেন। যেমন কবিত্ব, তেমনই গবেষণা, তেমনই বিচার-ভবিষ্যৎ দৃষ্টি।

নঃ সাঃ। কিন্তু প্রতিবন্ধকের কারণ কি ?

কালু। হাঁ। আমাদের জিহ্বার মূলে কতকটী রস সঞ্চিত থাকে। বড় বড় চিকিৎসকেরা তাহাকে বলেন রস। সেই রসের আধিক্য হওয়াতেই এই কার্য্যটী হয়েছে। আপনি সংস্কৃত জানেন ?

নঃ সাঃ। বিন্দুমাত্রও না।

কালু। (স্বগত) বাঁচ্‌লুম। (প্রকাশ্যে) সে ভালই হয়েছে। এক্ষণে শুনুন। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—নরঃ নরৌ নরাঃ, নরম্ নরৌ নরান্, নরেণ নরাভ্যাম্ নরৈঃ, নরায় নরাভ্যাম্ নরেভ্যঃ, নদী নদ্যৌ নদ্যঃ, লাঘিমা লাঘিমানৌ লঘিমানঃ, বভূব বভূবতুঃ বভূবুঃ। কেমন এক্ষণে বুঝলেন তো ?

নঃ সাঃ। ভাল বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সে আপনার দোষ কি ? আমার দুর্ভাগ্য।

কালু। তা শুনুন। বাঙ্‌লা করে'ই বলি। তবে কি জানেন—আমরা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ; বাঙ্‌লাটা একটু বাধ বাধ ঠেকে। আমাদের পেটের বাঁ দিকে একটা পিত্তকোষ আছে, যাকে আমাদের সংস্কৃতে বলে জরদ্গব। সেখান হতে কিছু রস উঠে' আমাদের হৃৎপিণ্ডে যায়, যাকে সংস্কৃতে বলে কস্মিংশ্চিৎ। ঐ রস কুল-কুণ্ডলিনীর যে চক্র, তথায় স্থিত যে মণিপুর, তার মধ্যে যে সুষুম্না, তার সঙ্গে মিশ্রিত হলেই "বিকারে সান্নিপাতিকে"। এতে করে' জন্মায় যে জলধর-পটল, তার সঙ্গে তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনীর দেখা—মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কেমন বুঝছেন তো ?

নঃ সাঃ। হাঁ বেস বুঝছি, আপনি বলে' যান।

কালু। তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনীর দেখা হ'লে এক রকম পূতিগন্ধময় বাষ্প উৎপন্ন হয়। ঐ বাষ্পই—"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী" অর্থাৎ কথা কহিবার ইচ্ছা হ'লেই দাঁতের গোড়ায় ঐ বাষ্প ফস্ ফস্ করে। সুতরাং স্পষ্ট ক'রে কথা কওয়া যায় না। কেমন বুঝ্‌লেন তো ?

নঃ সাঃ। আপনি অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়েছেন। আমারও সব খট্‌কা দূর হয়েছে। কেবল একটু সন্দেহ এই যে, আমার শোনা ছিল, হৃৎপিণ্ড আমাদের বাঁ দিকে, আর পিত্তকোষটা আমাদের ডান দিকে। আপনি যেন এর বিপরীত বল্‌লেন।

কালু। আপনি যা বল্‌লেন, আগে তাই ছিল বটে। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞান-বলে উহাদের স্থান-পরিবর্ত্তন হয়েছে। মহাকবি কালিদাস বলেন,—"শ্রূয়ন্তে হি পুরালোকে ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" অর্থাৎ কালে কালে সকলেরই পরিবর্ত্তন হবে।

নঃ সাঃ। সে যা হোক, আমি আপনার পাণ্ডিত্য দেখে বিস্মিত হ'লেম।

কালু। তা তো হতেই পারে। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—"ময়া ন পঠিতা চণ্ডী ত্বয়া নাপি চিকিৎসিতা" অর্থাৎ বিদ্বানের বিদ্যা দেখ্‌লে, কার না বিস্ময় হয় ? ছেলেপিলে চম্‌কে উঠে। তা অন্যে পরে কা কথা ?

নঃ সাঃ। তা তো বটেই। এখন আমার মেয়ের আপনি কি কর্‌বেন ?

কালু। এই যে কর্‌ছি। আধ পোয়াটাক মিছরি, এক পোয়াটাক জলে ভিজিয়ে রাখ্‌বেন। তার পর ঘণ্টা দুই পরে তাতে কিছু লেবুর রস সংযোগ ক'রে আজ বার দুই খাওয়াবেন।

নঃ সাঃ। এ কি মিছরীর সর্‌বত না কি ?

কালু। যা বল্‌ছি, করুন না। মিছে জেঠামি করেন কেন ? বলে—যার কর্ম্ম তাকে সাজে, অন্য লোকে লাঠী বাজে। আমি অন্য কবিরাজের মত র'য়ে স'য়ে রোগ আরাম করি না। আমার কাছে এক কোপে সাবাড়।

নঃ সাঃ। যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞা। তাই হবে। আপনার দর্শনী টাকা নিন।

কালু। (টাকা লইয়া) আমি আবার সন্ধ্যার সময় এসে দেখে যাব। (পরিচারিকাকে দেখিয়া) কিন্তু দেখুন—এই যুবতীটীর কঠিন পীড়া হয়েছে। এঁরও কিছু চিকিৎসা কর্‌তে হচ্ছে। ওগো তুমি এদিকে এস তো।

পরিচা। না না না। আমি বেস আছি। আমার কোন রোগ নাই।

কালু। আমিও তো তাই বল্‌ছি। একেবারে রোগ না থাকাই তো রোগের লক্ষণ। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—"নীরুজস্যৌষধং পথ্যং ব্যাধিতস্য কিমৌষধৈঃ" নীরোগীকে ঔষধ দিবে। রোগীকে ঔষধ দিয়ে লাভ কি? "নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং?

নঃ সাঃ। ঠিক ঠিক। আপনি এর কি ব্যবস্থা করেন?

কালু। আমি এঁর ঘাড়ে গোটা কতক জোঁক বসিয়ে দি। আর এঁকে একটা বিরেচক ঔষধ দি।

পরিচা। আমার অসুখ নাই বিসুখ নাই, ঘাড়ে জোঁক বসারে কি গা! আঃ মর, মিন্‌সে পাগল নাকি?

কালু। ওগো শোন। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—"ত্রিস্য দিবস্য মধ্যে তব সঙ্কটং ব্যাধিং উৎপত্তিষ্যতি। অতএব রোগস্য পূর্ব্বে রোগশান্তি কর্ত্তব্য" অর্থাৎ তিন দিন মধ্যে হবে রোগের সঞ্চার। ভাল চাও এই বেলা কর প্রতীকার।

পরিচারিকা। তা বাবু ওষুধ দাও, আমি খাব। কিন্তু জোঁক বসাতে দিব না। তা মরি, আর বাঁচি।

কালু। তা এই এক সপ্তাহের ঔষধ নাও। এর দাম চারি টাকা। অসমর্থ পক্ষে দু টাকা।

পরিচারিকা। এ ওষুধের নাম কি?

কালু। সর্ব্বব্যাধি-গজশার্দ্দূল। (টাকা দিয়া দাসী ও নবাবপুত্রীর প্রস্থান)।

কালু। (নবাব সাহেবের প্রতি) দেখুন নবাব! মহাকবি কালিদাস বলেছেন—শরীরং ব্যাধিমন্দিরং অর্থাৎ আপনার শরীরে অনেক রোগ বাস করেছে। অতএব আপনার জন্য আমি একটা ঔষধের ব্যবস্থা করি, আমার বড় ইচ্ছা।

নঃ সাঃ। হোঃ হোঃ হোঃ। আমার এত বয়স হ'ল, কবিরাজ ডাক্তারের মুখে আমি বরাবর প্রস্রাব করে দিয়েছি।

কালু। হাঁ হাঁ। তা বেস, তা বেস। তবে আমি এক্ষণে "বিদায়ো ভবামি"। অন্যত্র রোগিণাং তথা টাকানাঞ্চ অনুসন্ধানং কর্ত্তব্যঃ। মহাকবি

কালিদাস বলেছেন, "যেন তেন প্রকারেণ স্বোদরং পরিপূরয়েৎ।" অতএব বিলম্বে কার্য্যহানিঃ স্যাৎ। (কালুর প্রস্থান)।

নঃ সাঃ। লোকটা কবিরাজ ভাল। কিন্তু একটু পাগলের ছিট আছে।

অষ্টম দৃশ্য।—রাজপথ।

হোঃ আঃ। (স্বগত) প্রিয়ে নুরজাহান! আমি তোমার যন্ত্রণা অনুভব করি না বলিয়া, তুমি অকারণে আমাকে অনুযোগ করিয়াছ। আমি নিজের যন্ত্রণা দ্বারাই তোমার যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করি, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। একে তো তোমার পিত্রাজ্ঞা। তাহাতে তোমার পিতা যাঁহাকে তোমার বর মনোনীত করিয়াছেন, তিনি ধনী। তুমি কি এ অভাগার জন্য এত ধন, এত সম্মান উপেক্ষা করিতে পারিবে? তোমার কোমল শরীরে আর কত কাল তুমি এ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিবে? হায়! কেন আমি বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইয়াছিলাম! দরিদ্রের এ সুখ-স্বপ্ন কেন?

দীন-হীন-মনে কেন সুখাশা উদিত হয়?
কে বল শুনেছে কবে অমানিশায় চন্দ্রোদয়॥
সংসারের সুখ যাহা, ধনবানে ভুঞ্জে তাহা
দরিদ্রের মন-আশা মনেতে পায় বিলয়।
মূর্খ পাপী ধনী যিনি, সবার মান্য গণ্য তিনি
নির্ধন পণ্ডিত জ্ঞানী সদা নিন্দার আলয়॥
কুরূপা ধনীর কন্যা, রূপে গুণে হয় ধন্যা
সুরূপা দরিদ্র-বালা কারও নাহি মনে লয়।
সতী নারী ধন-বলে, পতি-পুত্র সব ভুলে,
এ ধনে বঞ্চিত যারা, মৃত্যু তাদের আশ্রয়॥

এখন মৃত্যুই আমার আশ্রয়। দেখি কিসে কি হয়?

কালু কবিরাজের প্রবেশ।

কালু। (টাকা গুণিতে গুণিতে) কবিরাজী ব্যবসা মন্দ নয়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সাত টাকা রোজগার। (এক দুই তিন চারি করিয়া টাকা গুণিতে গুণিতে) এই রকম যদি চলে—

হোঃ আঃ। কবিরাজ মশাই। আমি অনেক ক্ষণ অবধি আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি। আমার কিছু সাহায্য আপনাকে কর্‌তে হবে।

কালু। (হোসেন আলির নাড়ী দেখিয়া) উঃ কি ভয়ানক রোগ! নাড়ী যেন তরঙ্গ খেল্‌ছে। তা তুমি বিছানায় পড়ে' থাকগে। আমি ঔষধের ব্যবস্থা করছি। আমার দর্শনী দু টাকা। ওষুধের দাম দু টাকা, পাল্কী ভাড়া এক টাকা, পান তামাক চারি আনা—একুনে পাঁচ টাকা চারি আনা।

হোঃ আঃ। হাঃ হাঃ হাঃ। কবিরাজ মশাই! আপনার ভুল হয়েছে। আমার কোন পীড়াই হয় নাই, আমি বেশ আছি।

কালু। তুমি কোথাকার বেল্লিক। আমি কবিরাজ। আমি তোমার শরীরের অবস্থা বুঝি না, আর তুমি বোঝ? ছোঁড়াগুলো সব হ'ল কি?

হোঃ আঃ। আমার ব্যাধি আছে বটে। কিন্তু সে প্রেম-জ্বর। আপনি যে নবাব-পুত্রীকে এখনই দেখে এলেন, তিনিই আমার প্রণয়িনী। আপনি যদি আমাদের মিলন ক'রে দিতে পারেন, তা হ'লেই আমি ব্যাধিমুক্ত হই।

কালু। বটে। এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমি কালাচাঁদ কবিরাজ। আমাকে বলে, দালালী কর্‌তে। বলি, ওহে বাপু! আমাকে তুমি ঘটক ঠাওরালে?

হোঃ আঃ। মশাই! আপনার পায়ে পড়ি। এত গোল করবেন না।

কালু। গোল করব না। একশ বার করব। যত বড় মুখ, তত বড় কথা। বে-মজলিস্, বেআদব, বে-ইজ্জত, বে—।

হোঃ আঃ। আপনার পায়ে পড়ি, গোল করবেন না। গোল করলে সব মাটী হবে।

কালু। এত বড় তেজ, এত বড় বুকের পাটা। (হোসেন আলির কুড়ি টাকা দান) (টাকা লইয়া) হুঁঃ আমি তোমাকে কিছু বলি নাই। কিন্তু এমন লোক অনেক আছে, যারা মানুষ চিন্‌তে পারে না। আর—যা নয়, তা বল্‌লে, মানুষের রাগও হতে পারে।

হোঃ আঃ। মশাই! আমার ঘাট হয়েছে, মাপ করুন।

কালু। ঘাট কি? দোষ কি? মাপ কি? আমার নিকট কি সাহায্য চাচ্ছিলে, বল না কেন?

হোঃ আঃ। মশাই শুনুন। নবাবপুত্রীর রোগের বিবরণ সব মিথ্যা।

নুরজাহান আমাকে ভালবাসে. আর আমিও তাকে ভালবাসি। কিন্তু নবাব সাহেব যে পাত্র ঠিক্ করেছেন, নুরজাহান তাকে বিবাহ করতে চায় না। তাই এই একটা ফন্দী ক'রে বিয়েটা স্থগিত রাখ্তে চেষ্টা করছে।

কালু। 'হুঁ। আচ্ছা, তুমি আমার ছাত্র সাজ্তে পার ?

হোঃ আঃ। নবাব সাহেব আমাকে ভাল চেনেন না। আমি ছদ্মবেশে তাঁকে অক্লেশেই ভোগা দিতে পারি।

কালু। তবে শীঘ্র আমার ছাত্র সেজে এস। আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছি। (হোসেন আলির প্রস্থান) (একটা লোককে আসিতে দেখিয়া। এ কি আর একটা রোগী আস্‌ছে না কি। কালিদাস বলেছেন— "অমৃতং শিশিরে বহ্নিঃ শত্রুঞ্চ গৃহমাগতং"।

নবম দৃশ্য।—কালু, ফিকির উল্লা ও গোকুল।

কালু। বাঃ বাঃ বাঃ—বাহা রে আমি। আর কি আমাকে মেরে' ধরে' কবিরাজ বানাতে হবে। এক বছরের রোজগার এক দিনে। এখন আমাকে মেরে ফেল্লেও আমি বল্‌ব না, আমি কবিরাজ নই।

ফিকির উল্লা। (গোকুলের প্রতি) তোমার কিছু ভয় নাই। যদি ও কবিরাজী কর্‌তে না চায়, আমি ওকে বেস দু চার ঘা উত্তম মধ্যম দিব। তা হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। (কালুর প্রতি) কবিরাজ মশাই! আমি আপনার এক জন রোগী এনেছি।

গোকুল। আমার স্ত্রী, আজ ছ মাস শয্যাগত হয়ে আছে। আপনি যদি তাকে একটু অনুগ্রহ—

কালু। (গম্ভীর ভাবে) কেন তোমার স্ত্রীর কি হয়েছে ?

গোকুল। মশাই! আমি কবিরাজ ডাক্তার অনেক দেখিয়েছি। তা কেউ বলে উদরী, কেউ বলে মিরগী (মৃগী রোগ), কেউ বলে উপর বাউ, কেউ বলে অন্তর বিদ্ধি, কেউ বলে—।

কালু। রোগের লক্ষণ গুলো কিছু বল্‌তে পার ?

গোকুল। মশাই! কেবল বাগুিল খেতে চায়। আর কিছু খাবে না, কেবল ঐ বাগুিল ঢাল্‌বে, আর খাবে। আর দেখুন, গা-গুলো ফুলে থামের মত হয়েছে। আর পা-গুলো যে ঠাণ্ডা গো যেন পাথর।

কালু। আ রে বাজে বক্‌ছ কেন। কাজের কথা কি তাই বল ?

গোকুল। কাজের কথা আর কি ? আপনার পায়ে আমার স্ত্রীকে ফেলে দিলুম। আপনি যা ইচ্ছা হয়, করুন।

কালু। আ রে তুমি কি বক্‌ছ। আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।

ফিকির। (দুইটী টাকা দিয়া) ওর স্ত্রীর অসুখ। ও দুটী টাকা এনেছে, আপনাকে তিকিচ্ছা করতে হবে।

কালু। হুঁ এখন বুঝ্‌লাম। ভাগ্যে এই বুদ্ধিমান্ লোকটী ছিল। তুমি বল্‌ছ, তোমার স্ত্রীর উদরী হয়েছে।

গোকুল। আজ্ঞে।

কালু। তোমার স্ত্রী সর্ব্বদা ব্রাণ্ডি খেতে চায় ?

গোকুল। আজ্ঞে।

কালু। হুঁ। যত ব্রাণ্ডি খেতে চায়, তাকে ততই দেবে। আর ওকে খানিকটে চা খড়ির গুঁড়ো খাইয়ে দিও। চা খড়িতে, পেটের জল শুষে খাবে।

গোকুল। আজ্ঞে।

কালু। আজ্ঞে বল্‌ছ কেন ? বোকা মেড়া। যা বল্‌লাম, করগে।

গোকুল। আজ্ঞে।

কালু। আর তোমার স্ত্রীর যখন প্রাণত্যাগ হবে, তখন তাকে বাব্‌লা কাঠ দিয়ে পুড়িও। বাব্‌লা কাঠের বড় শোষণী শক্তি। যেন শোষক কাগজ !

গোকুল। আজ্ঞে।

কালু। তা এখন যাও। আমিও যাই। (সকলের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য।—কালু ও সুন্দরী।

সুন্দরী। (স্বগত) আমার এ যে শিব গড়তে বাঁদর গড়া হ'ল। আমি কি শেষ-কালে সোয়ামীটী হারালুম নাকি ?

কালু। (স্বগত) কবিরাজীতে টাকা কড়ি ত পাচ্ছি। কিন্তু শেষকালে কি পত্নীটী হারালুম নাকি ? (সুন্দরীকে দেখিয়া) ঐ না আমার কালামুখী।

সুন্দরী। (স্বগত) চুলোমুখো মার্‌ত ধর্‌ত বটে, কিন্তু বড় কাজের লোক

ছিল। যেমন—"মাব্‌ত ধর্‌ত, তেমনই কত, আর ডাক্‌ত আদর ক'রে।" এখন সেই আমার এক বিনে জগৎ অন্ধকার।

যদি বলতে হল মনের কথা বলি শোন তাই
(আমার) সভ্য ভব্য শিষ্ট-শান্ত পতিতে কাজ নাই।
আস্তে আস্তে রাস্তা চলে, সরু সরু কথা বলে
মিটির মিটির চাউনী চলে, সে সোয়ামীর মুখে ছাই।
মৃদু মধুর হাঁসিটী মুখে, মিছরীর ছুরী মারে বুকে
কথায় যেন স্বর্গে বসায়, কাজের বেলায় ঢপরঢাঁই।
আমার উনি গোঁয়ার বটে, হাঁকে ডাকে গগন ফাটে,
রাগের চোটে মারে পেটে, মনে কিন্তু খলকপট নাই।
মিষ্ট কথায় মন ভেজায় না, কাজ করে কিন্তু ষোল আনা
দেখো দেবতা! জন্মে জন্মে তারেই যেন পতি পাই।

কালু। (স্বগত) আঃ ম'লঃ। এটা এখানে মরতে এল কেন? একে যদি দু একটা রমক-সই বড়ী টড়ী খাওয়াতে পারি, তবেই আমার কবিরাজীটা সার্থক হয়। বাঙাল সাজ্‌তে হল। (প্রকাশ্যে) ও গো, তোমার আতকান দেওত নারী দেহি।

সুন্দরী। তুই আমার নাড়ী দেখ্‌বি কেন রে মিন্সে?

কালু। আমার নাম হোন নি। আমি হাবারের আয়চরণ কবিরাজ। আমি রুগীর নারী দেহি।

সুন্দরী। আমি রুগী নই রে বাপু! আমি রুগী নই।

কালু। রুগী নই কইলে অইব কি? তুমি বিছানায় হোও গিয়া। আর এই বরীটা বক্ষণ কর। তোমার হরীলে অনেক ব্যাধি আইছে। (সুন্দরীর হস্ত ধারণ)।

সুন্দরী। হাত ছাড় মিন্সে। নইলে আমি তোর মাথাটা কাঁচা খাব। (হাত ছাড়াইবার চেষ্টা)।

কালু। করাকারি কর ক্যান? তোমারে বরী কাইতেই অইব।

সুন্দরী। আমি ও বরী কামু না।

কালু। (একটু ভোগা দিতে হ'ল) আরে হোনই না।

সুন্দরী। আচ্ছা, আমি তোমার বড়ী খাব।

কালু। আর একটা কাম কর্‌বার অইব। তোমারে হিথায়ে দিমু।

সুন্দরী। (কালুকে নিরীক্ষণ করিয়া) (স্বগত) আঃ মল! এ যে আমারই চুলোমুখো। ভাগ্যিস, এখুনি এখুনি বুঝ্‌তে পেরেছি। (প্রকাশ্যে) আমাকে আর কি কর্‌তে হবে?

কালু। আঃ আমি কি ভাগ্যবান্। এমন সতী স্ত্রী যার, সে স্বর্গ-সুখে সুখী। প্রিয়ে প্রাণাধিকে! আমিই তোমার কালু। আমিই তোমার স্বামী।

সুন্দরী। (বিস্ময়ের ভাণ করিয়া) আঁ আঁ—।

কালু। সুন্দরী! তুমি স্ত্রীরত্ন। তোমার তুল্য সতী রমণী এ জগতে কলিকালে নাই। (আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য)

সুন্দরী। তুমি? তুমি? ও সব টাকা কার?

কালু। আমার।

সুন্দরী। তোমার! তবে আমায় দাও তো।

কালু। এই নাও।

সুন্দরী। তোমার আর টাকা আছে?

কালু। এখন আর নাই। কিন্তু শীঘ্রই আবার হাজার টাকা পাব। এর মধ্যে যে কত কি অদ্ভুত ঘটনা হয়ে গেছে, তা তুমি কিছু জান না।

সুন্দরী। তাই তো! আমিই তোমাকে কবিরাজ বানাইয়ে দিলাম। তুমি আমাকে যেমন মেরেছিলে, আমিও তোমাকে তেমনই মার খাইয়ে কবিরাজ বানিয়ে দিয়েছি।

কালু। বটে বটে—তোমা হতেই আমি এই মার খেয়েছি?

সুন্দরী। মার খেয়েছ বটে, কিন্তু এ যে বিপরীতে হিত হয়ে গেছে।

কালু। প্রিয়তমে প্রাণাধিকে! তুমি আমার অত্যন্ত উপকার করেছ। আমি যদি পারি তো যথাসাধ্য এর প্রত্যুপকার কর্‌ব। কিন্তু চুপ কর, ঐ এক জন রুগী আস্‌ছে।

দশম দৃশ্য।—কালু ও পাঁচকড়ি কবিরাজ।

পাঁচকড়ি। আপনিই কি নবাগত দেশবিশ্রুত মূক-চিকিৎসক?

কালু। আজ্ঞে।

পাঁচকড়ি। ভবৎসকাশে মদীয় প্রার্থনা যে, আপনি আমার একটা রোগের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

কালু। দেখি তোমার নাড়ী।

পাঁচকড়ি। আমি নিজের জন্য আপনার ব্যবস্থা চাই না। আমিও নিজে চিকিৎসা-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী। আমি উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকি। সম্প্রতি আমার এক জন রোগী এসেছে, আমি তাকে কোন মতেই কথা কওয়াতে পার্‌ছি না।

কালু। আমি তাঁকে কথা কওয়াব।

পাঁচকড়ি। তা হ'লে আপনার তুষার-ধবল বিমল যশোরাশি চতুর্দ্দিকে আরও বিকীর্ণ হইবে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় ধন্য হলেম।

কালু। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায়, আমিও ধন্য হলেম। ঐ যে স্ত্রীলোকটা দেখ্‌ছেন, ওর এক রূপ অদ্ভুত উন্মাদ-রোগ হয়েছে, ও যাকে দেখে, তাকেই স্বামী বলে' সম্বোধন করে। আপনি যদি ওকে আপনার চিকিৎসালয়ে ল'য়ে যান—

পাঁচকড়ি। তা যাব বৈ কি। অবশ্য যাব।

কালু। ওকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সর্ব্বপ্রথমে ওর ঘাড়ে গোটা কুড়িক জোঁক বসিয়ে দিবেন। তার পর ওর চুলগুলি সব কেটে নেড়া করে' দিবেন। তার পর, ওকে দিন দু বার করে' বেত মারবেন। ওকে এক মুঠো ভাত, আর এক হাতা ডাল, বৈ আর কিছুই খেতে দিবেন না।

পাঁচকড়ি। মশাই! যা বল্‌বেন, তার কি আর কিছু অন্যথা হবে? আপনার ব্যবস্থাও অতি সমীচীন ব'লে বোধ হচ্ছে। এতে রোগীর প্রতি অত্যাচার নাই বল্‌লেই হয়। এতে উপকারের সম্ভাবনা। (সুন্দরীর প্রবেশ)

কালু। (সুন্দরীর প্রতি) তা তুমি এখন এঁর সঙ্গে আমার বাসায় যাও। মশাই! দেখ্‌বেন, এঁকে যেন বিশেষ সাবধানে রাখা হয়।

পাঁচকড়ি। আপনি যা যা বলেছেন, সেই মত সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হবে।

সুন্দরী। (কালুর প্রতি) নাথ! ঢের ঢের পাগল দেখেছি, এমন অদ্ভুত পাগল তো কখনও দেখি নি। ভগবানের সৃষ্টিতে কত রকমই দেখ্‌ছি, আর কত রকমই দেখ্‌ব।

একাদশ দৃশ্য।—কালু ও হোসেন আলি।

কালু। মেয়ে হ'য়ে পুরুষের সঙ্গে বাদ! মজাটা টের পাবেন এখন। আমাদের রঘু দাদা গাইত—পুরুষ যেমন মেয়ে তেমন নয়। (হোসেন আলির প্রবেশ)। কে হে তুমি?

হোঃ আঃ। আমি আপনার ছাত্র। কেমন সেজেছি?

কালু। হাঃ হাঃ, বেড়ে সেজেছ। আমি যেমন, তুমি আমার তদুপযুক্ত ছাত্র। না হবেই বা কেন? মহাকবি কালিদাস বলেছেন—"যদ্যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েৎ"।

হোঃ আঃ। মশাই! কবিরাজী করতে হ'লে বড় বড় কথা বল্‌তে হয়। আমি তো সংস্কৃত জানি নে। তবে এর উপায় কি হবে?

কালু। আমার কাছে থাক্‌তে থাক্‌তেই শিখ্‌বে। তুমি এক দিনেই গুরুমারা বিদ্যে শিখে' আমার অন্ন মার্‌তে চাও না কি?

হোঃ আঃ। আজ্ঞে না, আজ্ঞে না।

কালু। তবে চল। এগোও। না না, আমার পেঁছনে এস। আগে যাবে কবিরাজ, তবে যাবে তার ছাত্র।

দ্বাদশ দৃশ্য।—নবাব, নুরজাহান, পরিচারিকা, কালু ও হোসেন আলি।

নঃ সাঃ। নুরজাহানের এখনও কথা ফুট্‌ছে না।

পরি। কথা ফোটা দূরে থাক, আগে যে একটু আধটু আঁউ মাঁউ কর্‌ত, এখন তাও বন্ধ হ'য়ে গেছে।

নঃ সাঃ। (আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এই তো প্রায় সন্ধ্যা হ'ল। এখনই কবিরাজের আস্‌বার কথা আছে। ঐ না কবিরাজ আস্‌ছে। (কবিরাজের প্রতি) আসুন আসুন মশায়! আস্‌তে আজ্ঞা হোক।

কালু। মশাই! আমার রুগী কেমন?

নঃ সাঃ। আপনার ওষুধ খাওয়ানর পর থেকে ক্রমশঃ আরও খারাপ হয়ে পড়্‌ছে।

কালু। সে তো ভালই হয়েছে। মহাকবি কালিদাস বলেছেন, "অগ্রে তু বর্দ্ধনং শুভং", রোগটা আগে যদি বেড়ে যায়, তবে সে একটা শুভ লক্ষণ।

নঃ সাঃ। আপনার সঙ্গে এ যুবকটী কে?

কালু। ও আমার ছাত্র দামোদর। ওহে দামোদর! আমি যে গান ব্যবস্থা করেছি, সে গান এখনই আমার রুগীকে শোনাও।

নঃ সাঃ। গান ব্যবস্থা! সে কি কবিরাজ মশায়?

কালু। গান—মশাই গান। এমন চম্‌কে ওঠেন কেন? আপনি কি শোনেন নি—"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা" গানের তুল্য ঔষধ নাই। আর দেখুন, কবিরাজের ব্যবস্থার সঙ্গে কষ্টি নষ্টি কর্‌বেন না, তাতে ঔষধে ফল হয় না। আমার এ গান শুন্‌লে বোবা তো বোবা, এমন কি গাছ পাথর পর্য্যন্ত কথা কয়। আর এ গান, বোবায় শুন্‌লে কথা কয়। কিন্তু যে কথা কইতে পারে, সে যদি এ গান শোনে, তবে সে বোবা হয়। অতএব চলুন, একটু দূরে গিয়ে আমরা কথাবার্ত্তা কই। দেখ দামোদর! রোগীর কানের কাছে খুব আস্তে আস্তে গান শোনাবে। যেন আর কেউ শুন্‌তে না পায়। (কালু ও নবাব সাহেবের দূরে অবস্থিতি)

হোঃ আঃ।—

তব প্রেম-আশে, অসীম সাহসে, আসিয়াছি প্রিয়ে, তোমার কাছে।
এই অভাগায়, হইও হে সহায়, তুমি বৈ আমার আর কে আছে॥
নবাব-ঝিয়ারী, বরিবে ভিখারী, এ নহে সম্ভব, জানি হে মনে।
(কিন্তু) মন নাহি মানে, ধায় তোমা পানে, শরণ লইনু, তোমার চরণে॥
করি অনুনয়, হও হে সদয়, রাখ কিম্বা মার, যে লয় মতি।
এ জানিও মনে, জীবনে মরণে তুমি হে আমার গতি॥

মুঃ জাঃ। তুমি কি হোসেন?

হোঃ আঃ। আমিই সেই হতভাগ্য।

পরিচারিকা। সকলেই গান করে, নাচে। আমি একা ফাঁক যাই কেন?

তোমরা দেখ চেয়ে ও সখী! আজি কেমন ভাবোদয়।
একটা সোণার বরণ যোগী এসে কেমন ভাবে চায়॥
আহা! কি জন্যে ওর দু নয়নে জল-ধারা বয়।
আমি ওরে চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি ও এল কোন্ ছলে।
আহা কি জন্যে ওর দু নয়নে দশ-ধারা বয়।

নঃ সাঃ। আমার পরিচারিকা উন্মত্তার মত নাচ্‌ছে—গান কর্‌ছে কেন?

কালু। ওষুধ ধরে আস্‌ছে। আপনি দেখ্‌বেন, অগৌণে আপনার মেয়েও ঐরূপ নাচ্‌বে—গাইবে। কিন্তু দেখুন, স্ত্রীলোক আরাম করা অপেক্ষা পুরুষ আরাম আরও কঠিন। এর কারণ কি? মশাই! আমার কথাটায় একটু মনোযোগ দিন।

(পরিচারিকার হস্ত ধরিয়া নুরজাহানের নৃত্য ও গীত)।

আমার মন মানে না সখী! আমি কি করি।
আমি মনে প্রাণে তারই স্নেহে বাঁধা হয়ে রয়েছি।
আগু পাছু না ভাবিয়া, কুল মান তেয়াগিয়া,
আমি নিজপ্রাণ হাতে তুলে' তারই হাতে সঁপেছি।

(কীর্ত্তনের সুরে)।

এখন ঘুচিল নীবীর বন্ধন, শিথিল কবরী,
এখনও এল না কেন বাঁকা বংশীধারী॥
এ প্রাণ রাখ্‌ব না রাখ্‌ব না—
কিবা তমাল-বল্লরী গল বেড়ি' বাঁধব
আন সখী! ভখিব গরল।

পরিচারিকা। বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের। রাই আমাদের, রাই আমাদের, আমরা রেয়ের, রাই আমাদের।

নঃ সাঃ। কবিরাজ মশাই! এ সব আবার কি উপসর্গ হ'ল?

কালু। আজ্ঞে এটা ওষুধের ধর্ম্ম। প্রথমে হ'ল রক্তের তারল্য, তাতে করে' হ'ল মনের চাঞ্চল্য, তাতে ক'রে হ'ল ইন্দ্রিয়ের চাপল্য, তাতে করে' হ'ল বাক্যের প্রাবল্য। এখন বিদায়ের সাফল্য হ'লেই সকল দিকে জাজ্বল্য হয়।

নঃ সাঃ। তা অবশ্য হবে। আপনি অতি দুঃসাধ্য রোগ আরাম করেছেন।

কালু। আমায় এ রোগে অনেক পরিশ্রম কর্‌তে হয়েছে।

নঃ সাঃ। আপনাকে আমি সন্তুষ্ট কর্‌ব। নুরজাহান! এদিকে এস।

নুর। (নবাব সাহেবের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) "বাবা! দে আমার বিয়ে"। বাবা! আমি হোসেন আলিকে বিবাহ কর্‌ব। আমি এখনই এই দণ্ডে

এই মুহূর্ত্তে তাকে বিবাহ কর্‌ব। কারুর কথা শুন্‌ব না, কারুর নিষেধ মান্‌ব না। "লোকে বলে বল্‌বে মন্দ, আমি কারুর কথা শুন্‌ব না।"

নঃ সাঃ। সে কি মা? দেখ—

মুর। আমি দেখ্‌তে চাই না, শুন্‌তে চাই না, জান্‌তে চাই না, মান্‌তে চাই না। আমি হোসেনকে বিয়ে কর্‌ব। কর্‌ক কর্‌ব কর্‌ব। (নবাব সাহেবের হাত ধরিয়া চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ) বল—কর্‌বি কর্‌বি কর্‌বি। তোমাকে বল্‌তেই হবে, তোমাকে বিয়ে দিতেই হবে। আমি ছাড়ব না, ছাড়ব না, ছাড়ব না।

নঃ সাঃ। আমি—

মুঃ জাঃ। আমি কে? তুমি কে? ওকে? সে কে? তুই কে? এরা কে? (দর্শকদিগের প্রতি) তোরা কে? তারা কে? আমি হোসেনকে বিয়ে কর্‌ব কর্‌ব কর্‌ব। (নবাব সাহেবের চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য)।

নঃ সাঃ। আমি তোমার ভাল জায়গায় সম্বন্ধ স্থির করেছি।

মুঃ জাঃ। আমি বিষ খাব। আমি আফিঙ্‌ খাব। আমি গাঁজা খাব। আমি গুলি খাব। আমি ভাঙ্‌ খাব। আমি মদ খাব। আমি নাচ্‌ব (নৃত্য)। আমি গাইব (গান)। আমি হাস্‌ব (হাস্য)। আমি কাঁদ্‌ব (ক্রন্দন)। আমি বাড়ী থেকে চ'লে যাব। (নৃত্য)।

কালু। কেমন মশাই! আপনার মেয়ের যে কথা ফুটেছে, তাতে বোধ হয়, আপনার আর কোন সন্দেহ নাই।

নঃ সাঃ। কবিরাজ মশাই! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি বিটীকে আবার বোবা করে' দিন।

কালু। তা আমার সাধ্যাতীত। আপনি যদি বলেন, আমি আপনাকে কালা করে' দিতে পারি।

নঃ সাঃ। কবিরাজ মশাই! এ কি হ'ল? যদি বোবা সারিল, তবে উন্মাদ হল। এর চেয়ে যে চির কাল বোবা থাকা ছিল ভাল।

কালু। আপনি একটু স্থির হ'ন, আমি সব আরাম করে দিচ্ছি। দামোদর! এদিকে এস, তুমি এই রোগীটাকে ঐ উদ্যান-বাটিকায় লইয়া যাও। সেখানে অতি গোপনে ইহাকে আমার দ্বিতীয় গানটী শোনাবে। গান

শুন্‌লেই ওঁর নিদ্রা আস্‌বে। দুই ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট পরে ওঁর নিদ্রা ভাঙিয়া ওঁকে এখানে আন্‌বে। যাও যাও, শীঘ্র যাও। বিলম্ব কর্‌লে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—"অগ্রে পাদচারণং পরে শকটারোহণং পরে দক্ষিণাভিমুখে পলায়নং" শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুঃ জাঃ। বিধি বুঝি মিলাইল কূল এত দিনে।

চল সখী ত্বরা করি' হেরি গে প্রাণেরই হরি

বংশীবট-মূলে সেই ত্রিভঙ্গ বংশীবদনে।

যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে

তাহা আহা লঙ্ঘিব কেমনে॥

ত্রয়োদশ দৃশ্য।—কালু, নবাব সাহেব ও সুন্দরী।

নঃ সাঃ। মশাই! আপনি "পলায়নং" বলে যে একটা কি ঔষধ ব্যবস্থা কর্‌লেন, তার তো মানে আমি কিছু বুঝতে পার্‌লেম না।

কালু। আপনি যদি সব বুঝতে পার্‌তেন, তা হ'লে তো আপনিই কবিরাজ হ'য়ে যেতেন। আমাকে ডাক্‌বার অপেক্ষা থাক্‌ত না।

নঃ সাঃ। যা হোক, আমার মেয়েটা যে বেজায় মুখরা হ'য়ে উঠ্‌ল।

কালু। মশাই! মেয়েছেলে একটু মুখরা প্রখরা খর্‌খরা হ'য়েই থাকে।

নঃ সাঃ। মশাই! আশ্চর্য্যের কথা বল্‌ব কি, মেয়েটা হোসেন আলিকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে।

কালু। মশাই! শরীরের মধ্যে রক্তাধিক্য হ'লেই প্রণয়টা কিছু প্রচণ্ড উদ্ভ্রান্ত বিদ্ধকূট (যাকে বাঙ্‌লায় বিধকূটে বলে) হ'য়ে পড়ে।

নঃ সাঃ। কিন্তু আমি এ বিয়ে হতে দিচ্ছি না। আমি একথা শুনে' অবধি আমার মেয়েকে একটা ঘরে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম।

কালু। সে ভালই করেছিলেন। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—"অঙ্কে স্থিতাপি যুবতী পরিরক্ষণীয়া"।

নঃ সাঃ। আরও দেখুন, আমি ওদের দু জনকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করে' রেখেছি। কারণ, ঘৃত ও অগ্নি একত্র থাক্‌লে গল্‌বারই কথা। যদি সর্ব্বদা ওদের দেখা শোনা হ'ত, তবে চাই কি সুরজাহান বাড়ী ছেড়ে ওর সঙ্গে পালাতেও পার্‌ত।

কালু। কি যে হ'ত, কি যে হচ্ছে, আর কি যে হবে, তা কি কেউ বল্‌তে পারে?

নঃ সাঃ। সকল কাজেই কৌশল আছে। মেয়েছেলে শাসনে রাখা বড় শক্ত কাজ। এ কাজ কি সকলে পারে? আপনার বড়াই আপনাকে কর্‌তে নাই। কিন্তু আমি যে করে' আমার মেয়েকে শাসনে রেখেছি, তা মনে হ'লে আমি আপনাকে প্রশংসা না করে' থাক্‌তে পারি না। ভেবা গঙ্গারাম বাপের হাতে পড়্‌লে, মেয়েটা এত দিনে হয় তো বাড়ীর বাহির হ'ত।

কালু। (স্বগত) এখনও যে যাবে না, তা কে বল্‌লে?

(সুন্দরীর প্রবেশ) সেই জুয়াচোর বদমায়েস পাজি নচ্ছার ভণ্ড কবিরাজটা কৈ?

কালু। বাবা! এ আবার কে? কি হয়েছে গো, কি হয়েছে?

সুন্দরী। (কালুর হাত ধরিয়া) এই যে পোড়ার মুখো মিন্সে। বলি, তোর কি একটু দয়া মায়া নাই? তুই আমাকে একেবারে খুন কর্‌তে চাস।

কালু। রাধে রাধে রাধে! এ পাগলীটা আবার এখানে কোথা হ'তে জুট্‌ল।

নঃ সাঃ। এ স্ত্রীলোকটা পাগল? আহা হা। কবিরাজ মশাই! আমার অনুরোধ, আপনি এর চিকিৎসা করুন।

কালু। আপনি আমার টাকা দেবেন বলুন, আমি এখনই একে আরাম করে দিচ্ছি।

সুন্দরী। আমি তোকে আরাম করে দিচ্ছি। তুই একটু থাম। (নবাব সাহেবের প্রতি) মশাই! এ কালু কাঠুরে। আর যে লোকটা এর ছাত্র সেজে এসেছিল, সেই হোসেন আলি। এরই চক্রান্তে আপনার কন্যা হোসেন আলির সঙ্গে পলায়ন করবে। এরা দু জনে যখন ঐ সব ষড়যন্ত্র করে, তখন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সব শুনেছিলাম।

কালু। মশাই! ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে? (বেগে ফিকির উল্লার প্রবেশ)

ফিকির। নবাব সাহেব সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ। এই বেটা ভণ্ড বর্দ্দি সব সর্ব্বনাশ করেছে। সর্ব্বনাশ করেছে।

নঃ সাঃ। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

ফিকির। আপনার কন্যা, এর ছাত্র দামোদরের ওরফে হোসেন আলির সঙ্গে পালিয়েছে। ঐ বেটাই সব ষড়যন্ত্রের মূল।

নঃ সাঃ। কি আমার সঙ্গে ঠকামি! বাঁধ বেটাকে। মার শালাকে (প্রহার ও বন্ধন) আমি ওকে পুলিপোলাও ঠেলব। আমার মেয়ে চুরি!

ফিকির। কবিরাজ! চল এবার পুলিপোলাও।

কালু। সেখানে আমার ব্যবসাটা চলবে তো?

সুন্দরী। তবে প্রাণকান্ত! তোমাকে কি সত্যি সত্যিই পুলিপোলাও যেতে হ'ল।

কালু। প্রাণাধিকে! দেখতেই তো পাচ্ছ। মুখে ব্যক্ত করে' আর কষ্ট পাও কেন।

সুন্দরী। আহা! কাঠ গুলো কাটা হয়ে রৈল। বাবু আমার ফাড়বার সময় পেলে না।

কালু। প্রিয়ে! তোমার বিরস বদন দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। তুমি এখান হ'তে যাও। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

সুন্দরী। তাও কি হয়। আমি না থাকলে তোমাকে সান্ত্বনা করবে কে? যখন দেখব, তুমি জাহাজে উঠছ, তখন আমি হাতের খাড়ু খুলে মাথার সিঁদুর পুঁছে হাসতে হাসতে (বালাই কাঁদতে কাঁদতে) ঘরে ফিরব।

ও গো তোরা দেখ্‌বি যদি আয়।
আমার কানু ব্রজ ছেড়ে চল্‌ল মথুরায়।

রাখাল ছিলে রাজা হবে, চূড়া খুলে পাক বাঁধিবে
লোহার নুপুর বাজিবে, ঐ রাঙা পায়, (তোমার ঐ রাঙা পায়)
নন্দের বাধা বৈতে হেথা, মাটীর ঝুড়ি বইবে সেথা
আর আর সব ঠিক মিলিবে, পেতেও পার কুবুজায়।

(হোসেন আলি ও নুরজাহানের প্রবেশ)

হোঃ আঃ। মহাশয়! আমি আপনার কন্যাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলাম। কেন না আমি তস্করের ন্যায় আপনার কন্যাকে অপহরণ করিতে ইচ্ছা করি না। ঈশ্বরানুগ্রহে আমার অবস্থারও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন

হইয়াছে। ঢাকাস্থিত আমার মাসীমার মৃত্যু হইয়াছে। আমার মাসীমা আমাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। আমি এক্ষণে লক্ষপতি। এক্ষণে বোধ হয়, আপনি আমাকে নুরজাহানের অযোগ্য পাত্র বিবেচনা করিবেন না।

নঃ সাঃ। বৎস! আমি তোমার শিষ্টাচারে একান্ত পরিতুষ্ট হলেম। তোমাকে আমার কন্যাদান করাতে কোন আপত্তি নাই।

কালু। সমস্তই আমার ঔষধের ধর্ম্ম। এখন দেখিবেন, কস্মিন্ কালেও আপনার কন্যার আর রোগ হইবে না। বিবাহের আগে যে মেয়ে বোবা থাকে, বিবাহের পর তাহার প্রাখর্য্যের সীমা থাকে না।

হোঃ আঃ। কবিরাজ মশাই! আমি আপনার নিকট বিশেষ ঋণী। আমি আপনাকে যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি দান কর্‌ব।

কালু। আপনি আমাকে প্রকৃত পক্ষে কবিরাজ বানিয়ে দিন, আমি ধন-সম্পত্তি কিছুই চাই না।

হোঃ আঃ। তা তো আমি পার্‌ব না। তবে প্রকৃত কবিরাজ হ'লে আপনি যে টাকা উপার্জ্জন করিতে পার্‌তেন, আমি মাসিক তত টাকা আপনাকে দিব।

সুন্দরী। আর আমি? আমিই হলেম সকলের মূল। আমাকে যে কেউ পোঁছে না দেখছি।

নঃ সাঃ। বলি ওহে বাবু কবিরাজ! তুমি ধর্ম্মতঃ আমাকে বলত, তুমি কবিরাজ কি না?

কালু। আমার কবিরাজীর ফল হাতে হাতে দেখছেন। তবু আবার জিজ্ঞাসা করছেন, আমি কবিরাজ কি না?

সুন্দরী। উঃ বাবুর মেজাজ যে বড় গরম হ'য়ে উঠেছে দেখছি।

কালু। দেখ সুন্দরী! এখন আমি ভদ্রলোক। এখন আমি কালাচাঁদ কবিরাজ। এখন আমি তোমার নিকট ভদ্রলোকের ন্যায় ব্যবহার প্রত্যাশা করি।

সুন্দরী। তাই তো গো! এ যে পোঁটাচুন্নির বেটা চন্দন-বিলাস। যদি তোমার এই ছাত্র না জুট্‌ত, তা হ'লে যে পুলিপোলাও যেতে। সে যা'

হোক, আ'জ্ সুখের দিনে আর বিবাদ বিসংবাদে কাজ নাই। এস একটু আমোদ আহ্লাদ করা যাক।

কালু। আঃ মাগী! কি বেহায়া গা। এত গুলো ভদ্রলোক বসে রয়েছে, তোর একটু লজ্জা হচ্ছে না? আমি যে ভদ্রলোক হ'য়ে ভারি বিপদে পড়লাম। আমি দেখছি, আর এই স্ত্রীটাকে শাসন করতে পারব না। এখন থেকে কি আমাকেও ভদ্রলোকের মত পত্নীকে আজ্ঞে আজ্ঞে করতে হবে না কি? তা যদি হয়, তা হ'লে আমি ভদ্র কবিরাজী ছেড়ে' আবার অভদ্র কালু কাঠুরে হব। (দর্শকদের প্রতি) মশাইরা! কি বলেন, ভদ্র স্ত্রৈণ ভাল, কি অভদ্র স্বাধীন ভাল?

সমাপ্ত।

বিসর্জ্জন

জ্যোতির্ম্ময় হৃদয় তোমার
প্রণয়ভূষণে বিভূষিত,
ভক্তির লহরী-লীলা রাশি
সেথায় সতত উছলিত। ১।

সে প্রাণ উদার লীলাময়
কোথা আজ করিল পয়াণ?
কোথাকার গহিন আঁধার
স্পর্শে তার হ'ল জ্যোতিম্মান্? ২।

লক্ষ্য করি' কোন্ সুরপুরী
দেবী! তুমি করিলে গমন,
অস্ফুট অশোক কলি কোথা
ধরিয়াছে প্রফুল্ল আনন? ৩।

আঁধাভরা মরণের পারে
প্রাণের সুঠাম দেহ কার?
নয়ন চসক দিয়া উষা
করেছিল পান বার বার? ৪।

কোন্ সুরপুরী-মাঝে হায়!
প্রাণের অভাব হ'য়েছিল?
তাই বিধি একটী হৃদয়
জগত হইতে হ'রে নিল! ৫।

ঝরে আঁখি বহিয়া কপোল
আকুল আহ্বানে ডাকে প্রাণ,
কোথা কোথা কোথা তুমি দেবী!
কোথা বল তব অবস্থান? ৬।

ত্যজি' দেহ পেয়েছ কি যেতে
প্রাণ-ভাঙা তনয়-সকাশ?
শান্তি শান্তি! শান্তি আসে মনে
বুকজুড়ি' দাঁড়ায় বিশ্বাস। ৭।

অনুপ অমূল্য বাপধন
পেয়েছে কি জননীরে তার?
মায়ে পোয়ে সে অজানা-দেশে
মিলিতে কি পেয়েছে আবার? ৮।

ধূলায় মিশুক কলেবর!
পৃথিবীর কেন্দ্রের সমান
স্নেহ-স্নেহে করি' আকর্ষণ
চিরদিন হ'ক বলীয়ান্। ৯।

চম্পক-বরণী শেফা সোনা
মা'র স্নেহ কে দেখাবে তারে?
কার কোলে কাঙালিনী মেয়ে
মা বলে' ছুটিয়ে যাবে হা রে? ১০।

কার বুকে আছে সে মমতা
কার চোখে আছে এত স্নেহ?
ক্ষুধায় কাঁদিবে যবে বাছা
ব্যথা তার বুঝিবে কি কেহ? ১১।

হায় রে মা-হারা কাঙালিনী!
দেখিতে যে পারি না'ক আর
চির-অবসাদে বিজড়িত
অশ্রু-মাখা বয়ন তোমার। ১২।

চন্দ্র-সূর্য্য সে চলে যায়,
হরষেতে বিশ্ব টল-মল,
কচি মনে হেসে আনন্দ নাই
অবিরল আঁখি ছল ছল। ১৩।

অমন করুণ মুখ-খানি
অমন বিষাদ-ভরা হাস
ছল ছল সুনীল নয়ান,
প্রাণ-ফাটা গভীর নিশ্বাস। ১৪।

আর যে সহিতে নাহি পারি
তাই স্বধু ফেলি অশ্রুজল,
আর দেবী! আকুল আহ্বানে
তোমাকেই ডাকি গো কেবল। ১৫।

কত দিন, কত বর্ষ আহা!
না বুঝিতে পারিয়া তোমায়,
করেছিনু কত অনাদর,
ছেয়েছিনু কত উপেক্ষায়। ১৬।

অয়ি প্রিয়ে জনম-দুখিনী!
ত্যজি' এই দুঃখের জীবন,
পরিহরি দারিদ্র্য-যাতনা
উপনীতা শান্তি নিকেতন! ১৭।

কাঙালিনী! সুখে থাক সেথা
দয়াহীন কঠোর সংসার!
এক রতি করুণার লাগি'
সদা প্রাণ করে হাহাকার। ১৮।

মাতৃস্নেহ পরাণে সৃজিয়া,
ছেলে মেয়ে খগেন্দ্র শেফায়,
মার মত পালিব তাদের
বাঁধিয়া রাখিব মমতায়। ১৯।

প্রবোধ যে নাহি মানে প্রাণ,
বহে শুধু তপ্ত অশ্রুজল,
গেছ তুমি ঢেলে দিয়ে গেছ
প্রাণের ভিতরে হলাহল। ২০।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

ল'য়ে সেই ভুল

Oh ! my offence is rank, it smells to heaven.

Shakespeare.

আসিবার কালে মা গো ! দিয়াছিলে মোরে,
যে ফুল—স্নেহের চিহ্ন—স্নেহ অতুলন ;
ব'লেছিলে, "লও বাছা, দিনু আজ তোরে,
শুভ্র এই পারিজাত—অমর-ভূষণ ;
চলেছ ধরণী-ধাম—সুদূর প্রবাসে,
সকলি তথায় গাঢ়, সকলি কঠিন ;
স্মরিয়া স্বদেশ যবে কাঁদিবে হতাশে,
হ'য়ো স্নিগ্ধ এ প্রসূনে—ক'রো না মলিন"।
মূঢ় আমি,—হেলায়িনু মায়ের সে দান ;
শুখাইল দলে দলে অকলঙ্ক কলি,
নাহি আর সুধা-বাস, নাহি আর অলি,
নিরয়-নিশ্বাসে যেন স্বর্গ-মুখ ম্লান।
কেটেছে কলঙ্ক-কীটে জীবনের ফুল,
কেমনে ফিরিব কাছে ল'য়ে সেই ভুল।

শ্রীহে—মি।

কল্পনা-স্বপন।

Was it a vision, or a waking dream, fled is that music.

Keats.

স্বর্ণ-শতদলে বসি' রমণী-রতন,
সপ্তমে পূরিয়া স্বর গাইছে বীণায় ;
প্রক্ষালি' অমরারাধ্য রাতুল চরণ,
মন্দাকিনী কল-কণ্ঠ সে তানে মিলায়।
আঁধারিয়া শত সূর্য্য লাবণ্য-গরিমা
ঝরে প্রতি লোম-কূপে সঙ্গীতের তালে ;

অথচ সুস্নিগ্ধ শত শারদ চন্দ্রিমা ;
আনন্দ-নন্দন-বায় খেলে কেশ-জালে।
তুমি কি ত্রিদিব-দেবী—দেবতা আমার ?
তুমি কি হৃদয়-রাণী—বীণা-বিধায়িনী ?
সংসারে সর্ব্বার্থ-সার ?—হা অভিমানিনী !
চিনিয়াছি রাঙা পদ—ছাড়িব না আর।
কিন্তু কৈ, গীতধ্বনি—আনন্দ-আনন ?
এ কি এ ?—মায়ার খেলা ?—কল্পনা-স্বপন ?

শ্রীহে—মি।

অধরচন্দ্র।

মেদিনীপুরের একটী খুনী মামলার অনুসন্ধানে আমি প্রায় ১৫ দিন কলিকাতায় ছিলাম না। কল্য সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পঁহুছিয়াছি।

পুলিশের গুপ্তচরগণের শারীরিক পরিশ্রম, রাত্রি-জাগরণ ও জীবন-মরণ, সঙ্কটাবস্থায়ও চোর ডাকাইতের অনুসন্ধান করা যে কত ভয়ানক, তাহা ভুক্তভোগিগণ ভিন্ন আর কেহই অবগত নহেন।

মেদিনীপুরে বহুতর ক্লেশ পাইয়া কেবল কল্য রজনীতে প্রাণ ভরিয়া পালঙ্কের উপর নিদ্রা গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, যেমন একটী সামান্য সাংসারিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার আয়োজন করিতেছি, অমনই টুং টুং টুং টুং করিয়া আমার কক্ষের টেলিফোনের তার বাজিয়া উঠিল।

ভাবিলাম—"এ কি সর্ব্বনাশ, বিন্দু-মাত্র বিশ্রাম করিতে পাইব না! এই দেখ, এখনই বুঝি, দিল্লী লক্ষ্ণৌ বা কোন গণ্ডদেশে যাইবার হুকুম হয়।"

যথারীতি টেলিফোনের কল চাপিয়া ধরিলাম, দুই এক পাক কল ঘুরাইয়া উত্তর দিলাম "আমি হাজির আছি—কি আজ্ঞা হয় ?"

হুকুম তৎক্ষণাৎ আসিল। এ হুকুম একেবারে বড় সাহেবের।

"তুমি এখনই পুলিশ-আপিসে এস—বড় আবশুক।"

মনে করিলাম,—"আবশ্যক আমার মাথা আর মুণ্ডু—আজ মনে করেছিলাম ভাল করিয়া আহারাদি করব, তা' আর হ'ল না দেখ্‌ছি—বিধি বাদ সাধ্‌লেন।"

তাড়াতাড়ি তৎক্ষণাৎ চূড়া ধড়া পরে বাহির হ'লেম্। ট্রামওয়ের পাস আমাদের নিকট থাকে, নগদ পয়সার ভাবনা ভাব্‌তে হয় না। ঝাঁ করে' ট্রামগাড়ীতে উঠে' শ্রীযুক্ত বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেম। তিনি মেদিনীপুরের খুনী মাম্‌লার তদারকের ফলাফল দু একটী কথায় আমার জিজ্ঞাসা করে' বল্‌লেন—"তোমার জন্য ওঘরে পূর্ব্ব বঙ্গদেশীয় একজন লোক অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব চোরে আত্মসাৎ করিয়াছে—তুমি এখনই তদারকে প্রবৃত্ত হও। আশ্চর্য্য! এত করিয়াও এরূপ "দিনে ডাকাতি" নিবারণ হইতেছে না।"

আমি আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়াই পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম, এক জন লোক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে, শুষ্ক-মুখে, মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া আছেন।

আমাকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই তিনি অতিশয় ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন—"মহাশয়! আপনাকেই কি বড় সাহেব পাঠাইয়াদিলেন—আপনি কি আমায় এ বিপদে উদ্ধার করিবেন?"

আমি তাঁহার অতিশয় ব্যগ্রতা দেখিয়া, সুস্থির হইয়া বসিতে বলিলাম। তাঁহার কথাবার্ত্তা এত জড়িত, কণ্ঠস্বর এমন পূর্ব্ববঙ্গীয় স্বর-বিশিষ্ট যে, অন্যে তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ। তবে পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের অসাধ্য বা অবোধ্য কিছুই নাই। আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যসূত্রে কত শত দেশান্তরে যাইতে হয়, কত রকম প্রকৃতির লোকের সহিত মিশিতে হয়, তাহা বলা যায় না। পুলিশের গুপ্তচরদিগকে এই জন্য নিজ নিজ আবশ্যক মত ভিন্ন ভিন্ন ভাষাও চলন-সই গোছের শিখিয়া রাখিতে হয়। দরকার হইলে কখন উড়ে, কখন ফিরিঙ্গি, কখনও পুরা বাঙ্গালী বাবু সাজিতে হয়।

যাহা হউক, আমিও সেই পূর্ব্ববঙ্গীয় লোকটীর সহিত কথাবার্ত্তায় তাহাদিগের স্বদেশীয় ভাষা, ভাবভঙ্গী ও স্বর অনুকরণ করিয়া কথা কহিতে লাগিলাম। তাহাতে বোধ হয়, তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার নাম কি ?"

তিনি উত্তর করিলেন,—"শ্রীঅধরচন্দ্র দাস।"

আমি। আপনার নিবাস ?

অধর। চট্টগ্রাম।

আমি। কলিকাতায় আসিয়াছিলেন কেন ?

অধর। মহাশয়! সে দুঃখের কথা আর কি বলিব—আমি আমাদের দেশীয় গজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাবুর জমীদারীর নায়েব। আট দিন পরে বাবুর এক মকদ্দমা আছে। বিপক্ষ-পক্ষীয়েরা যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছে। এমন কি, সেখানকার যত ভাল উকিল কৌন্সুলী একচেটে করিয়া ফেলিয়াছে। তাই জমীদার মহাশয়ের হুকুমে আমি ২৩০০ দুই হাজার তিন শত টাকা লইয়া, কৌন্সুলী ঠিক করিতে আসিয়াছিলাম। মহাশয়! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে মহাশয়! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। টাকা কড়ি আমার সব লইয়াছে। ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, মকদ্দমার কাগজ পত্র সব লইয়াছে—আমার কি সর্ব্বনাশ হইল!!"

পূর্ব্ববঙ্গীয় সেই লোকটী, এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বোধ হয়, সে সময়ে তাঁহার সেই দুর্দ্দান্ত জমীদার প্রভুর কথা মনে পড়িল। এই টাকা নষ্ট করিবার জন্য তিনি যে তাঁহার অনুগত ও প্রভুভক্ত সামান্য ভৃত্যের ঘর দ্বার জমী জীরাৎ বিক্রয় করিয়া তাঁহার টাকা উসুল করিয়া লইতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না, তাহাও মনোমধ্যে উদিত হইল। গরীবের খাইবার পরিবার সংস্থান-স্বরূপ চাকরিটী গেলে, তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার, কি খাইবে, বা কোথায় গিয়া আশ্রয় লইবে, তাহা ভাবিয়াও অধরচন্দ্রের অন্তস্তল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। তাই তিনি ব্যথিত-চিত্তে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে আশ্বাস দিয়া বলিলাম—"আমি আপনাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথাযথ উত্তর প্রদান করুন। আপনার কোন ভয় নাই। আমি আপনার সমস্ত টাকা মায় জিনিষপত্র উদ্ধার করিয়া দিব।"

শ্রীমান্ অধরচন্দ্র আমার কথায় যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইয়া একে

বারে আমার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। আমি তাঁহাকে আবার সান্ত্বনা করিয়া উঠাইয়া বসাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কলিকাতায় আপনার পরিচিত ব্যক্তি কেহ আছেন?"

অধর। না মহাশয়! আমি পূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসি নাই—এই আমার প্রথম আসা। যিনি পূর্ব্বে এই প্রকার কার্য্যে কলিকাতায় আসিতেন, তিনি হঠাৎ জর-রোগে পীড়িত হইয়া পড়াতে, আর এবার আসিতে পারেন নাই। তাই আমায় আসিতে হইয়াছে।

আমি। কলিকাতায় কাহার নিকট যাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন?

অধর। এখানে আমাদের যে এটর্ণি আছেন, তাঁহার আপিসে যাইতাম।

আমি। আপনি কখন্ কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন?

অধর। কাল রাত্রি এগারটার সময়।

আমি। তার পর?

অধর। তার পর যেমন আমি ষ্টেশনে নামিয়া বাহিরে আসিয়া এক খানি গাড়ীর অনুসন্ধান করিতেছি, অমনই একজন অপরিচিত লোক পশ্চাদ্দিক হইতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনার নাম কি অধরচন্দ্র দাস? আপনিই কি চট্টগ্রামের জমীদার গজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের তরফ হইতে আসিতেছেন?" আমার সহিত তাঁহার কখনও পরিচয় ছিল না; কিন্তু তিনি আমার ও জমীদার মহাশয়ের নাম ধাম এমন পরিষ্কাররূপে বলিলেন যে, আমার বোধ হইল, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কথা জানেন।

আমি। আপনি সে লোককে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছিলেন?

অধর। না।

আমি অনেক ক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলাম। শ্রীমান্ অধরচন্দ্র যেন অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, "কোন্ সূত্রে সেই অপরিচিত লোকটী অধরচন্দ্রের নাম ধাম ইত্যাদি অবগত হইল।"

অনেক ক্ষণ পরে আমি আবার অধরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ট্রেনে আপনার আর কাহারও সহিত আলাপ হইয়াছিল?"

অধর। হইয়াছিল, অনেক লোকের সহিত আলাপ হইয়াছিল।

আমি। তাহাদের কাহাকেও আপনি আপনার কলিকাতায় আসিবার কারণ বলিয়াছিলেন ?

অধর। হাঁ, তাহাও বলিয়াছিলাম।

আমি। আপনার নিকট কত টাকা ছিল, তাহা কি তিনি কোন সূত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন ?

অধর। হাঁ। কথাবার্ত্তায়, বোধ হয়, তাহাও আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম।

আমি। আপনি ইহার পূর্ব্বে আর কখনও কলিকাতায় আসেন নাই, তাহাও কি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ?

অধর। হাঁ, তাহাও বলিয়াছিলাম। তিনি বেশ অমায়িক ভদ্রলোক। কথায় কথায় তাঁহার সহিত আমার কত কথা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিকট হইতে আমি কলিকাতার অন্ধি সন্ধি জানিয়া লইলাম। তিনি আমায় কলিকাতার উকিল-পাড়ার ঠিকানা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কত উপদেশ দিলেন। কলিকাতার মধ্যে কোন্ ব্যারিষ্টার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তাহাও বলিয়া দিলেন।

আমি। আপনি রজনীতে কোথায় থাকিবেন বা কোথায় যাইবেন, সে বিষয়ে তাঁহার নিকট কোন পরামর্শ লইয়াছিলেন ?

অধর। হাঁ, তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, কলিকাতা সহরে থাকিবার ভাবনা কি? ষ্টেশনের অতি নিকটেই একটী "হিন্দুহোটেল" আছে, সেখানে গেলেই আহার এবং থাকিবার জন্য ঘর পাইবেন। রাত্রিতে সেইখানে থাকিয়া পর দিন (অর্থাৎ আজ) উকিল-পাড়ায় গিয়া আপনার এটর্ণির বাড়ী যাইবেন।"

আমি। সেই লোকটী কি বরাবর আপনার সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ?

অধর। না, তিনি দুই তিনটা আগের ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। আমায় বলিলেন—"আজ আর আমি কলিকাতায় যাইব না—এইখানে আমার শ্বশুর-বাড়ী, আজ রাত্রিতে এখানে থাকিয়া কাল সকালে কলিকাতায় যাইব।"

আমি মৃদুভাবে হাসিয়া বলিলাম—"কিন্তু আপনি যদি সেই লোকটীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, তাহা হইলে আপনি জানিতে পারিতেন, তিনি আপনার সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়াও আপনাকে ছাড়েন নাই।"

অধরচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"বলেন কি মশাই! তিনি যে আমার সাম্‌নে গাড়ী হ'তে নেমে গেলেন।"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম—"তিনি গাড়ী বদলাইয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই বরাবর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বরাবর আপনার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। শেষে আপনি যখন ষ্টেশনের বাহিরে গাড়ী ভাড়া করিতেছিলেন, তখন তাঁহারই নিয়োজিত লোক আপনার সহিত মিশিয়াছিল।"

অধরচন্দ্র অবাক্ হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আমার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"ওঃ এখন আমি সব বুঝিতে পারিতেছি—তাই তিনি গাড়ীতে আমার সহিত অত সৌহার্দভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। নানা কথায় আমার সমস্ত বিষয় জানিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। হায়! না জানিয়া কেন তাঁহার সহিত এত আলাপ পরিচয় করিয়াছিলাম! কেন তাঁহাকে অতি অমায়িক ভদ্রলোক ভাবিয়া প্রাণের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলাম? তিনিই যে শেষে এমন চরিত্রের লোক হইবেন, তাহা জানিলে কি আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতাম?"

আমি। না জানিয়া, না শুনিয়া, যাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আপনার এই সর্ব্বনাশ হইল, তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ কেমন?

অধর। পোষাক পরিচ্ছদ তো বেশ! যেমন কথাবার্ত্তা—তেমনই পোষাক। দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ সুন্দর, মাথায় টেড়ী-কাটা, হাতে মূল্যবান্ ছড়ি, অঙ্গুলীতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়, গায়ে বেল্‌দার পালোয়ানী আস্তেনী মিহি জামা, পরণে দামী কালাপেড়ে কাপড়—যেন কোন জমীদারের ছেলে।

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—"ও! তাই আপনি সহজে মোহিত হইয়াছিলেন। আপনি পূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসেন নাই, তাই আপনার এ ভ্রম ঘটিয়াছিল। কলিকাতায় অপরিচিত লোক যদি

আপনার সহিত বেশী কথা কহে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন,—তাহার অন্তরে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। ইহাদিগকে সহজ কথায় "সভ্য জুয়াচোর" বলে। ইহারা করিতে পারে না, এমন কাজ, এ ত্রিসংসারে কিছুই নাই। কলিকাতা সহরে এরূপ সভ্য জুয়াচোর অনেক আছে। এমন কি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনেককে আমরা চিনি। তাহাদের মধ্যে কত জেল-ফেরৎ আসামী আছে, তাহা বলা যায় না। আমাদিগকে দেখিলে তাহারা ভয়ে লুকায়। ইহাদিগেব কার্য্যকলাপ এত চাতুরীপূর্ণ যে, সময়ে সময়ে আমাদিগকে হারাইয়া দেয়। বহু অনুসন্ধানেও আমরা ইহাদিগের কিছু করিয়া উঠিতে পারি না। ইহাদিগের অনেকে আবার রীতিমত বিদ্বান্—ইংরাজী ও বাঙ্গালা লেখাপড়ায় বেশ কাজের লোক। অনেক সময়ে ইহাও দেখিয়াছি, এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে, সকলে না হউক, অনেকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইহাদিগের কার্য্যে সহায়তা করে। তাহাতে যে তাঁহাদিগের কোন লাভ নাই, তাহা নয়। চুরী, জুয়াচুরী ডাকাতি বা লুটের দ্রব্য ও টাকাকড়ির প্রায়ই অংশ পাইয়া থাকে। "সভ্য জুয়াচোরগণ" লোকের সঙ্গে বেশ মিশিতে পারে। তাহাদিগের কথাবার্ত্তার লোকে আপ্যায়িত হয়—সহজে ভুলিয়া যায়। তাহারা প্রায়ই বিদেশীয় লোকের সহিত মিশিতে চেষ্টা করে। যদি কোন প্রকারে জানিতে পারে, তাহার নিকট কিছু টাকাকড়ি আছে, তাহা হইলে প্রায় তাহাকে ছাড়ে না। ইহাদিগের সঙ্গিগণের সহিত ইহারা দূর হইতে এমন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দ্বারা কথাবার্ত্তা কহে যে, আর কেহ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। রেলওয়ে ষ্টেশনে, গঙ্গার ধারে, পারাবারের নৌকার ঘাটে, বড়বাজারে, আফিঙের চৌরাস্তায় আদালতে যেখানে যেখানে বেশী লোকের ভিড় হয়, সেই স্থানে ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। বেশ ভদ্রলোকের মত; বেশ দেখিলে চিনিবার যো নাই, অথচ বেশ সহজে অপরিচিত লোকের সহিত মেশে, তাহাদের কার্য্যের সহায়তা করিয়া অপরিচিত ব্যক্তির অনুরাগভাজন হইয়া, ছলে, বলে বা কৌশলে সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদিগের কৃপা-কটাক্ষে নিত্যই অনেকের সর্ব্বনাশ হয়।

অধর। আপনার কথায়, আপনার কার্য্যদক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া

যাইতেছে। আপনি অনুমান করিয়া বলিতে পারেন, আমার এই ঘটনাটী কিরূপে সাধিত হইয়াছে?

আমি। এ অতি সহজ কথা। কলিকাতার একটী দশ বার বৎসরের ছেলেকে যদি আপনি এই সকল কথা বলিয়া উত্তর প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেও সে তৎক্ষণাৎ আপনাকে বলিবে "এটা আর বুঝিতে পারিলেন না—ইহার ভিতর জটিল বা রহস্যপূর্ণ কোন কথাই তো নাই।"

অধর। আমায় বুঝাইয়া দিন, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি। যে লোকটী আপনার সহিত মিশিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভু প্রথমে আপনার ভাব-ভঙ্গী, চাল-চলন ও কথা-বার্ত্তায় বেশ বুঝিয়াছিলেন—আপনিই তাঁহার উপযুক্ত শীকার। তার পর আপনি কি উদ্দেশে কোথায় যাইবেন, আপনার নিকট কত টাকা আছে, সে সকল অতি সহজেই জানিয়া লইয়াছিলেন। আপনাকে ভুলাইবার জন্য তিনি দুই তিনটা ষ্টেশনের পূর্ব্বে নামিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোথাও যান নাই, বরাবর আপনার উপর রীতিমত লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্যই সেই ট্রেনে বা ষ্টেশনে, তাঁহার সহকারী মহাপ্রভু দুই চারি জন তাঁহার আশে পাশে ছিলেন। তিনি আপনার নিকট হইতে যে সকল কথা বাহির করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা যথাসময়ে তাঁহার অনুচরবর্গ উদারচেতা মহাত্মগণের কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং যথাসময়ে আপনি যখন গাড়ী ভাড়া করিতেছিলেন তখন সেই অনুচরবর্গ উদারচেতা মহাত্মগণের মধ্যেই এক জন আপনার সহিত সুমিষ্টালাপ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তার পর আপনার কি হইল, শীঘ্র সংক্ষেপে বলিয়া ফেলুন—দেরী হইলে হয় তো তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যাইতে পারে।"

অধর। যে লোকটী গাড়ী ভাড়া করিবার সময় আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারও পোষাক বড় মন্দ নয়; তবে পূর্ব্বোক্ত বাবুটীর মত তত জমকাল নহে। তিনি আমায় বলিলেন—"মহাশয়! আপনার প্রভু জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গজেন্দ্রনারায়ণ রায় আমার প্রভুকে এই বলিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছেন—'আমার সদর কাছারির একজন নায়েব ২৩০০৲ টাকা সমভিব্যাহারে আপনার নিকট যাইতেছে। একটী বড় শক্ত মকদ্দমা

পড়িয়াছে; উপযুক্ত ব্যারিষ্টার ঠিক করিয়া এই লোক সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিবেন'। আমার প্রভু সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি বিদেশীয় লোক, পাছে আপনার কোন কষ্ট হয়, তাই বাবু আপনাকে লইতে পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাদিগের এটর্ণি বাবুর নাম করিলেন। আমিও তাহাই বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সহিত ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়োয়ান, ভাড়ার বিষয় কোন দর দস্তর করিল না। আমার বোধ হয়, তবে সেই গাড়োয়ানের সঙ্গেও কোন রূপ ষড়যন্ত্র ছিল।

আমি। তাহা থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে—তার পর?

অধর। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল আমরা সেই গাড়ীতে চড়িয়া চলিলাম। গাড়ীখানি কত রাস্তা ঘুরিয়া, কত গলি ঘুঁজি দিয়া চলিতে লাগিল। আমার সঙ্গে গাড়ীর ভিতর বসিয়া সেই বাবুটি কতরকম কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগি-লেন। সুতরাং গাড়ীখানি কোন দিক্ দিয়া কোথায় যাইতেছে, তাহা দেখিবার অবকাশ পাইলাম না। সেই বাবুটী আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কেবল মাঝে মাঝে গাড়ীর বাহির দিকে মুখ বাড়াইয়া, কখন "বাঁয়ে" কখন "ডাইনে" ইত্যাদি বলিয়া দিতেছিলেন, আর গাড়োয়ান সেই মতেই চালাইতেছিল। সহসা একটী গলির মোড়ে সেই বাবুটী "রোখো রোখো" বলিয়া উঠিলেন। গাড়ী খানি তৎক্ষণাৎ থামিল। আমায় তিনি হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন। আমার সঙ্গে যে ব্যাগটী ছিল, আমি তাহা হাতে করিবামাত্র তিনি যেন কত সৌজন্যের ভাণ করিয়া বলিলেন—"দিন্ না মশাই! আমায় দিন্ না—আপনার এত দূর আস্‌তে পথে কত কষ্ট হয়েছে, এই টুকু পথ আমিই না হয় নিয়ে যাচ্ছি।" আমিও তাঁহার ভদ্রতায় তুষ্ট হইয়া উত্তরে বলিলাম—"না—না—থাক্; আপনাকে আর ক্লেশ করতে হবে না, এ ব্যাগ বড় বেশী ভারী নয়, আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি।" তিনিও বল্‌লেন—"আচ্ছা আচ্ছা থাক্, আপনার কোন কষ্ট না হ'লেই হ'ল। আমার প্রভুর আজ্ঞা, আপনাকে খুব সমাদরে, খুব যত্নের সহিত ষ্টেশন হ'তে যেন আনা হয়, তাই আমি বল্‌ছিলেম—তা থাক্—আপনার হাতেই থাক্।"

এই বলিয়া তিনি গাড়োয়ানকে মূল্য চুকাইয়া দিলেন। গাড়োয়ান চলিয়া গেল, আমরাও সেই গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আমি। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া কি দেখিলেন?

অধর। দেখিলাম, সে যেন কলিকাতা নয়, যেন কেমন পাড়াগাঁ পাড়াগাঁ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন মানব-শূন্য বলিয়া বোধ হইল। প্রথম প্রথম রাস্তার ধারে তবু দু এক খানা বাড়ী ঘর দেখা যাইতেছিল কিন্তু ক্রমশঃ খোলার ঘর, খড়ো ঘর, তার পর শুধু বাগান, তার পর একেবারে অন্ধকার!

আমি। "একেবারে অন্ধকার!" সে কি রূপ?

অধর। যেমন বাড়ী ঘর দোর, লোকজনের বসতি ছাড়িয়া শুধু বাগানের ধারে গিয়া আমার সঙ্গীর সহিত যাইতেছি—সহসা কোথাও কিছু নাই, পিছন হইতে কে এক জন লোক আমার মাথায় সজোরে এক লাঠী মারিল, আর এক জন লোক আমার হস্তস্থিত ব্যাগ কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল। বোধ হয়, "বাপ্‌রে মারে" করিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম—কিন্তু তাহা আমার ঠিক স্মরণ হয় না। আমি সেই গুরুতর লগুড়াঘাতে অচেতন হইয়া সেইখানে পড়িয়া রহিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কাব্যকুসমাঞ্জলি—শ্রীমানকুমারী-প্রণীত। ইনি স্বভাব-কবি—ভদ্র-কায়স্থ-কুলবধূ—৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী—হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিনী। ইহার শিক্ষা, বিটন * কলেজে হয় নাই। তিনি বিবি বা শিক্ষক রাখিয়াও শিক্ষা করেন নাই। মানব-চক্ষের অগোচরে এ স্থলপদ্ম, হিন্দুকুল-মহিলার অন্তঃ-পুরোদ্যানে ফুটিয়া, আত্মীয় স্বজন-বর্গের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছে। সাগরদাঁড়ী নামক গ্রাম, ইহার জন্ম-স্থান। হিন্দু-রীতি-অনুসারে বিবাহ

* যাহাকে ভ্রমক্রমে "বেথুন কলেজ" বলা হয়, তাহারই বিশুদ্ধ ও প্রকৃত নাম "বিটন কলেজ।"—সম্পাদক।

হইয়াছিল। যৌবনাবস্থায়, মেডিকেল কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিতে না করিতেই, অকালে করাল কাল, এই গ্রন্থকর্ত্রীর স্বামী কাড়িয়া লইয়াছে। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে, ইনি বিধবা হন। এখন ইঁহার বয়ঃক্রম ২৭।২৮ বৎসর। ইনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল আলোক প্রদান করিতেছেন, ইহাই আমাদিগের সৌভাগ্য। মানকুমারী যথার্থ পতি-প্রাণা। ইঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে কবিত্ব প্রকাশিত। মানকুমারীর কবিতায় ইংরাজীর গন্ধ নাই, অনুকরণের নাম মাত্র নাই, অনুপ্রাসের ছটা নাই, রঙের বাহার নাই, প্রণয়ের সরস ভাব নাই—আছে কেবল, দগ্ধ হৃদয়ের দারুণ তীব্র দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু যাহা আছে, তাহা আর কোথাও নাই। ইংলণ্ডে এ কুসুম ফুটিলে, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোকে ইহার আদর করিত, কিন্তু পোড়া বাঙ্গালা দেশে মানকুমারীর পদ্যের কত আদর হইবে, জানি না।

"কাব্যকুসুমাঞ্জলির" প্রকাশক, আমাদের সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ভূমিকায় লিখিতেছেন—"যেমন পদ্য রচনায়, তেমনই গদ্য রচনায়, এই মহিলা সমান শক্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর রচিত "গান্ধারী" "সাবিত্রী" "শৈব্যা" "পার্ব্বতী" "সুমিত্রা" প্রভৃতি গদ্য প্রবন্ধ পাঠ করিলে, মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। ইঁহার লেখার একটী বিশেষ গুণ এই যে, তাহা পাঠ মাত্রেই হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। শুষ্ক তৃণ মধ্যে অগ্নি যেমন তাড়িত বেগে ব্যাপ্ত হয়, তেমনই, ভাব ও ভাষায় যে গুণ থাকিলে, তাহা তাড়িতবেগে সমস্ত হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে "প্রসাদ গুণ" বলে। দিব্য প্রসাদগুণ ইহাঁর ভাব ও ভাষার বিশেষ গুণ। ইনি কেবল ঈশ্বর-নিষ্ঠা ও আত্মাবলম্বনের গুণেই এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর পদ্যগুলি দৈববাণীর ন্যায় মানব-মাত্রেরই সেবনীয়। এই সকল পদ্য, ধর্ম্মজগতের চূড়ান্ত কাব্য—বঙ্গ-সাহিত্যের "গীতা"। গ্রন্থকর্ত্রীকে "নবদেবতা" বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে।"

প্রকাশকের এ কথায় আমাদের কোন মতভেদ নাই। বিজ্ঞাপনটী, সর্ব্বথা কাব্যকুসুমাঞ্জলির উপযুক্ত।

শ্রীমতী মানকুমারীর "শিবপূজা"-নামক পদ্যের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল ;—

শিব পূজা।

"নমো দেব মহাদেব, নমো রাঙ্গাপায়।
পোড়াহাড় ভস্ম ছাই, ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দ ধুঁতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায়।
ভকত-বৎসল হর; ভকতে দিবেন বর,
মরতে "শিবত্ব" মিলে শিব-সাধনায়।
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়॥ ১।
"খুঁজিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় দেখেছি সকল।
দেখেছি সে শচীপতি, কণক অমরাবতী,
দেখেছি নন্দন-বনে, অমরের দল।
দেখেছি বৈকুণ্ঠধামে, নারায়ণ লক্ষ্মী বামে,
দেখেছি কমলা-সনে, উজল অনল।
গণিয়া একটি ছুটি, দেবতা তেত্রিশ কোটি,
দেখেছি গন্ধর্ব্ব-নাগ—স্বর্গ-রসাতল।
এমন আপনা-ভোলা, এমন পরাণ খোলা,
এথন রজত-গিরি—শ্বেত শতদল।
পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল॥ ৩।
"দেখিনি, কে 'সুধা' বলি' 'কালকূট' খায়।
দেখিনি কে কৃত্তিবাস, শ্মশানে সুখের বাস,
ভূত পিশাচেরে, পালে প্রীতি মমতায়।
দেখিনি মড়ার হাড়, কে করে গলার হার,
কাল-বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায়।
কার বুকে এত স্নেহ, প্রণয়িনী-শব-দেহ,
হৃদয়ে তুলিয়া মাতে মহাতপস্যায়?
অমৃতান্ন-পরিপূর্ণা, কার ঘরে অন্নপূর্ণা,
সতীর গরব-ভরে কেবা পড়ে পায়?
কার প্রেম হেন সাধা, কে দেয় জায়ারে আধা
"অর্দ্ধনারীশ্বর" কোথা মিলে দেবতায়?

কুবের ভাণ্ডারী, তবু, সুখ সাধ নাহি কভু,
বিশ্বপ্রেমে দিশাহারা "পাগল" ধরায়!
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়?"

যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই "ভ্রমরের" চরিত্র উপলব্ধি করিয়াছেন;—কিন্তু আমাদের স্বভাব-কবি মানকুমারী, সেই "ভ্রমর"-সম্বন্ধে কেমন সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন!

হায় অভাগী ভ্রমর!
বঙ্গের সরলা বধূ, পরাণে পূরিত মধু,
কে দিল গরল মেখে মরম-ভিতর?
দেবতা পুরুষ-জাতি, সে কেন বিশ্বাসঘাতী?
অনা'সে অবলা নাশে নাহি ভয় ডর?
কার মুখ চেয়েছিলি অভাগী ভ্রমর!

হায় অভাগী ভ্রমর!
অনন্ত বিশ্বাস-আশা, সীমাশূন্য ভালবাসা,
যে পতি-চরণে সতী ঢালে নিরন্তর;
সেই কি না "কালো" বলে', চলে' যায় পায়ে দলে',
সে খোঁজে—"কাহার রূপ আলো করে ঘর"
কার এ কপাল পোড়ে, অভাগী ভ্রমর!"

হায় অভাগী ভ্রমর!
মরতে যাহার নাম, ধর্ম্ম অর্থ-মোক্ষ-ধাম,
পরশি যে পদ-ধূলি পূত কলেবর—
"সেই পতি অপবিত্র—," উহু কি ভীষণ চিত্র!
কোথায় লুকাবি আত্মা—কোথা পা'বি ঘর?
জীবনের মহামরু, এই তো ভ্রমর!"

শ্রীমতী মানকুমারীর আর একটী কবিতা পাঠকবৃন্দকে দেখাই;—

প্রভো! ভাঙিও না ভুল,
যে ক'দিন বেঁচে র'ব, তোমারে "আমারি" ক'ব,
অন্তিমে খুঁজিয়া লব ও চরণ-মূল,

ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল!
প্রভো ভাঙিও না ভুল,
স্নেহময়ী বসুন্ধরা, তোমারি সৌন্দর্য্য-ভরা
তোমারি প্রেমের সিন্ধু অনন্ত অকুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল।

হিন্দু-পুরমহিলার এরূপ মনোহর ভাব, ভাষা ও ছন্দের যদি গৌরব দিগ্দিগন্তে প্রসারিত না হয়, তবে বাঙ্গালা ভাষা, বিস্মৃতি-সাগরের অতলস্পর্শ নীর-রাশিতে নিমগ্ন হউক,—কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষারই গৌরব বৰ্দ্ধিত হউক।

২ পূর্ণিমা—মাসিক পত্র ও সমালোচনী। ৯ম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কয় সংখ্যা দেখিয়া যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে পূর্ণিমা উচ্চশ্রেণীস্থ না হইলেও, প্রশংসাযোগ্য মাসিক পত্রিকা। লেখকগণের মধ্যে কয়েক জন কৃতী ও সাহিত্যসমাজে পরিচিত। প্রবন্ধগুলিও সুখপাঠ্য এবং সাময়িক পত্রিকার ভাবে ও ভাষায় লিখিত। আশা করি, যথায় সাহিত্যচর্চ্চার পূর্ণ অমাবস্যার রাজত্ব, "পূর্ণিমার" বিমল কিরণ ও পূর্ণ জ্যোতি তথায় উদ্ভাসিত হউক। মফস্বল হইতে এরূপ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আমাদের একান্ত বাঞ্ছা।

৩ তৃপ্তি—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। প্রথম সংখ্যা হইতে ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। প্রবন্ধগুলি মধ্যম রকমের। আকার কিছু বৰ্দ্ধিত করিলে ভাল হয়। আশা করি, "তৃপ্তি"-পাঠে ভবিষ্যতে সাধারণে অধিকতর তৃপ্তি পাইবেন। ঈশ্বরানুগ্রহে "তৃপ্তি", কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হউক।

প্রথম সম্পাদক শ্রীমান্ কালীচরণ মিত্রের লিখিত "রাজশেখর কয় জন?" প্রবন্ধটী ও বাবু রামদয়াল মজুমদার এম, এ কর্ত্তৃক লিখিত কয়েকটা প্রস্তাব, উল্লেখের উপযুক্ত। রামদয়াল বাবু ভাষার দিকে আর একটু দৃষ্টি রাখেন, এই আমাদের ইচ্ছা। তাঁহার সন্দর্ভে ভাবিবার ও পড়িবার বিষয় আছে।

৪ উপনিষদঃ—শ্রীসীতানাথ দত্ত-সঙ্কলিতাঃ। এই পুস্তকে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড ও মাণ্ডুক্য এই ৬ ছয় খানি উপনিষদের মূল-সংস্কৃত, সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ।

তাঁহার প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালা-সম্বোধন-পদ অভিনব-মতাবলম্বী। সম্বোধনে তিনি সংস্কৃত রীতির প্রায় অনুসরণ করেন নাই। যথা—

১। "হে একাকী গমনশীল!" ৩। "হে অগ্নি"।

২। "হে সংযমকর্ত্তা"।

এস্থলে সংস্কৃত-ভাষার নিয়মানুসারে 'একাকিন' 'সংযমকর্ত্তঃ' 'অগ্নে' হয় নাই। তবে দুই এক স্থলে "হে মঘবন্" "হে ভগবন্" কেন হইয়াছে, বলিতে পারি না। ভবিষ্যতে ঐ অসামঞ্জস্য যেন দূরীকৃত হয়, অনুবাদককে এই ইঙ্গিত করি।

পরলোকগত কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়।

(শোক-গীতি)।

হায়! প্রাণ জ্বলে যায়,
বঙ্গের সুধন্য কবি,
কল্পনা-সরোজ-রবি,
চলে' গেছে স্বর্গ-ধামে আঁধারি' ধরায়।
অভাগিনী মাতা আজি,
বিষাদে দুখিনী সাজি',
ঐ দেখ পথে পথে কাঁদিয়া বেড়ায়,
অনর্গল অশ্রুধারে বুক ভেসে যায়;
হায়! প্রাণ জ্বলে যায়,
ছিঁড়ে গেল হৃদি-তার
করে দেশ হাহাকার
ছুটিল যাতনানল শিরায় শিরায়;
কোথা গেলে কবি! তুমি,
কাঁদাইয়া বঙ্গভূমি,
দেখ হে জননী তব কাঁদে উভরায়,
এমন সময়ে কবি! রহিলে কোথায়;

বঙ্গ-নাট্য-রঙ্গাঙ্গনে,
নিত্য নব উপাদানে,
কে সাজাবে রাজকৃষ্ণ ! তোমা বিনে আর ;
কে গাঁথিবে ফুল-মালা,
সাজাবে মায়ের গলা,
কে দিবে করেতে বল, প্রীতি-উপহার
তোমা বিনে, কবিবর ! সকলই আঁধার ;
"চতুরালী," "চন্দ্রাবলী,"
নবীন প্রেমের কলি,
প্রতিভার পরিচয় "প্রহ্লাদ-মহিমা,"
হায় ! বঙ্গ-হৃদে আজি নিবিড় কালিমা ;
বঙ্গের সাহিত্যাকাশে,
সাজিয়া নবীন বাসে,
উদেছিলে যবে কবি ! কি সুখ তখন,
ভেবেছিনু এই বার
গেল দুঃখ বাঙ্গালার,
উদিল দ্বিগুণ তেজে গৌরব-তপন,
কে জানে অকালে রাহু গ্রাসিবে এমন ;
কে জানিত কবিবর !
হেন জন মনোহর,
মধ্য অঙ্কে করিবেন শেষ অভিনয় ;
হতভাগ্য বাঙ্গালায়,
তাহাই ঘটিল হায়,
আসিল একটি ঢেউ পাইল বিলয়,
অনন্তের মহাগর্ভে কবির হৃদয় ;
কিন্তু কবি ! প্রতিভার,
তাহাতে কি হবে আর,
সে তো নাহি বাস করে কালের সীমায়,

যদি এ ধরায় হায়!
সকলই বিনাশ পায়,
পশু-পক্ষী লতা-পাতা অণু-কণিকায়,
তথাপি কাহার সাধ্য প্রতিভা নিবায়;
যাও তবে কবিবর!
ত্রিদিবে তোমার ঘর,
এ সব ভুবন নহে তব অবস্থান,
তোমার অমৃত চাই,
ধরাতে অমৃত নাই,
সেখানে অমিয়া আছে, আর আছে গান,
জুড়াবে যাহাতে কবি! তব দগ্ধ প্রাণ;
আমরা এ বঙ্গ-বাসী,
ল'য়ে ভক্তি-প্রীতি-রাশি,
দিয়া তব পদতলে পূজা-উপহার,
সার্থক করিব প্রাণ,
করিয়া তোমার ধ্যান,
শিখিব করিতে ভবে মাতৃ উপকার,
যাও তবে কবিবর! ভবনে তোমার।

কলিকাতা চোরবাগান ইউনিয়ন লাইব্রেরি — বিনয়াবনত, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

বিলাপ।

জয়জয়ন্তী—মধ্যমান।

সাধে কি মা বঙ্গভূমি! কাঁদি গো সকলে মিলে'।
অকালে কাল কেড়ে নিলে সাধের বঙ্কিম ভাল বলে'॥
দেখ্‌তে পাই মা! তোর কপালে
বাঁচে না তোর ভাল ছেলে
তোর যত ছেলে ছিল ভাল
একে একে যমে নিলে॥

কে আর লেখনী ধরি'
আঁকিবে 'কাব্য সুন্দরী'
বল্ দেখি মা! তেমন-তর
দেখ্‌তে পাব কোথা গেলে॥

আয়েষা কি মনোরমা
মৃণালিনী তিলোত্তমা
কুন্দ শান্তি সূর্য্যমুখী
কে দেখাবে অবহেলে॥

রজনী শ্রী কি লবঙ্গে
ভ্রমর ইন্দিরা-সঙ্গে
চৌধুরাণী রাধারাণী
দেখিব গো কুতূহলে॥

সইল না মা! তোর কপালে
মেঘে শশী ঢেকে' নিলে
বঙ্কিমচন্দ্র অস্ত গেল
তাই ভাসি মা! নয়ন-জলে॥ *

শ্রীকেদারনাথ মণ্ডল।

---

* সিটি থিয়েটারের বুধবাসরীব প্রথমাভিনয়নে ২৯ শে চৈত্রে "বিল্বমঙ্গলের" যেন প্রস্তাবনা-স্বরূপ এই শোক-গীতিকা গীত হইয়াছিল।

ধন্য রচক কেদারনাথ মণ্ডল! মন খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। তুমি পূর্ণচন্দ্রের "কাব্য-সুন্দরী"-স্মরণে গাথা রচিয়াছ; তুমি গুণী—তুমি ভাবুক। তুমি স্বয়ং মাতিয়াছ,—বিরহে কাতর হইয়াছ, তাই তোমার প্রাণের ভাষা এমন সরস! এমন জীবন্ত! এমন অবসাদময়! যে কল-কণ্ঠ হইতে গীতি উচ্চারিত হইয়া প্রতি হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, সে কণ্ঠও শ্লাঘ্য। আশীর্ব্বাদ করি, সেই কণ্ঠ যেন আমাদের স্বজাতীয় অভাবে চিরাকুল থাকে। আর সিটি রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণকেও অগণ্য ধন্যবাদ। বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরবে একদিন "বঙ্গ-রঙ্গভূমিকে" বিরহ বিধুর দেখিয়াছি। কৈ আজ কেন তাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র-রাজকৃষ্ণের বিচ্ছেদে বিরহ-বিধুর দেখিলাম না? "ষ্টার"! তুমিও তো রাজকৃষ্ণ-বিহনে ব্যাকুল! তুমিও কেন রাজকৃষ্ণ-বঙ্কিম অভাব-কাতরতা-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ? বলি, মিনার্ভা! তুমিও নীরবে রহিলে!—সম্পাদক।

পরলোকগত রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গমাতার উক্তি

ওহে বিশনাথ, জগতে প্রথিত,
নামটি তোমার করুণাময়;
এমন করিয়া, দুখিনীরে আজ
কাঁদান কি বিধি উচিত হয়;

বহিছে এখন (ও), প্রিয় কবি-তরে,
নয়নে আমার সলিলধার;
সে ধারা না যেতে আবার কাঁদালি,
দুর্ভাগ্যের বল বাকি কি আর;
কোন্ পাপে বল, ওহে প্রজাপতি!
বঙ্কিমে আমার হরিয়া নিলে;
কেন গো আমার, গৃহ-আলো-করা,
দীপ সমুজ্জল, নিবায়ে দিলে;
কত জ্বালা আর, দিবে দগ্ধ প্রাণে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হয়েছি সারা;
দেখ রে শীরণ শরীর আমার
বহে অবিরল অশ্রুর ধারা;
তুই রে বঙ্কিম! হৃদয়ের ধন
কোথা গেলি তোর মায়েরে ফেলে;
যাও বৎস! তবে, কীর্ত্তির মন্দিরে
পাবে জয়-মাল্য তথায় গেলে;
যে রতন-হার, গাঁথিয়া যতনে,
দিয়াছ তোমার মায়ের পায়;
সে অমূল্য হার, রবে চিরকাল
শোভায় উজলি' আমার কায়;

গেলে চলি' বৎস! যাও চিত-সুখে,
কিন্তু তব স্থান হ'বে কি পূরণ?
আছে কি আমার, এমন সন্তান
ধরিবে তোমার উজল কেতন?
কত বরষের, কত দুখ-জ্বালা
ভুলেছিনু হায়! তুহারে পেয়ে;
কত ভাগ্যবতী, ভাবিতাম মোরে,
তোর সুচিকণ মু'খানি চেয়ে;
আজি রে আঁধার, আমার ভবন,
আঁধার রে হায়! মায়ের প্রাণ;
এই দাবানলে, শান্তি-নীর-ধারা
কে বা আর বল করিবে দান?

চোরবাগান ইউনিয়ন লাইব্রেরী।　　অনুগত
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

সামাজিক ইতিহাস।

আমরা যে প্রবন্ধ-সূচনা করিলাম, তাহা পল্লী-সমাজের ইতিহাস। এই ইতিহাসের মধ্যে আমোদজনক শিক্ষাপ্রদ বিবরণের সঙ্গে অনেক পরমার্থ-কথাও বর্ণিত হইবে। সুতরাং এ প্রবন্ধ, সময়োপযোগী ও বর্ত্তমান পত্রিকার উপযুক্ত। তা ছাড়া আরও এক কথা আছে। ইংরাজ, আমাদের দেশের

* রায় বাহাদুর হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর ভক্ত সৎকবি রাজকৃষ্ণ রায়, ইহজগতে নাই! তাঁহারা এখন অমরধামে দিব্য-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। স্তুতি-নিন্দা তাঁহা-দিগকে কি এখন স্পর্শ করিতে সমর্থ? তথাপি ভাই বঙ্গবাসী! আইস, সেই অমায়িক সদাশয় যুগল-মূর্ত্তির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশার্থে—বঙ্গমাতাকে আশ্বাস প্রদান করিতে, তাঁহাদের কোন স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা করিয়া আমাদের নরত্বের পরিচয় দি। হৃদয়ের আবেগে এখন আমরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন; তাই এবারে এই দুই নর-বরের কোনরূপ জীবনী পত্রিকায় করিতে না পারিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলাম।—সম্পাদক।

যাহা কিছু লিখিবেন, তাহা অপ্রয়োজনীয় হইলেও, প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, ইহা কি কম বিড়ম্বনা! তাহারই কেবল ভাষান্তর হইবে, অপর স্বাধীন প্রবন্ধ লিখিত হইবে না? আমরা এই রীতির ব্যতিক্রম করিবার কামনা করিয়া, এই সন্দর্ভের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা একে একে সকল পল্লী-সমাজেরই ইতিহাস লিখিব।

আমাদের উপস্থিত সন্দর্ভ, একটী পল্লী-সমাজের পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত। সেই প্রদেশের নাম খানাকুল-কৃষ্ণনগর। ঐ প্রদেশ, একটী সমাজ-স্থান। উহা বহু পূর্ব্বে বর্দ্ধমান চাক্‌লের অন্তর্গত ছিল। তৎপরে জেলার সৃষ্টি হইলে, তখনও উহা বর্দ্ধমান জেলার সীমাভুক্ত থাকে; তাহার অনেক কাল পরে হুগলী জেলার অন্তর্বর্ত্তী হইয়াছিল; তৎপরে পুনরায় বর্দ্ধমান জেলার অধীন হয়; মধ্যে আবার হুগলী ও হাবড়ার সীমান্তর্গত হইয়াছিল। এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তথাপি 'ষ্টাটিষ্টিকাল্ একাণ্ট অব্ বেঙ্গল' পুস্তকে ঐ দুই জেলার বর্ণন-কালে এই সমাজের রীতিমত ইতিহাস লেখা দূরে থাকুক, হণ্টার সাহেব, কিছুমাত্রও বর্ণনা করেন নাই। অধিক কি, উক্ত সাহেব, হুগলী জেলার আদিম ইতিহাস পর্য্যন্তও লিখিতে পারেন নাই! অথচ এই অঞ্চলের বর্ণনীয় বিবরণের অভাব নাই।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে যে লোক-গণনা হইয়াছিল, তাহাতে এই জানা যাইতেছে যে, লোক-গণনার সংখ্যানুসারে বিচার করিতে হইলে, খানাকুল থানা, হুগলী জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থানা। ঐ অব্দে এই প্রদেশের লোক-সংখ্যা ১,৩৩,৩০০ এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিন শত। যদি পরিমাণ-ফল বিচার করিয়া, শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাতে বোধগম্য হইবে,—এই থানা, সে হিসাবে জাহানাবাদ থানা ও ঘাটাল থানার নীচেই অবস্থিত। উক্ত দুই থানার পরিমাণ ৭৩৷৷০ ও ৭৩ বর্গ ক্রোশ; আর খানাকুল থানার পরিমাণ ৭২৷৷০ বর্গ ক্রোশ। অর্থাৎ জাহানাবাদ থানা ও ঘাটাল থানা অপেক্ষা ক্রমান্বয়ে ইহার এক ক্রোশের ও আধ ক্রোশের বৈলক্ষণ্য মাত্র।

কিঞ্চিদূন ৩০০ তিন শত গ্রাম, এই সমাজের অন্তর্গত। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এত প্রবল ও দ্বিতীয় সমাজ আর নাই। ইহার তুলনা, ইহারই সঙ্গে হইতে পারে, আর কাহারও সহিত ইহার তুলনা নাই। স্মৃতি, তন্ত্র, দর্শন,

শাক্ত-মত, বৈষ্ণব-মত ইত্যাদির অনুশীলনে এ সমাজ, অগ্রগণ্য না হউক, এক কালে নবদ্বীপের সমকক্ষতা করিত, কিছু পরেই সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

এই প্রবন্ধের আলোচনায় পাঠকের আনন্দ হইবে কি না, তাহার প্রমাণ দিতেছি। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ "উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি"-নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মানাস্পদ ইণ্ডিয়ান্ মিরার পত্রিকার সমালোচন-লেখক বা সম্পাদক মহাশয়, তাহা পাঠ করিয়া, এই মতামত দিয়াছিলেন,—

"Another valuable serial of which the second instalment appears in the issue under notice is being contributed to the subject of village-society. The writer, Pandit Mahendranath Vidyánidhi has unearthed several interesting facts concerning Khánákul-Krishnanagar, in connection with the subject."—*Indian Mirror, Octr. 26, 1893.*

উহার তাৎপর্য্য এই,—

'আর একটী "পল্লীসমাজ"-নামক ক্রমশঃ-প্রকাশ্য বহুমূল্য প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ, এই সমালোচ্য পত্রিকায় (উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধিতে) আছে। ঐ প্রবন্ধ-লেখক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, "খানাকুল-কৃষ্ণনগর"-বিষয়ে আনন্দোৎপাদক বিস্তর ঘটনা আবিষ্কৃত করিয়াছেন।'—ইণ্ডিয়ান্ মিরার ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ, ২৬শে অক্টোবর।

প্রাচীন সময়ে স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্র ও বৈষ্ণব মত প্রচারে নবদ্বীপের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও হইতেছে; খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজও ঐ সকল বিষয়েই বিখ্যাত ছিল ও আছে;—তাহার বিষয়, নিম্নস্থ তালিকায় সপ্রমাণ হইবে। বিদ্যমান কালে নবদ্বীপ, যেমন ইংরেজি-শিক্ষিত ও সংস্কৃতজ্ঞ লোকে পরিপূর্ণ, খানাকুল-সমাজেও তাহার অভাব নাই। পশ্চাৎ পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে উভয় সমাজের প্রাচীন কালের তুলনা করিয়া দেখান যাইতেছে।

এখানে আমরা তুলনা করিয়া দেখিব ও দেখাইব, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নবদ্বীপের সঙ্গে উপমা কেন দেওয়া হইল।

নবদ্বীপ।

১। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, মধ্য যুগের স্মৃতির * মত লইয়া যুক্তি, তর্ক, বিচার করিয়া স্মৃতি-বিষয়ক গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহাতে নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সঙ্কলিত গ্রন্থের নাম "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব।"

২। নবদ্বীপে রঘুনাথ শিরোমণি, নব্য দর্শন শাস্ত্রের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতেও নবদ্বীপ, নিতান্তই মহিমান্বিত।

৩। বৈষ্ণব-মত-প্রচারক শ্রীচৈতন্য, নবদ্বীপের অধিবাসী। তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমায় নবদ্বীপ গৌরবান্বিত। বৈষ্ণবেরা চৈতন্য দেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ দর্শন করিতে গিয়া থাকেন।

৪। কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাগীশ, নবদ্বীপের তান্ত্রিক। তিনি এক জন অদ্বিতীয় শাক্ত।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর।

১। নারায়ণ বন্দ্য ঠাকুর, ঐ অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে যেখানে যেখানে অযৌক্তিকতা আছে, তাহার খণ্ডন করিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের গৌরব বাড়াইয়া দিয়াছেন। ঠাকুর নারায়ণ বন্দ্যের সঙ্কলিত গ্রন্থের নাম "স্মৃতি-স্বর্ব্বস্ব"।

২। খানাকুল-কৃষ্ণনগরে কণাদ তর্কবাগীশ, দর্শন-সংক্রান্ত গ্রন্থ, টীকা ও টীপ্পনীও লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা খানাকুল-কৃষ্ণনগরের গৌরবের বস্তু।

৩। শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহচর অভিরাম গোস্বামী, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। তিনিই দ্বাদশ গোপালের প্রথম ও প্রধান গোপাল। বৈষ্ণবগণ, অভিরামের পাঠ খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সন্দর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন।

৪। কিশোর আগমবাগীশ, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের তান্ত্রিক। তিনিও ঘোরতর শাক্ত।

এই সাদৃশ্যমূলক ঘটনা দেখাইয়া আমরা খানাকুল-সমাজকে নবদ্বীপের তুল্য-মূল্য বলিতেছি না,—তাহা বলিতে পারি না। শ্রেষ্ঠ বলাও, আমাদের

* মনু-অত্রি-প্রভৃতি ২০ জন স্মৃতিকারের ২০ বিংশতি স্মৃতি-সংহিতা, শূলপাণিকৃত প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক ও শ্রাদ্ধবিবেক, জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগ, কুবের-কৃত দত্তকচন্দ্রিকা, নন্দপণ্ডিত-কৃত দত্তকমীমাংসা, মাধবাচার্য্য-প্রণীত কালমাধব, কমলাকর-বিরচিত নির্ণয়সিন্ধু এই সময়ের গ্রন্থ।

অভিপ্রেত নয়, তাহা সুধীর পাঠকগণ, বিলক্ষণ হৃদ্গম্য করিতে পারিতেছেন। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে চাই—খানাকুল-কৃষ্ণনগর, দ্বিতীয় নবদ্বীপ ;—গঙ্গার পশ্চিম পারের ছোট নবদ্বীপ।

৫। খানাকুল কৃষ্ণনগর পীঠস্থান না হউক, প্রধান উপপীঠ বটে।

৬। খানাকুল-কৃষ্ণনগরেই রাজা রামমোহন রায় উৎপন্ন হন। সে জন্য এ প্রদেশ অত্যন্ত স্পর্দ্ধান্বিত। রাজা রামমোহনের বৃত্তান্ত বহু-বিস্তৃত। সংক্ষেপে তাঁহার কথার অবতারণায় পাঠকের তৃপ্তি হইবে না বুঝিয়া, এখানে তাহা উত্থাপিত হইল না। তাঁহার আদ্যন্ত ক্রিয়া-কলাপ, সকলে বিশেষ না জানিতে পারেন। স্থূল স্থূল বিবরণ, লোকে যাহা অবগত আছেন, তাহাই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয়। তিনি স্বনাম-খ্যাত মহাপুরুষ।

৭। বাবু রমাপ্রসাদ রায়ও, এই খানাকুল-কৃষ্ণনগরেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম হাইকোর্টের জজিয়তী পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া পরিচিত করার বিশেষ কারণ দেখি না।

৮। কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত কালেজের সর্ব্বাধ্যক্ষ, পাটীগণিত-বীজগণিত-প্রণেতা বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীও, এই প্রদেশের অধিবাসী। তাঁহার মহারথী দিগ্‌গজ ছাত্রেরাই তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন। তিনিই বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রণালী-প্রবর্ত্তিত পাটীগণিতের উপদেষ্টা। সে জন্য বঙ্গভাষা, তাঁহার নিকট চির-ঋণী।

৯। এই অঞ্চলের আদিম জমিদার চৌধুরী, কায়স্থের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই অপরে বরণীয় মাল্য ক্রয় করিয়া বর্ত্তমান সময়ের গোষ্ঠীপতিরা, মহিমান্বিত ও প্রবলপ্রতাপ হইয়াছেন।

১০। বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন কায়স্থ, খানাকুল-কৃষ্ণনগরে রহিয়াছেন। তাঁহাদের উপাধি 'সর্ব্বাধিকারী'। এ অংশেও এ সমাজ স্পর্দ্ধা করিতে পারেন।

এক্ষণে খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের অন্তর্গত রাধানগরের সর্ব্বাধিকারিগণের বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া, বংশ-তালিকার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

বঙ্গদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুলীন কায়স্থ—সর্ব্বাধিকারিগণ। আগমবাগীশের বসতির কিছু পূর্ব্বে উড়িষ্যা দেশ হইতে ইহারা এই প্রদেশে শুভাগমন করেন। ইহাদের যথার্থ উপাধি "বসু"। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নবাব-সরকারে কর্ম্ম করায়, ইহাদের "মুন্সী" উপাধি ঘটিয়াছিল। কেবল নবাবের কর্ম্ম করিয়াই, ঐ পদবী হইয়াছিল, এমন নয়; পারস্য, আরব্য, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় বিশিষ্ট বোধাধিকার থাকায়,উক্ত উপনাম অন্বর্থ হইয়াছিল। কৌলীন্য-মর্য্যাদায় ইঁহাদের সর্ব্ব-স্থলেই খ্যাতি হইয়াছে। সে সকল কথা কিছু পরেই যথাস্থানে অবলোকিত হইবে। রাধানগরে বসতি-গ্রহণের কিয়ৎকাল পরে, ইহারা কৃষ্ণনগরের চৌধুরীদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাদের প্রদত্ত ভূমি লাভ করিয়া আগমভূষণগণ * এখানে বসবাস করেন।

কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ জন দ্বিজের সমভিব্যাহারে যে পাঁচ জন কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন, দশরথ বসু, তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বাঙ্গালা-দেশীয় যাবতীয় বসুদিগের আদি পুরুষ। দশরথের অধস্তন ১৮ অষ্টাদশ পুরুষ শ্রীরাম পর্য্যন্ত ঐ উপাধিতে

১। দশরথ বসু (কানোজাগত)
|
২। কৃষ্ণ বসু
|
৩। ভবনাথ
|
৪। হংস বসু
|
৫। মুক্তি (মাইনগর)

৬। দামোদর
|
৭। অনন্ত

৮। গুণাকর
|
৯। মাধব
|
১০। লক্ষ্মণ
|
১১। মহীপতি

১২। সুরেশ্বর (উড়িষ্যা) সর্ব্বাধিকারী
|
১৩। বিশ্বনাথ
|
১৪ জনমেজয়
|
১৫। মাধব
|
১৬। যাদব
|
১৭। কৃষ্ণদাস
|
১৮। শ্রীরাম

* তাহারা "আগমবাগীশ" উপাধিতেও পরিচিত।

১৮। শ্রীরাম
|
১৯। রত্নেশ্বর ১ (রাধানগর—খানাকুল)

২০। বিশ্বেশ্বর ২,   কাশীশ্বর   জগন্নাথ
|
২১। কৃষ্ণকিঙ্কর ৩
|
২২। নিত্যানন্দ ৪

২৩। জনমেজয় ৫   রামনারায়ণ মুন্সী ৫

২৪। মদনমোহন ৬, ২৪। মথুরামোহন ৬, ২৪। গোপীমোহন ৬
|
২৫। (রাজা) সীতানাথ ৭

২৬। যদুনাথ ৭,   ২৬। ব্রজনাথ ৭,   ২৬। কেদারনাথ ৭

২৪। রাজ নারায়ণ ৬
|
২৫। শ্রীনাথ ৭

২৬। রাধানাথ   দীননাথ   কৃষ্ণনাথ
| |
২৭। রমানাথ   হরিনাথ

পরিচিত ছিলেন। শ্রীরামের তনয় রত্নেশ্বর, "সর্ব্বাধিকারী" এই প্রার্থনীয় উপনামেও সুশোভিত হন"। *

দশরথ, কৃষ্ণ বসু, ভবনাথ ও হংস বসু ৪ চারি জন পূর্ব্ববাঙ্গালায় বাস করিতেন। হংস বসুর পুত্র মুক্তি, মাইনগর গ্রামে বসতি গ্রহণ করেন। এই মাইনগর, সোণারপুর ষ্টেশনের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে ও বারুইপুরের দেড় ক্রোশ উত্তরে স্থিত ও চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত। মুক্তির অধস্তন ৭ সপ্তম

* শিল্পপুষ্পাঞ্জলি ১২৯৩ সাল, ১২ সংখ্যা, ২৮৩ পৃষ্ঠায় মল্লিখিত প্রস্তাব দেখ।

পুরুষ মহীপতি পর্য্যন্ত ঐ সমাজের অধিবাসী ছিলেন। যদি ২০ কুড়ি বৎসর, মানবের গড়ে পরমায়ু ধরা যায়, তবে তবে বলিতে হয়, মাইনগর-সমাজে মুক্তি ও তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা ন্যূনাধিক ১৫০ সার্দ্ধ শত বর্ষ অধিবাস করিয়াছিলেন। মহীপতির আত্মজ সুরেশ্বর, মাইনগর হইতে উড়িষ্যায় উঠিয়া যান। সুরেশ্বর, উড়িষ্যা-রাজের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া "সর্ব্বাধিকারী" উপাধি প্রাপ্ত হন। এখান হইতে এই উপাধি প্রবল হয় নাই। বিষ্ণুরাম, তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর। ঈশান খাঁ, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর। সুরেশ্বর, উড়িষ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেও, তাঁহার এই ২ দুই ভ্রাতা, মাইনগর-সমাজে বসতি করিতে লাগিলেন। ঈশান খাঁ, দিল্লীর দরবারে কর্ম্ম করিতেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি নাই, কোন্ বাদসাহের অধীনে তিনি কার্য্য করিতেন। তাঁহার গন্ধর্ব্ব খাঁ, পুরন্দর খাঁ ও সুন্দর খাঁ এই ৩ তিন সন্তান। সম্রাট্-সংসারের উচ্চতম কর্ম্মচারীর ভাগ্যে সম্মানজনক যেরূপ উপাধি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাঁহাদের সকলের তাহাই ঘটিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার ঐ ৩ তিন পুত্রও "খাঁ" উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন।

ওদিকে সুরেশ্বরও, উড়িষ্যা-রাজের অনুগ্রহে "সর্ব্বাধিকারী" হইয়াছিলেন। তিনিও তত্রত্য রাজার মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন (৩)।

রত্নেশ্বর, উড়িষ্যায় (কটকে) বাস করিতেন। তথাকার বসতি ত্যাগ করিয়া, থানাকুল-কৃষ্ণনগরের সীমা-মধ্যস্থ রাধানগর গ্রামে বাস্-ভবন নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রত্নেশ্বরের ৩ তিন পুত্র—বিশ্বেশ্বর, কাশীশ্বর ও জগন্নাথ। রত্নেশ্বরের আগমনের পর, তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র রাধানগরে আইসেন।

---

* কায়স্থের সর্ব্বপ্রধান কুলীন বলিয়াও সর্ব্বাধিকারী উপাধির সূত্রপাত হইয়াছিল, ইহাও অনেকের মত।

লর্ড্ মেট্‌কাফ্।

চার্ল্‌স্ মেট্‌কাফ্, ১৭৮৫ সালের ৩০ জানুয়ারী তারিখে এই মহানগরী কলিকাতাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান "রাইটার্স্ বিল্‌ডিঙে" "লেক্‌চার্ রুম্" নামে এক গৃহ ছিল। সেই গৃহ ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহার জন্মগ্রহণের কিছুকাল পরেই ইঁহার পিতা মেজর টমাস্ মেট্‌কাফ্, ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, ও দেশে গিয়া অবশিষ্ট জীবন, কোম্পানির এক জন ডিরেক্‌টর, পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতম সভ্য ও "সর্" উপাধিতে ভূষিত হইয়া, সুখে কাটাইয়াছিলেন। চার্ল্‌সের বাল্য বয়সের ঘটনার বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। মিডল্‌সেক্‌সের অন্তর্গত ব্রোমলি সহরের বিদ্যালয়ে ইনি প্রথমে বিদ্যারম্ভ করেন, ও ১৭৯৬ সালে ইটন্ বিদ্যালয়ে * প্রবেশ করেন। পড়া-শোনায় ইনি পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু একেবারে অমনোযোগীও ছিলেন না; ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি ইনি ভালবাসিতেন। ইঁহার স্বভাব বেশ ধীর ও নম্র ছিল। সকল খেলাতেই ইনি তৎপর ছিলেন। ইটনে ইনি একখানি খবরের কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন, ও তাহাতে উদ্যমশীলতা ও অধ্যবসায়ের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮০০ সালের মার্চ্চ মাসের শেষভাগে, পনের বৎসর মাত্র বয়সে, ইটনের বিদ্যালয় হইতে চলিয়া আসেন, ও জুন মাসের মধ্যেই, তিনি ভারতবর্ষে আসিবার জন্য যাত্রা করেন। এই তরুণ বয়সেই চার্ল্‌স্ প্রণয়-রসের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। এই বালক বয়সের প্রণয় হইতে চার্ল্‌স্ অনেক উপ-

* ইটন্ বিদ্যালয় দুই এক কারণে উল্লেখ-যোগ্য। নেপোলিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত ব্রিটিস-বীর লর্ড্ ওয়েলিংটন্ বাল্যে এই ইটন্ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। প্রবাদ আছে, ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জয় করার পর, একদিন ওয়েলিংটন্ ইটনের বিদ্যালয়ের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় বিদ্যালয়টীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "It was here that the battle of Waterloo was won"। ইহার ভাবার্থ এই যে, আমার যে সকল গুণ থাকায় আমি ওয়াটার্লুর যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিয়াছি, এই বিদ্যালয়ে আমার সেই সকল গুণের শিক্ষা ও অধিকার হইয়াছিল।

কার পাইয়াছিলেন, ও বাল্য-প্রণয়ের আস্পদকে পরিণয় করিয়া যৌবনে অশেষ সুখী হইয়াছিলেন।

১৮০১ সালের ৩রা জানুয়ারি, ভারতের ভাবী শাসনকর্ত্তা চার্ল্‌স্ কলিকাতায় পদার্পণ করেন। এখানে আসিয়াই, তিনি পাঠে সমস্ত সময় ও উদ্যম নিয়োগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সম্পাদিত তৎকালীন সংবাদ-পত্রিকা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইত, তিনি যদিও অধিক পড়েন নাই, তথাপি যাহা পড়িয়াছিলেন, তাহাতে বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল; ও এদেশীয় ভাষা সমূহেও যথাসময়ে তাঁহার যথোচিত অধিকার হইয়াছিল। ঐ সালের ৪ঠা মে তিনি ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কালেজে ভর্ত্তি হন। এ কালেজে অধ্যয়ন করা তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু বাধ্য হইয়া থাকিতে হইত, ও সেজন্য তিনি বড় কষ্টবোধ করিতেন। কালেজ্ ছাড়াইয়া লইবার জন্য তিনি পিতার নিকট বিশেষ মিনতি করিয়া মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। কিন্তু বড় সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার অযথা প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইউরোপীয়েরা যখন প্রথমে এদেশে আসিত, তখন তাহাদিগকে উদরের পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। পুত্র যখন অনেক দুঃখ করিয়া মাতাকে পত্র লিখিতেন, মাতা, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া উত্তর দিতেন, "You will laugh at my sending you out a box of pills by Miss S—, but I think you are bilious, and they will be of great service.।" ইহার ভাবার্থ এই যে, "তোমার এ সকল কষ্ট পেটের—হৃদয়ের নহে। বোধ হয়, তোমার পেটের কোন অসুখ হইয়াছে। সেই জন্য এক রকম ভাল ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি হয় তো ইহা দেখিয়া হাসিবে; কিন্তু ইহা ব্যবহারে তোমার অনেক উপকার হইবে।" চার্ল্‌সের মাতা যাহা ভাবিতেন, অনেকটা সেই রকমই হইত বটে, কিন্তু প্রণয়িনীর জন্য চার্ল্‌সের মনটা বাস্তবিকই অনেক সময় কষ্ট পাইত, ও সেই জন্যই দেশে যাইবার জন্য তিনি এত উৎসুক হইতেন। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, ভারত ছাড়িয়া, দেশে বা অন্য কোথাও ছয় মাস কাটাইলেই, তাঁহার মনে, ভারতে ফিরিয়া আসিবার বাসনা বলবতী হইত; আর তখন এদেশ ছাড়িয়া গেলে, চার্ল্‌স্ ভবিষ্যতে অত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন না। ১৮০২ সালের

জানুয়ারি মাসে, সপ্তদশবর্ষীয় তরুণ যুবা চার্ল্‌স্ মেট্‌কাফ্ সিন্ধিয়া রাজ্যের রেসিডেণ্টের সহকারী নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন। কর্ণেল্ কলিন্স্ তখন সিন্ধিয়ায় রেসিডেণ্ট্ ছিলেন; ইনি মেজর মেট্‌কাফের এক জন সুহৃৎ ছিলেন বলিয়া বন্ধু-পুত্র চার্ল্‌সের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। কর্ণেল কলিন্স্ আদৌ অমায়িক ছিলেন না, প্রত্যুত উদ্ধত-স্বভাব ও কর্তৃত্ব-প্রিয় ছিলেন। ভারতবর্ষে বহুদিন বাসের ফলস্বরূপই তাঁহার এক অপূর্ব্ব জ্ঞান জন্মিয়াছিল,—যুবক মাত্রেই সকল বিষয়ে অকর্ম্মণ্য। যাহারা তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে অস্বীকার করিত, তিনি তাহাদিগের উপর খড়্গহস্ত হইতেন। এই সকল কারণে লোকে তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিয়াছিল। বয়স ও পদ উভয়ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, কলিন্স্, চার্ল্‌সকে সম্পূর্ণ অধীনের ন্যায় দেখিতেন, ও বালক বলিয়া বড় গ্রাহ্য করিতেন না। এ কারণে চার্ল্‌স্ কর্ণেল্‌কে সম্মান দেখাইতে বড়ই নারাজ হইতেন; অথচ কর্ণেল্, চার্ল্‌স্‌কে সম্মান দেখাইতে বাধ্য করিতেন। চার্ল্‌স্ ভাবিতেন, কর্ণেল্ উদ্ধত-স্বভাব ও প্রভুত্ব-প্রয়াসী। কর্ণেল্ ভাবিতেন, চার্ল্‌স্ গর্ব্বিত ও আত্মাভিমানী। এই জন্য ইহাঁদের উভয়ের বড় একটা বনিবনাও ছিল না। প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রেরই বাল্যে একটু গর্ব্বিত ভাব ও আত্মম্ভরিতা থাকাই স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু রীতিমত শিক্ষা পাইলে, এ দোষ, যথাসময়ে, একটু বয়স হইলেই, দূর হওয়াও স্বভাবসিদ্ধ। সেই কারণে অপরিণত বয়সে কোন পরিণতবয়স্ক ও অভিজ্ঞ অভিভাবকের অধীনে থাকা শ্রেয়স্কর; এই বুঝিয়াই কর্ণেল্, যুবা মেট্‌কাফ্‌কে সম্পূর্ণরূপে নিজের অধীনে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু অধীনতা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠায়, মেট্‌কাফ্ ১৮০২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। এখানে আসিয়াই গবর্ণমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটারীর অফিসে একটি ভাল কর্ম্ম পাইলেন। ধরিতে গেলে, তাঁহার প্রকৃত বিষয়-কর্ম্ম এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, ইনি এক্ষণে মনোযোগের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; ভারতের ন্যায় অধীন দেশে উচ্চপদে থাকিতে গেলে, যে সমুদয় দায়িত্ব বহন করিতে হয়, তিনি সে সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে বিধিমতে সচেষ্ট হইলেন।

তাঁহার তৎকালীন পত্রাদি পড়িলে জানা যায়, তিনি সে সময় ইচ্ছাপূর্ব্বকই কলিকাতার আমোদের সমাজে বড় একটা মিশিতেন না, সন্তোষের সহিত নিজের কাজ করিতেন ও অবসর পাইলেই, ইতিহাস পড়িতেন।

চার্লসের এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম থিয়োফিলাস্। ইনি চীন দেশে কর্ম্ম করিতেন। তিনি সেই সময়ে চার্লসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এ সাক্ষাতে চার্ল্সের ভবিষ্যতের পক্ষে অনেক উপকার হইয়াছিল। ১৮০৩ সালের এপ্রিল মাসে চার্ল্স্ গবর্ণর জেনেরালের আফিসে একটি পদ পান। লর্ড ওয়েলেস্লি তখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল্। বিখ্যাত শিখযুদ্ধ তখন আরম্ভ হইতেছে ও সেই যুদ্ধের চিন্তাই গবর্ণর জেনেরালের সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা ছিল। এ অবস্থায়, তাঁহার আফিসে চার্ল্সকে যে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই পদে থাকিতে, অনেক বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। যাহা হউক, আফিসে চার্ল্স্ ও তাঁহার সহযোগী অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে কিরূপ "হাড়ভাঙ্গা" পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা এই গল্পটী পাঠ করিলেই বেশ বোঝা যায়। যুদ্ধের প্রারম্ভে ও সময়ে, লর্ড ওয়েলেস্লিকে, কর্ণেল্ কলিন্স্, জেনারেল্ লেক্, আর্থার ওয়েলেস্লি, জন-ম্যাল্কল্ম, পেশোয়ার রাজ্যের রেসিডেণ্ট্ ক্লোস্, হায়দারাবাদের নিজামের রাজ্যের রেসিডেণ্ট্ কার্ক্পেট্রিক্ প্রভৃতি অনেকানেক সেনাপতি ও কর্ম্মচারীর নিকট উপদেশ ও আজ্ঞা পাঠাইতে হইত। ক্রমে যুদ্ধ যত ঘোরতর বাধিয়া উঠিল, লেখালেখি তত অধিক হইতে লাগিল। সমস্ত দিন কার্য্য করিয়াও চার্ল্স্ প্রভৃতি কার্য্য সাঙ্গ করিতে পারিতেন না। দিনের পর দিন যত যাইতে লাগিল, কার্য্য তত বাড়িতে চলিল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, তাঁহারা কার্য্য অর্দ্ধ-সমাপ্তও করিতে পারিতেন না। অবশেষে যখন গবর্ণর জেনারেল্ দেখিলেন, বাতি জ্বালিয়া সন্ধ্যার পরে খাটিয়াও কর্ম্মচারীরা কার্য্য সাঙ্গ করিতে পারিতেছে না, তখন তিনি আজ্ঞা দিলেন, কর্ম্মচারীরা রাত্রিতে যতক্ষণ ইচ্ছা, খাটিয়া "গবর্ণমেণ্ট্ হাউসেই" আহারাদি করিবে। ইহাতে চার্ল্স্ প্রভৃতি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত কাজ করিতেন ও গবর্ণমেণ্ট্ হাউসে প্রস্তুত খাদ্য পাইতেন ও মদ্যাদি পান করিয়া আমোদ করিতেন। লর্ড ওয়েলেস্লি ইহাও

বলিয়া দিয়াছিলেন,—"তোমরা যত ইচ্ছা আমোদ আহ্লাদ করিতে পার, তাহাতে কোন বাধা নাই। গবর্ণমেণ্ট্ হাউসে আছ বলিয়া যে, তোমাদিগকে নিস্তব্ধ থাকিতে হইবে, তাহা নহে। তোমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না।" এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া, পান-বিহ্বল চার্ল্‌স্ প্রভৃতি আফিসে হুলস্থূল করিতেন। কিন্তু তাহাতে গবর্ণর জেনারাল কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতেন না। যৌবনসুলভ উৎসাহে পরিচালিত হইয়া, চার্ল্‌স্ ও তাঁহার অন্যান্য সহযোগী, ইহাতে কষ্ট অনুভব করিতেন না।

এই আফিসে কার্য্য করিবার সময়, মেট্‌কাফ্, সিন্ধিয়া রাজ্যে একদল সৈন্য রাখার সম্বন্ধে একটি "মিনিট্" লিখিয়া সকলের যথেষ্ট সুখ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। মেট্‌কাফ্ যে এই বয়সেই রাজনীতিকুশল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই 'মিনিটে' তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বিখ্যাত জন্ উইলিয়ম্ কে (John William Kaye) সাহেবের প্রণীত লর্ড্ মেট্‌কাফের জীবনচরিতে এই 'মিনিট্' (মতামত) সবিস্তারে উদ্ধৃত আছে। লর্ড্ ওয়েলেস্‌লি এই 'মিনিট্' পাঠ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জীবনের এই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, এ দেশে কিছুকাল সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতে পারিলে, স্বদেশে গিয়া (India Office) ইণ্ডিয়া অফিসে অনায়াসে একটি ভাল কার্য্য জুটাইয়া লইতে পারিবেন, ও সেই আয়ে, প্রণয়িনীর সহিত একত্র সুখে জীবন যাপন করিবেন। কিন্তু গবর্ণর জেনারালের নিকট হইতে এই সুখ্যাতি পাইয়া অবধি মেট্‌কাফের জীবনের উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এখন তিনি পূর্ব্বের বাসনা ত্যাগ করিলেন। এদেশ হইতেই উন্নতিলাভের জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হইলেন। লর্ড্ ওয়েলেস্‌লির নিকট সুখ্যাতিবচন না পাইলে, বোধ হয়, চার্লসের জীবনে এই নূতন আশা ও নবীনত্বটুকু আসিত না। যাহা হউক, কিছুদিন পরেই তিনি জেনারেল্ লেকের আফিসে এক জন পলিটিকাল্ এসিষ্টাণ্ট্ (রাজনীতি-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী) স্বরূপ নিযুক্ত হন ও স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য যাত্রা করেন।

আজকাল এ দেশে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত যতটা সহজ ও আপদশূন্য, যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় ততটা ছিল না। রেলপথের ছড়াছড়ি ছিল না। মনুষ্য-যান ও পশু-যানই প্রধান অবলম্বন ছিল এবং

জঙ্গল মধ্য দিয়া গমন করিতে হইলে দস্যুর আক্রমণে অনেক অসহায় পথিককে প্রাণ দিতে হইত। বিশেষতঃ সাহেব পথিক দেখিলে ডাকাইতের দল আরও উৎপীত করিত। চার্লসের ভাগ্যে ঐরূপ এক ঘটনা হইয়াছিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাল্কী করিয়া কার্য্যস্থানে যাইতেছেন; একদিন পথে একদল ডাকাইত হঠাৎ আসিয়া পাল্কী আটক করিল! দস্যুদল দেখিয়া বাহকেরা মনে মনে বিচার আরম্ভ করিয়া দিল। বিচারে এক পক্ষ অসহায় সাহেবটির মায়া, অপর পক্ষ তাহাদিগের নিজের জীবন রক্ষা। বিচার করিতে অধিক সময় লাগিল না। বলা বাহুল্য, দস্যুদল আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই চার্লসের বিরুদ্ধে "একতরফা ডিক্রি" হইয়া গেল; বাহকগণ পাল্কী ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। কিন্তু চার্লস্ বিনা যুদ্ধে হার মানিবার পাত্র ছিলেন না; স্থির করিলেন, মরিতেই যদি হয়, তবে বীরত্ব দেখাইয়া—যত পারি শত্রু বধ করিয়া—প্রাণ দিব। বিপক্ষদলের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখিয়াও তিনি ভীত বা নিরস্ত হইলেন না। এক জন ডাকাইতের হাত হইতে তাহার লাঠিটা জোর করিয়া কাড়িয়া লইলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধও করিলেন। এক জন ডাকাইত তরবারি দিয়া তাঁহার হাতে আঘাত করিল; হাতের লাঠি পড়িয়া গেল ও দুটা আঙ্গুলের অগ্রভাগ কাটিয়া গেল। যুদ্ধ করা বরাবরই বৃথা, অধিকন্তু এক্ষণে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া চার্লস্ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। দস্যুরা পাল্কী লুণ্ঠন করিতেই ব্যগ্র হইল ও সৌভাগ্যক্রমে কেহই তাঁহার অনুগমন করিল না। তিনি নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিলেন, ও কিছু পরেই ক্লান্ত হইয়া এক নদীতীরে বসিয়া পড়িলেন। একটু বিশ্রাম করিয়া, তিনি যখন দেখিলেন, দস্যুরা চলিয়া গিয়াছে, তখন আবার পাল্কীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এদিকে বাহকেরাও একে একে সেখানে পৌছিল ও চার্লস্কে কানপুর লইয়া গেল। তথায় এক আত্মীয়ের শুশ্রূষাগুণে তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই ক্ষত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে চলিলেন।

জেনারেল্ লেকের আফিসে ঐ পদ পাইয়া মেট্‌কাফ্ প্রথম প্রথম বড় সুখী হইতে পারেন নাই। উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে সম্মান দেখাইতেন ও তাঁহার সহযোগীরা তাঁহাকে ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করিত—সত্য বটে;

কিন্তু সকলেই তাঁহাকে এরূপ ভাবে দেখিত, যেন তিনি "উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন।" তা ছাড়া, সকলে তাঁহাকে "কেরাণী" বলিয়া ভাবিত। বিশেষতঃ, তাঁহার সহযোগীর মধ্যে অনেকেই, লেকের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিবার অবসর পাইয়াছিল বলিয়া বড় গর্ব্বিত ছিল, ও মেট্‌কাফ্‌কে যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বলিতে দিত না। তিনি কিছু বলিতে গেলেই, তাঁহাকে, উপহাস করিয়া, চুপ করিয়া থাকিতে বলিত। এই সকল অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া, চার্ল্‌স্ এক দিন এক জন সহযোগীকে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি যে তোমা অপেক্ষা যথেষ্ট সাহসী, শীঘ্রই তাহা দেখাইব। বাস্তবিকই, অতি অল্পকাল মধ্যে এক যুদ্ধে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়া সকলের নিকট যশস্বী হইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই :—

ডীগ-দুর্গ আগ্রার ২২॥ সাড়ে বাইশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। লেক্ দেখিলেন—এই দুর্গ হস্তগত করা নিতান্ত আবশ্যক। ছয় দিন অবিশ্রান্ত গোলাগুলি বর্ষণের পর দুর্গের প্রাচীরের এক স্থানে একটি বৃহৎ ছিদ্র হইল। লেক্ আজ্ঞা দিলেন, এক দল সেনা বলপূর্ব্বক এই ছিদ্র দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করুক। এরূপ ভাবে, আক্রান্ত ও জিতপ্রায় দুর্গে প্রবেশ করা যে কিরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য, তাহা, বোধ হয়, অনেকেই বুঝিতে পারেন। ছিদ্রের মধ্য দিয়া অল্প সংখ্যক লোকই দুর্গে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এই সময় দুর্গমধ্য হইতে আক্রান্ত সেনারা যদি ছিদ্রের উপর গুলি চালায়, তবে সে মুষ্টিমেয় লোক-সংখ্যার নিধন অনিবার্য্য। যাহা হউক, মেট্‌কাফ্ সাহসে নির্ভর করিয়া প্রার্থনা করিলেন, তিনিও ঐ সৈন্যদলের সহিত দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবেন। লর্ড্ লেক্, তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন ও মেট্‌কাফ্ সর্ব্ব প্রথমে ঐ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। এই অসীম সাহসের পরিচয় দিয়া, মেট্‌কাফ্ সর্ব্বসাধারণের বিশেষ স্নেহের ও প্রশংসার পাত্র হইয়া উঠিলেন। লর্ড্ লেক্ হইতে সৈন্যের সামান্য কর্ম্মচারী সকলেই এক বাক্যে বলিতেন, মেট্‌কাফ্ কালে যে একজন অদ্বিতীয় সাহসী পুরুষ হইবেন, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। এই সময় হইতে, লর্ড্ লেক্, আদর করিয়া তাঁহাকে "বালক-বীর" বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু, যে কার্য্য করিয়া তিনি এত আদর পাইয়াছিলেন, তাহা বড়ই অসমসাহসিক ও নিতান্ত বিপজ্জনক।

যাহাই হউক, তিনি যে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার (ও ভারতবাসীরও) সৌভাগ্যের কথা। আফিসের কার্য্যেও যথেষ্ট শ্রমশীলতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া, তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সার্ জন্ ম্যাল্কমের বিশেষ অনুরোধে, যুদ্ধাবসান না হওয়া পর্য্যন্ত এই আফিসে কর্ম্ম করেন। ইহার কিছুকাল পরে, লর্ড্ ওয়েলেস্লি ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও চার্লসের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

লর্ড্ ওয়েলেস্লির পর লর্ড্ কর্ণওয়ালিস্ ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। যুবক মেট্‌কাফ্ অনেক সময় মনে মনে ওয়েলেস্লির সহিত কর্ণওয়ালিসের তুলনা করিতেন, ও তুলনায় ওয়েলেস্লিকেই উচ্চপদ দিতেন। তিনি ভাবিতেন, কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে যুদ্ধ বিগ্রহের বিশেষ হ্রাস ও তজ্জন্য ইংরাজের রাজত্ব-বিস্তার ও প্রভুত্ব-বিস্তারের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। এই সময়ে তিনি বন্ধুদিগকে এ সম্বন্ধে যে পত্রাদি লিখিতেন, তাহার মধ্যে এক খানিতে লিখিয়াছিলেন :—"It will be melancholy "to see the works of our brave armies undone, and left to "be over again. I hope for the best from Lord Cornwallis's "administration ; but I am, I must confess, without confi- "dence. It is surely unwise to fetter the hands of the Com- "mander-in-Chief, and to stop all operations until his own "arrival. We shall have Holkar near us in a few days."

ইহার ভাবার্থ এই যে, "আমাদের সৈন্যেরা এত দিন ধরিয়া যাহা করি- "য়াছে, সে সকলই নিরর্থক হইয়া যাইবে ও সে সকল পুনরায় প্রথম হইতে "করিতে হইবে—ইহা অতি দুঃখের কথা। লর্ড্ কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে "ভাল হউক—ইহাই আমার আশা ; কিন্তু সে আশা যে পূর্ণ হইবে, সে "বিশ্বাস আমার নাই। নিজে যতদিন আসিয়া না পৌঁছিতেন, ততদিন "সেনাপতিকেও কিছু করিতে দিতেছেন না,—ইহা নিতান্ত অন্যায়। "আমরা শীঘ্রই হোলকার রাজ্যের নিকট পৌঁছিব।"

যাহা হউক, অর্থের অসচ্ছলতা বশতঃ আপাততঃ হোল্কার রাজ্যের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে হইল। বৃদ্ধ হোল্কার-রাজ, বাস্তবিকই যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন, ইহা তাঁহার সৈন্য- দিগকে দেখাইয়া, তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ১৮০৬ সালের ৭ই জানুয়ারি তারিখে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীকে স্বীয় রাজধানীতে নিমন্ত্রিত করিয়া লইয়া গেলেন।

শ্রীআশুতোষ দাস।

Printed by N. B. Ghose at the MONICA PRESS, 51/2 Kalu Ghose's Lane, CALCUTTA.

নীতিশতকম্।

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্ত্তয়ে
স্বানুভূত্যেকমানায় নমঃ শান্তায় তেজসে ॥ ১ ॥

দিক্ কাল আদি যাঁর নহে পরিমাণ,
অন্ত নাই, জ্ঞানরূপে যিনি বর্ত্তমান।
হৃদে অনুভাব-মাত্র প্রমাণ যাঁহার,
সেই শান্ত তেজোময়ে করি নমস্কার। ১।

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতে চ পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ ॥ ২ ॥

যাহার চিন্তায় সদা মগ্ন মম মন,
বিরক্ত আমাতে সেই, চায় অন্য জন।
সে জন আবার কিন্তু অন্যে অনুরত,
আমিও হই অন্য নারীর অভিমত।
তাই বলি, ধিক্ তায়, ধিক্ সেই জনে,
ধিক্ সে নারীরে, ধিক্ আমায়, মদনে। ২।

অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।
জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি ॥ ৩ ॥

সহজে সন্তুষ্ট করা যায় মূর্খ জন,
অতি সহজেই তুষ্ট সুপণ্ডিতগণ।
কিন্তু কণা-মাত্র জ্ঞানে দর্পিত যে জন,
ব্রহ্মাও তুষিতে তারে পারে না কখন। ৩।

প্রসহ্য মণিমুদ্ধরেন্মকর-বক্ত্র-দংষ্ট্রাঙ্কুরাৎ
সমুদ্রমপি সংতরেৎ চপলমূর্ম্মিমালাকুলম্।
ভূজঙ্গমপি কোপিতং শিরসি পুষ্পবদ্ধারয়েৎ
ন তু প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তমারাধয়েৎ ॥ ৪ ॥

মকরের মুখে হস্ত করিয়া বিস্তার,
তীক্ষ্ণ দন্ত হ'তে মণি করিবে উদ্ধার।
তরঙ্গমালায় সদা সাগর আকুল,
সন্তরণ করি' তাহে পাবে তার কূল।
কিম্বা ফুলমালা সম করিয়া আদর,
ধরিবে আপন শিরে ক্রুদ্ধ বিষধর।
তুষিতে পারিবে নাহি তবু মূর্খ জন,
বোঝালে বোঝে না, সদা বাঁকা যার মন। ৪।

লভেত সিকতাসু তৈলমপি যত্নতঃ পীড়য়ন্
পিবেচ্চ মৃগতৃষ্ণিকাসু সলিলং পিপাসার্দ্দিতঃ।
কদাচিদপি পর্য্যটন্ শশবিষাণমাসাদয়েৎ
ন তু প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তমারাধয়েৎ। ৫।

সযতনে সম্পীড়ন করিলে কখন,
বালুকায় হ'তে পারে তৈল-উদ্ভাবন।
অতিমাত্র হয় কষ্ট, যদি পিপাসায়,
হয় তো পাইবে জল, মৃগতৃষ্ণিকায়।
করিতে করিতে নানা-দেশ-পর্য্যটন,
শশকের শৃঙ্গ হ'বে হয় তো দর্শন।
তুষিতে পারিবে নাহি তবু মূর্খ জন,
বোঝালে বোঝে না সদা বাঁকা যার মন। ৫।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।